

সূচনা

আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে ‘চোখের বালি’ উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ়ঁটা দুরহ। সব চেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লস্বা গল্পের উপর মাসিক পত্রের চিরকেলে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্ৰ। আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ- অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারেও তাই হল।

আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সন্তোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহ- সম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন- অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোরাপোশের দাবি করা। বন্ধুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটো গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা- ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্রে আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা- ঘরে যেখানে আগুনের জলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায় নি। তার পরে ঐ পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে- বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রুট স্পর্শ এড়িয়ে যায় নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি, এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তার পরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় এক দিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর- এক দিকে এনেছিল গল্পে, এমন- কি কাব্যেও, মানব চরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তারপরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত- নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

বৈশাখ ১৩৪৭

অধ্যায় - ১

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্বা দিয়া পড়িল। দুই জনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, “বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে— তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরো চের আছে।”

রাজলক্ষ্মী। মহিন, এই তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার জো নাই।

মহেন্দ্র। মা, ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। মা- সমস্কে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম. এ. পাস করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরস্ত করিয়াছে, তবু মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান-অভিমান আদর- আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙারু- শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গতের থলিটির মধ্যে আব্রত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার বিহার আরাম বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না।

এবারে মা যখন বিনোদিনীর জন্য তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন, তখন মহেন্দ্র বলিল, “আচ্ছা, কন্যাটি একবার দেখিয়া আসি।”

দেখিতে যাইবার দিন বলিল, “দেখিয়া আর কী হইবে। তোমাকে খুশি করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি, ভালোমন্দ বিচার মিথ্যা।”

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল, কিন্তু মা ভাবিলেন, শুভদৃষ্টির সময় তাহার পছন্দর সহিত যখন পুত্রের পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে তখন মহেন্দ্রের কড়ি- সুর কোমল হইয়া আসিবে।

রাজলক্ষ্মী নিশ্চিন্তিতে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল, মহেন্দ্রের মন ততই উৎকর্ষিত হইয়া উঠিল— অবশ্যে দুই- চার দিন আগে সে বলিয়া বসিল, ‘না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।’

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশংস্য পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অনুরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ- প্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ বিত্তৰ্ণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমুখ হইয়া বসিল।

মহেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলিত। মা তাহাকে স্টীমবোটের পশ্চাতে আবন্দ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যিক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ

দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিলেন, ‘বাবা, এ কাজ তো তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরিবের মেয়ে—’

বিহারী জোড়হাত করিয়া কহিল, ‘মা, এটে পারিব না। যে- মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে- মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি, কিন্তু কন্যার বেলা সেটা সহিবে না।’

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, ‘বিহারী আবার বিয়ে করিবে ! ও কেবল মহিনকে লইয়াই আছে, বউ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।’

এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর- একটুখানি বাড়িল।

বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারি মেম রাখিয়া বহুবয়সে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছি, তবু তাহার হঁশ ছিল না। অবশ্যে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।

তখন রাজলক্ষ্মী তাহার জন্মভূমি বারাসতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভাতুসুত্রের সহিত উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

অন্তিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল। মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ড টিকিতে পারিতাম না।”

বছর- তিনেক পরে আর- এক দিন মাতাপুত্রে কথা হইতেছিল।

“বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে।”

“কেন মা, লোকের তুমি কী সর্বনাশ করিয়াছ?”

“পাছে বউ আসিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।”

মহেন্দ্র কহিল, ‘ভয় তো হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম।’

মা হাসিয়া কহিলেন, ‘শোনো একবার ছেলের কথা শোনো।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি- বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।’

রাজলক্ষ্মী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাহার সদ্যসমাগতা বিধবা জাকে সম্মোধন করিয়া বলিলেন, ‘শোনো ভাই মেজোবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?’

কাকী কহিলেন, “এ তোমার, বাছা, বাঢ়াবাড়ি। যখনকার যা তখন তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকল্পা করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলেটির মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।”

এ কথা রাজলক্ষ্মীর ঠিক মধুর লাগিল না এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে- কটি কথা বলিলেন, তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাখা নহে। কহিলেন, ‘আমার ছেলে যদি অন্যের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজোবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।’

রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে।

মেজোবউ কহিলেন, ‘তুমই বউ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল, নহিলে আমার অধিকার কী।’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ তো, এতদিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আসিতে পারি, এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব, আর কাহারো দরকার হইবে না।’

মেজোবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইল এবং কালেজ হইতে সকাল- সকাল ফিরিয়াই তাহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হইল।

কাকী তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইহা সে নিশ্চয় জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃহীনা বোনবি আছে, এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সন্তানহীনা বিধবা কোনো সূত্রে আপনার ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া সুখী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে সে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাহার ঘরে যখন গেল, তখন বেলা আর বড়ো বাকি নাই। কাকী অন্নপূর্ণা তাহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুক্রবিমর্শমুখে বসিয়াছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে, এখনো স্পর্শ করেন নাই।

অল্প কারণেই মহেন্দ্রের চোখে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া স্নিফস্বরে ডাকিল, ‘কাকীমা।’

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ‘আয় মহিন, বোস।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, প্রসাদ খাইতে চাই।’

অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের কৌশল বুঝিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু কষ্টে সংবরণ করিলেন এবং নিজে খাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয় তখন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আহারান্তে হঠাৎ মনের রোঁকে বলিয়া বসিল, “কাকী, তোমার সেই- যে বোনঝির কথা বলিয়াছিলে, তাহাকে একবার দেখাইবে না?”

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে ভীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন, ‘তোর আবার বিবাহে মন গেল নাকি, মহিন।’

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, ‘না, আমার জন্য নয় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও।’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে। বিহারীর মতো ছেলে কি তাহার কপালে আছে।’

কাকীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মহেন্দ্র দ্বারের কাছে আসিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। রাজলক্ষ্মী জিঙ্গাসা করিলেন, “কী মহেন্দ্র, এতক্ষণ তোদের কী পরামর্শ হইতেছিল।”

মহেন্দ্র কহিল, “পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আসিয়াছি।”

মা কহিলেন, ‘তোর পান তো আমার ঘরে সাজা আছে।’

মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া অন্নপূর্ণার রোদনস্ফীত চক্ষু দেখিবামাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন।

ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘কী গো মেজোঠাকরুন, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?’

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

অধ্যায় - ২

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভুলিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ভোগেন নাই। তিনি শ্যামবাজারে মেয়ের অভিভাবক জেঠার বাড়িতে পত্র লিখিয়া দেখিতে যাইবার দিন স্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল, “এত তাড়াতাড়ি কাজটা করিলে কেন কাকী। এখনো বিহারীকে বলাই হয় নাই।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘সে কি হয় মহিন। এখন না দেখিতে গেলে তাহারা কী মনে করিবে।’

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল, “চলো তো, পছন্দ না হইলে তো তোমার উপর জোর চলিবে না।”

বিহারী কহিল, ‘সে কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোনঝিকে দেখিতে গিয়া পছন্দ হইল না বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘সে তো উভয় কথা।’

বিহারী কহিল, ‘কিন্তু তোমার পক্ষে অন্যায় কাজ হইয়াছে মহিনদা। নিজেকে হালকা রাখিয়া পরের ক্ষক্ষে এরূপ ভার চাপানো তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইবে।’

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, ‘তবে কী করিতে চাও।’

বিহারী কহিল, ‘যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব— দেখিতে যাইবার ভড় করিবার দরকার নাই।’

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভঙ্গি করিত।

অবশ্যে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, ‘সে কি হয় বাছা। না দেখিয়া বিবাহ করিবে, সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয়, তবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারিবে না, এই আমার শপথ রাখিল।’

নির্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল, ‘আমার সেই রেশমের জামা এবং ঢাকাই ধুতিটা বাহির করিয়া দাও।’

মা কহিলেন, ‘কেন, কোথায় যাবি।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘দরকার আছে মা, তুমি দাও- না, আমি পরে বলিব।’

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্য হইলেও কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

দুই বন্ধু কন্যা দেখিতে বাহির হইল।

কন্যার জেঠা শ্যামবাজারের অনুকূলবাবু— নিজের উপার্জিত ধনের দ্বারায় তাহার বাগানসমেত তিনতলা বাড়িটাকে পাঢ়ার মাথার উপর তুলিয়াছেন।

দরিদ্র আতার মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীনা ভাতুপ্পুত্রীকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছেন। মাসি অন্নপূর্ণা বলিয়াছিলেন, ‘আমার কাছে থাক।’ তাহাতে ব্যয়লাঘবের সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু গৌরবলাঘবের ভয়ে অনুকূল রাজি হইলেন না। এমন- কি, দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যও কন্যাকে কখনো মাসির বাড়ি পাঠাইতেন না, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি এতই কড়া ছিলেন।

কন্যাটির বিবাহ- ভাবনার সময় আসিল কিন্তু আজকালকার দিনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ‘যাদশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্বতিতাদৃশী’ কথাটা খাটে না। ভাবনার সঙ্গে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অনুকূল বলেন, ‘আমার তো নিজের মেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিয়া উঠিব।’ এমনি করিয়া দিন বহিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সাজিয়া- গুজিয়া গন্ধ মাখিয়া রঙ্গভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্রমাসের দিবসান্তে সূর্য অঙ্গোনুখ। দোতলার দক্ষিণবারান্দায় চিত্রিত চিঙ্গ চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে দুই অভ্যাগতের জন্য রূপার রেকাবি ফলমূলমিষ্টান্নে শোভমান এবং বরফজলপূর্ণ রূপার গ্লাস শীতল শিশিরবিন্দুজালে মণিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজিতভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল, সেই সিঙ্গ মৃত্তিকার স্লিপ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুভ কৃষ্ণিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দ্বার- জানালার ছিদ্রাত্তরাল হইতে একটু- আধটু চাপা হাসি, ফিসফিস কথা, দুটা- একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।

আহারের পর অনুকূলবাবু ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “চুনি, পান নিয়ে আয় তো রে।”

কিছুক্ষণ পরে সংকোচের ভাবে পশ্চাতের একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি বালিকা কোথা হইতে সর্বাঙ্গে রাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অনুকূলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, ‘লজ্জা কী মা। বাটা ঐ ওঁদের সামনে রাখো।’

বালিকা নত হইয়া কম্পিতহস্তে পানের বাটা অতিথিদের আসন- পার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিম- প্রান্ত হইতে সূর্যাস্ত- আভা তাহার লজ্জিত মুখকে মণিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেন্দ্র সেই কম্পান্তি বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তখনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অনুকূলবাবু কহিলেন, ‘একটু দাঁড়া চুনি। বিহারীবাবু, এইটি আমার ছোটো ভাই অপূর্বর কন্যা। সে তো চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই।’ বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর- এক বার চাহিয়া দেখিল।

কেহ তাহার বয়স স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আতীয়েরা বলিত, “এই বারো- তেরো হইবে।” অর্থাৎ চৌদ্দ-পনেরো হওয়ার সন্তানাই অধিক। কিন্তু অনুগ্রহপালিত বলিয়া একটি কৃষ্ণিত ভীরু ভাবে তাহার নবজীবনারস্তকে সংযত সংবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আর্দ্ধচিত্ত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কী।” অনুকূলবাবু উৎসাহ দিয়া কহিলেন, ‘বলো মা, তোমার নাম বলো।’ বালিকা তাহার অভ্যন্ত আদেশ- পালনের ভাবে নতমুখে বলিল, ‘আমার নাম আশালতা।’

আশা ! মহেন্দ্রের মনে হইল নামটি বড়ে করণ এবং কঠিত বড়ে কোমল। অনাথা আশা !

দুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র কহিল, “বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ো না।”

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, “মেয়েটিকে দেখিয়া উহার মাসিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষ্মী হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার ক্ষন্দে যে বোঝা চাপাইলাম, এখন বোধ হয় তাহার ভার তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।”

বিহারী কহিল, ‘না, বোধ হয় সহ্য করিতে পারিব।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোঝা না হয় আমিই ক্ষন্দে তুলিয়া লই। কী বল।’

বিহারী গম্ভীরভাবে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। কহিল, ‘মহিন্দা, সত্য বলিতেছ? এখনো ঠিক করিয়া বলো। তুমি বিবাহ করিলে কাকী ঢের বেশি খুশি হইবেন— তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে সর্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘তুমি পাগল হইয়াছ? সে হইলে অনেক কাল আগে হইয়া যাইত।’

বিহারী অধিক আপত্তি না করিয়া চলিয়া গেল, মহেন্দ্রও সোজা পথ ছাড়িয়া দীর্ঘ পথ ধরিয়া বহুবিলম্বে ধীরে ধীরে বাড়ি গিয়া পৌঁছিল।

মা তখন লুচিভাজা- ব্যাপারে ব্যন্ত ছিলেন, কাকী তখনো তাহার বোনবির নিকট হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জন ছাদের উপর গিয়া মাদুর পাতিয়া শুইল। কলিকাতার হর্ম্যশিখরপুজোর উপর শুক্লসপ্তমীর অর্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ করিতেছিল। মা যখন খাবার খবর দিলেন, মহেন্দ্র অলসস্বরে কহিল, ‘বেশ আছি, এখন আর উঠিতে পারি না।’

মা কহিলেন, ‘এইখানেই আনিয়া দিই- না?’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আজ আর খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।’

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় খাইতে গিয়াছিলি।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে অনেক কথা, পরে বলিব।”

মহেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

তখন মুহূর্তের মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া অনুতপ্ত মহেন্দ্র কহিল, ‘মা, আমার খাবার এইখানেই আনো।’

মা কহিলেন, “ক্ষুধা না থাকে তো দরকার কী !”

এই লইয়া ছেলেতে মায়েতে কিয়ৎক্ষণ মান- অভিমানের পর মহেন্দ্রকে পুনশ্চ আহারে বসিতে হইল।

অধ্যায় - ৩

রাত্রে মহেন্দ্রের ভালো নিদা হইল না। প্রত্যমেই সে বিহারীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। কহিল, “ভাই, ভাবিয়া দেখিলাম, কাকীমার মনোগত ইচ্ছা আমিই তাঁহার বোনবিকে বিবাহ করি।”

বিহারী কহিল, “সেজন্য তো হঠাৎ নৃতন করিয়া ভাবিবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি তো ইচ্ছা নানাপ্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, আশাকে আমি বিবাহ না করিলে তাঁহার মনে একটা খেদ থাকিয়া যাইবে।”

বিহারী কহিল, “সন্তুষ্ট বটে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমার মনে হয়, সেটা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইবে।”

বিহারী কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক উৎসাহের সহিত কহিল, ‘বেশ কথা, সে তো ভালো কথা, তুমি রাজি হইলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। এ কর্তব্যবুদ্ধি কাল তোমার মাথায় আসিলেই তো ভালো হইত।’

মহেন্দ্র। একদিন দেরিতে আসিয়া কী এমন ক্ষতি হইল।

যেই বিবাহের প্রস্তাবে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ‘আর অধিক কথাবার্তা না হইয়া কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলেই ভালো হয়।’

মাকে গিয়া কহিল, “আচ্ছা মা, তোমার অনুরোধ রাখিব। বিবাহ করিতে রাজি হইলাম।”

মা মনে মনে কহিলেন, ‘বুঝিয়াছি, সেদিন মেজোবউ কেন হঠাৎ তাহার বোনবিকে দেখিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্র সাজিয়া বাহির হইল।’

তাঁহার বারংবার অনুরোধ অপেক্ষা অন্নপূর্ণার চক্রান্ত যে সফল হইল, ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “একটি ভালো মেয়ে সন্ধান করিতেছি।”

মহেন্দ্র আশার উল্লেখ করিয়া কহিল, ‘কন্যা তো পাওয়া গেছে।’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘সে কন্যা হইবে না বাছা, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি।’

মহেন্দ্র যথেষ্ট সংযত ভাষায় কহিল, ‘কেন মা, মেয়েটি তো মন্দ নয়।’

রাজলক্ষ্মী। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমার কুটুম্বের সুখ কী হইবে।

মহেন্দ্র। কুটুম্বের সুখ না হইলেও আমি দুঃখিত হইব না, কিন্তু মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে মা।

ছেলের জেদ দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর চিত্ত আরো কঠিন হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, “বাপ- মা- মরা অলঙ্কণা কন্যার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও? এতবড়ো শয়তানি!”

অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কহিলেন, “মহিনের সঙ্গে বিবাহের কোনো কথাই হয় নাই, সে আপন ইচ্ছামত তোমাকে কী বলিয়াছে আমিও জানি না।”

মহেন্দ্রের মা সে কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তখন অন্নপূর্ণা বিহারীকে ডাকাইয়া সাশ্রমেন্দ্রে কহিলেন, “তোমার সঙ্গেই তো সব ঠিক হইয়াছিল, আবার কেন উলটাইয়া দিলে। আবার তোমাকেই মত দিতে হইবে। তুমি উদ্ধার না করিলে আমাকে বড়ো লজ্জায় পড়িতে হইবে। মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী, তোমার অযোগ্য হইবে না।”

বিহারী কহিল, “কাকীমা, সে কথা আমাকে বলা বাহুল্য। তোমার বোনবি যখন, তখন আমার অমতের কোনো কথাই নাই। কিন্তু মহেন্দ্র—”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না বাঢ়া, মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার কোনোমতেই বিবাহ হইবার নয়। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি, তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হই। মহিনের সঙ্গে সমন্বন্ধে আমার মত নাই।”

বিহারী কহিল, ‘কাকী, তোমার যদি মত না থাকে, তাহা হইলে কোনো কথাই নাই।’

এই বলিয়া সে রাজলক্ষ্মীর নিকটে গিয়া কহিল, “মা, কাকীর বোনবির সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে, আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই— কাজেই লজ্জার মাথা খাইয়া নিজেই খবরটা দিতে হইল।”

রাজলক্ষ্মী। বলিস কী বিহারী। বড়ো খুশি হইলাম। মেয়েটি লক্ষ্মী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিস নে।

বিহারী। হাতছাড়া কেন হইবে। মহিনদা নিজে পছন্দ করিয়া আমার সঙ্গে সমন্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই- সকল বাধাবিষ্টে মহেন্দ্র দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে মা ও কাকীর উপর রাগ করিয়া একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়া আশ্রয় লইল।

রাজলক্ষ্মী কাঁদিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, “মেজোবউ, আমার ছেলে বুঝি উদাস হইয়া ঘর ছাড়িল, তাহাকে রক্ষা করো।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘দিদি, একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকো, দুদিন বাদেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘তুমি তাহাকে জান না। সে যাহা চায়, না পাইলে যাহা- খুশি করিতে পারে। তোমার বোনবির সঙ্গে যেমন করিয়া হউক, তার—’

অন্নপূর্ণা। দিদি, সে কী করিয়া হয়— বিহারীর সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার পাকা হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “সে ভাঙ্গিতে কতক্ষণ।” বলিয়া বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, ‘বাবা, তোমার জন্য ভালো পাত্রী দেখিয়া দিতেছি, এই কন্যাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ তোমার যোগ্যই নয়।’

বিহারী কহিল, ‘না মা, সে হয় না। সে- সমস্তই ঠিক হইয়া গেছে।’

তখন রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, ‘আমার মাথা খাও মেজোবউ, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বিহারীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে।’

অন্নপূর্ণা বিহারীকে কহিলেন, ‘বিহারী, তোমাকে বলিতে আমার মুখ সরিতেছে না, কিন্তু কী করি বলো। আশা তোমার হাতে পড়িলেই আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সব তো জানিতেছই—’

বিহারী। বুঝিয়াছি কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিবে তাহাই হইবে। কিন্তু আমাকে আর কখনো কাহারোও সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না।

বলিয়া বিহারী চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, মহেন্দ্রের অকল্যাণ- আশঙ্কায় মুছিয়া ফেলিলেন। বার বার মনকে বুঝাইলেন— যাহা হইল, তাহা ভালোই হইল।

এইরপ রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে নিষ্ঠুর নিগৃঢ় নীরব ঘাত- প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাপ্ত হইল। বাতি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিল, সানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ লেশমাত্র কম পড়িল না।

আশা সজ্জিতসুন্দরদেহে লজ্জিতমুঞ্ঘমুখে আপন নৃতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোনো কণ্টক আছে, তাহা তাহার কম্পিত- কোমল হৃদয় অনুভব করিল না; বরঞ্চ জগতে তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া আশ্বাসে ও আনন্দে তাহার সর্বপ্রকার ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।

বিবাহের পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, ‘আমি বলি, এখন বউমা কিছুদিন তাঁর জেঠার বাড়ি গিয়াই থাকুন।’

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেন মা।’

মা কহিলেন, ‘এবারে তোমার একজামিন আছে, পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে।’

মহেন্দ্র। আমি কি ছেলেমানুষ। নিজের ভালোমন্দ বুঝে চলিতে পারি না?

রাজলক্ষ্মী। তা হোক- না বাপু, আর- একটা বৎসর বৈ তো নয়।

মহেন্দ্র কহিল, ‘বউয়ের বাপ- মা যদি কেহ থাকিতেন, তাহাদের কাছে পাঠাইতে আপত্তি ছিল না- কি জেঠার বাড়িতে আমি উহাকে রাখিতে পারিব না।’

রাজলক্ষ্মী। (আত্মগত) ওরে বাস্ রে! উনিই কর্তা, শাশুড়ি কেহ নয়! কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ! কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রেণতা, এমন বেহায়াপনা তো তখন ছিল না!

মহেন্দ্র খুব জোরের সহিত কহিল, ‘কিছু ভাবিয়ো না মা। একজামিনের কোনো ক্ষতি হইবে না।’

অধ্যায় - ৪

রাজলক্ষ্মী তখন হঠাত অপরিমিত উৎসাহে বধূকে ঘরকন্নার কাজ শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাঁড়ার- ঘর রান্নাঘর ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি কাটিল, রাত্রে রাজলক্ষ্মী তাহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া তাহার আত্মীয়বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা অনেক বিবেচনা করিয়া বোনবির নিকট হইতে দূরেই থাকিতেন।

যখন কোনো প্রবল অভিভাবক একটা ইক্ষুদণ্ডের সমস্ত রস প্রায় নিঃশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তখন হতাশাস লুক বালকের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর যেমন অসহ্য বাড়িয়া উঠে, মহেন্দ্রের সেই দশা হইল। ঠিক তাহার চোখের সমুখেই নবযৌবনা নববধূর সমস্ত মিষ্টিরস যে কেবল ঘরকন্নার দ্বারা পিষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা কি সহ্য হয়।

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিল, “কাকী, মা বউকে যেরূপ খাটাইয়া মারিতেছেন, আমি তো তাহা দেখিতে পারি না।”

অন্নপূর্ণা জানিতেন রাজলক্ষ্মী বাড়াবাড়ি করিতেছেন, কিন্তু বলিলেন, “কেন মহিন, বউকে ঘরের কাজ শেখানো হইতেছে, ভালোই হইতেছে। এখনকার মেয়েদের মতো নভেল পড়িয়া, কাপেট বুনিয়া, বাবু হইয়া থাকা কি ভালো।”

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, “এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতোই হইবে, তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক। আমার স্ত্রী যদি আমারই মতো নভেল পড়িয়া রস গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহাতে পরিতাপ বা পরিহাসের বিষয় কিছুই দেখি না।”

অন্নপূর্ণার ঘরে পুত্রের কর্তৃস্বর শুনিতে পাইয়া রাজলক্ষ্মী সব কর্ম ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। তীব্রকর্তৃ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী! তোমাদের কিসের পরামর্শ চলিতেছে।”

মহেন্দ্র উত্তেজিতভাবেই বলিল, “পরামর্শ কিছু নয় মা, বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মতো খাটিতে দিতে পারিব না।”

মা তাঁহার উদ্বিষ্ট জ্বালা দমন করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীর ভাবে কহিলেন, ‘তাহাকে লইয়া কী করিতে হইবে!’

মহেন্দ্র কহিল, “তাহাকে আমি লেখাপড়া শিখাইব।”

রাজলক্ষ্মী কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন ও মুহূর্তপরে বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহেন্দ্রের সমুখে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, “এই লও, তোমার বধূকে তুমি লেখাপড়া শেখাও।”

এই বলিয়া অনন্পূর্ণার দিকে ফিরিয়া গলবন্ধ-জোড়করে কহিলেন, ‘মাপ করো মেজোগিনি, মাপ করো। তোমার বোনবির মর্যাদা আমি বুঝিতে পারি নাই, উঁহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি উঁহাকে ধুইয়া মুছিয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও— উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব।’

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে অর্গল বন্ধ করিলেন।

অনন্পূর্ণা ক্ষেত্রে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। আশা এই আকস্মিক গৃহবিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া লজ্জায় ভয়ে দুঃখে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগিয়া মনে মনে কহিল, ‘আর নয়, নিজের স্ত্রীর ভার নিজের হাতে লইতেই হইবে, নহিলে অন্যায় হইবে।’

ইচ্ছার সহিত কর্তব্যবুদ্ধি মিলিত হইতেই হাওয়ার সঙ্গে আগুন লাগিয়া গেল। কোথায় গেল কালেজ, একজামিন, বন্ধুকৃত্য, সামাজিকতা; স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে মহেন্দ্র তাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল— কাজের প্রতি দৃক্পাত বা লোকের প্রতি জ্ঞানেপমাত্রও করিল না।

অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী মনে মনে কহিলেন, ‘মহেন্দ্র যদি এখন তার বউকে লইয়া আমার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়ে, তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কেমন করিয়া কাটায়।’

দিন যায়— দ্বারের কাছে কোনো অনুতঙ্গের পদশব্দ শুনা গেল না।

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, ক্ষমা চাহিতে আসিলে ক্ষমা করিবেন, নহিলে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হইবে।

ক্ষমার আবেদন আসিয়া পৌঁছিল না। তখন রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, তিনি নিজে গিয়াই ক্ষমা করিয়া আসিবেন। ছেলে অভিমান করিয়া আছে বলিয়া কি মাও অভিমান করিয়া থাকিবে।

তেলোর ছাদের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র গৃহে মহেন্দ্রের শয়ন এবং অধ্যয়নের স্থান। এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো, বিছানা তৈরি, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যন্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভাবিলেন, ‘মহেন্দ্র এতক্ষণে কালেজে গেছে, এই অবকাশে তাহার ঘর ঠিক করিয়া আসি, কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলেই সে অবিলম্বে বুঝিতে পারিবে তাহার ঘরে মাতৃহস্ত পঢ়িয়াছে।’

রাজলক্ষ্মী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। মহেন্দ্রের শয়নগৃহের একটা দ্বার খোলা ছিল, তাহার সমুখে আসিতেই যেন হঠাৎ কাঁটা বিঁধিল, চমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, নীচের বিছানায় মহেন্দ্র নিদিত এবং দ্বারের দিকে পশ্চাত করিয়া বধূ ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মধ্যাহ্নের প্রথম আলোকে উন্মুক্ত দ্বারে দাম্পত্যলীলার এই অভিনয় দেখিয়া রাজলক্ষ্মী লজ্জায় ধিক্কারে সংকুচিত হইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন।

অধ্যায় - ৫

কিছুকাল অনাব্ধিতে যে শস্যদল শুক্র পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মায়তার দাবি করিতে পায় নাই; আজ পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দিন্ধ অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অযত্নলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, নববধূযোগ্য লজ্জাভয় দূর করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রাপ্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।

রাজলক্ষ্মী সেদিন মধ্যাহ্নে সেই সিংহাসনে এই নৃতন- আগত পরের মেয়েকে এমন চিরাভ্যস্তবৎ স্পর্ধার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুঃসহ বিস্যৱে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিজের চিন্তাহে অন্নপূর্ণাকে দন্ধ করিতে গেলেন। কহিলেন, “ওগো, দেখো গে, তোমার নবাবের পুত্রী নবাবের ঘর হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কর্তারা থাকিলে আজ—”

অন্নপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, ‘‘দিদি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।’’

রাজলক্ষ্মী ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, ‘‘আমার বউ? তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্য করিবে !’’

তখন অন্নপূর্ণা সশব্দপদক্ষেপে দম্পতিকে সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগ্রহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, ‘‘তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ির উপর সমস্ত ঘরকল্প চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম !’’

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আশাও নতমুখে বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে

কাঁদিতে
দাঁড়াইয়া

লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘কাকী, তুমি বউকে কেন অন্যায় ভর্তসনা করিতেছ। আমিই তো উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি।’’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘‘সে কি ভালো কাজ করিয়াছ? ও বালিকা, অনাথা, মার কাছ হইতে কোনোদিন কোনো শিক্ষা পায় নাই, ও ভালোমন্দর কী জানে। তুমি উহাকে কী শিক্ষা দিতেছ ?’’

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘এই দেখো, উহার জন্যে স্লেট খাতা বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে লেখাপড়া শিখাইব, তা লোকে নিন্দাই করুক আর তোমরা রাগই কর।’’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘তাই কি সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর এক- আধ ঘণ্টা পড়ালেই তো চের হয়।’

মহেন্দ্র। অত সহজ নয় কাকী, পড়াশুনায় একটু সময়ের দরকার হয়।

অন্নপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশা ও ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণের উপক্রম করিল— মহেন্দ্র দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আশার করণ সজল নেত্রের কাতর অনুনয় মানিল না। কহিল, ‘রোসো, ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, সেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।’

এমন গন্তীরপ্রকৃতির শ্রদ্ধেয় মৃচ্ছ থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নির্দাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে; বিশেষরূপে তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যিক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনকার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইল্লিপেট্রেল তাহার অনুমোদন করিবেন না।

আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বস্তুতই মনে করিয়াছিল লেখাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদেশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গন্তীর হইয়া বসিত এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা দুলাইয়া মুখস্থ করিতে আরস্ত করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চৌকিতে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেন্দ্র আশার ডাক- নাম ধরিয়া ডাকিল, “চুনি।” চকিত আশা মুখ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্র কহিল, ‘বইটা আনো দেখি, দেখি কোন্খানটা পড়িতেছ।’

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চারুপাঠের চারুত্ব- প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বলীক সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলো ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেন্দ্রের চৌকির পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশ বেষ্টনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে, ‘আজ কতটা পড়িলে দেখি।’ আশা যতগুলা লাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুঁন্স্বরে বলে, ‘উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?’ বলিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো- একটা অধ্যায়ের শিরোনামাটুকু মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিস্ময়ে চোখদুটা ডাগর করিয়া বলে, ‘তবে এতক্ষণ কী করিতেছিলে।’ মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, ‘আমি একজনের কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু যাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভুলিয়া ছিল।’ আশা এই অমূলক অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত— কিন্তু হায়, কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো একদিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই— সেই সুযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, “নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক?”

আশা কহিল, ‘‘তুমি আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিবে?’’

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘তোমার কল্যাণে আমারই বা বিদ্যা এমনই কী অগ্রসর হইতেছে।’’

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল; তৎক্ষণাত চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, ‘‘আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।’’

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, ‘‘তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।’’

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পসলার মতো এক দফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অন্তিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাসিমার তীব্র ভ্ৰৎসনা মনে পড়িয়া চিন্ত বিচলিত হয়— বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র; শাশুড়িকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ি তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাশুড়ির গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেলে তিনি ব্যক্তসমন্ত হইয়া বলেন, ‘‘কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।’’

অবশ্যে অন্ধপূর্ণ আশাকে কহিলেন, ‘‘তোর যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।’’

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল, মহেন্দ্রকে বলিল, ‘‘তোমার একজামিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব।’’

এ বয়সে এতবড়ো কঠিন সন্ন্যাসব্রত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন ! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কর্তৃপক্ষের রূপন্দৰ্পায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘তবে তাই চলো, কাকীর ঘরেই যাওয়া যাক— কিন্তু তাহা হইলে তাহাকে উপরে আমাদের ঘরে আসিতে হইবে।’’

আশা এতবড়ো উদার গন্তব্যে প্রস্তাবে পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া রাগ করিল। মহেন্দ্র কহিল, ‘‘তার চেয়ে তুমি স্বয়ং দিনরাত্রি আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দাও, দেখো আমি একজামিনের পড়া মুখস্থ করি কি না।’’

অতি সহজেই সেই কথা স্থির হইল। চোখে চোখে পাহারার কার্য কিরূপ ভাবে নির্বাহ হইত তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে বৎসর মহেন্দ্র

পরীক্ষায় ফেল করিল এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও পুরুষজ্ঞ সম্মতে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না।

এইরপ অপূর্ব পঠন- পাঠন- ব্যাপার যে সম্পূর্ণ নির্বিশে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বিহারী মাঝে মাঝে আসিয়া অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিত। ‘মহিনদা মহিনদা’ করিয়া সে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিত। মহেন্দ্রকে তাহার শয়নগৃহের বিবর হইতে টানিয়া না বাহির করিয়া সে কোনোমতেই ছাড়িত না। পড়ায় শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া সে মহেন্দ্রকে বিস্তর ভরৎসনা করিত।

আশাকে বলিত, ‘বোঠান, গিলিয়া খাইলে হজম হয় না, চিবাইয়া খাইতে হয়। এখন সমস্ত অন্ন এক গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজমি গুলি খুঁজিয়া পাইবে না।’

মহেন্দ্র বলিত, ‘চুনি, ও কথা শুনিয়ো না— বিহারী আমাদের সুখে হিংসা করিতেছে।’

বিহারী বলিত, ‘সুখ যখন তোমার হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ করো যাহাতে পরের হিংসা না হয়।’

মহেন্দ্র উত্তর করিত, ‘পরের হিংসা পাইতে যে সুখ আছে। চুনি, আর- একটু হইলেই আমি গর্দভের মতো তোমাকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম।’

বিহারী রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত, ‘চুপ।’

এই- সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে বিহারীর উপরে ভারি বিরক্ত হইত। এক সময়ে তাহার সহিত বিহারীর বিবাহ- প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার একপ্রকার বিমুখ ভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেন্দ্র তাহা লইয়া আমোদ করিত।

রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকিয়া দুঃখ করিতেন। বিহারী কহিত, ‘মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে তখন তত বেশি ভয় নয়, কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায় তখন ফেরানো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।’

মহেন্দ্রের ফেল- করা সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মতো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার গর্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অন্নপূর্ণা। তাহার আহারনিদ্বা দূর হইল।

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যদল শুক্র পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মায়তার দাবি করিতে পায় নাই; আজ পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দিধ্ব অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অযত্নলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, নববধূযোগ্য লজ্জাভয় দূর করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রাপ্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।

রাজলক্ষ্মী সেদিন মধ্যাহ্নে সেই সিংহাসনে এই নৃতন- আগত পরের মেয়েকে এমন চিরাভ্যস্তবৎ স্পর্ধার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুঃসহ বিস্যায়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিজের চিন্দাহে অন্নপূর্ণাকে দন্ত করিতে গেলেন। কহিলেন, “ওগো, দেখো গে, তোমার নবাবের পুত্রী নবাবের ঘর হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কর্তারা থাকিলে আজ—”

অন্নপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, ‘‘দিদি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।’’

রাজলক্ষ্মী ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, ‘‘আমার বউ? তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্য করিবে !’’

তখন অন্নপূর্ণা সশব্দপদক্ষেপে দম্পতিকে সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগ্রহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, ‘‘তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ির উপর সমস্ত ঘরকল্প চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম !’’

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আশাও নতমুখে বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে
দাঁড়াইয়া
কাঁদিতে
লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘কাকী, তুমি বউকে কেন অন্যায় ভরৎসনা করিতেছ। আমিই তো উহাকে ধরিয়া
রাখিয়াছি।’’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘‘সে কি ভালো কাজ করিয়াছ? ও বালিকা, অনাথা, মার কাছ হইতে কোনোদিন কোনো
শিক্ষা পায় নাই, ও ভালোমন্দর কী জানে। তুমি উহাকে কী শিক্ষা দিতেছ?’’

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘এই দেখো, উহার জন্যে স্লেট খাতা বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে লেখাপড়া
শিখাইব, তা লোকে নিন্দাই করুক আর তোমরা রাগই কর।’’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘‘তাই কি সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর এক- আধ ঘণ্টা পড়ালেই তো তের
হয়।’’

মহেন্দ্র। অত সহজ নয় কাকী, পড়াশুনায় একটু সময়ের দরকার হয়।

অন্নপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশাও ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণের উপক্রম
করিল— মহেন্দ্র দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আশার করুণ সজল নেত্রের কাতর অনুনয় মানিল না। কহিল,
‘‘রোসো, ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, সেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।’’

এমন গন্তীরপ্রকৃতির শ্রদ্ধেয় মৃঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময়
নষ্ট করিয়াছে; বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যিক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপনকার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইন্সপেক্টর তাহার অনুমোদন করিবেন না।

আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বন্ধুতই মনে করিয়াছিল লেখাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদেশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গন্তীর হইয়া বসিত এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা দুলাইয়া মুখস্থ করিতে আরস্ত করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চৌকিতে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেন্দ্র আশার ডাক-নাম ধরিয়া ডাকিল, “চুনি।” চকিত আশা মুখ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্র কহিল, “বইটা আনো দেখি, দেখি কোন্খানটা পড়িতেছ।”

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চারুপাঠের চারুত্ত-প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বল্মীক সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলো ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেন্দ্রের চৌকির পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কঠিদেশ বেষ্টনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে, ‘আজ কতটা পড়িলে দেখি।’ আশা যতগুলা লাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, ‘উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?’ বলিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো-একটা অধ্যায়ের শিরোনামাটুকু মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিস্ময়ে চোখদুটা ডাগর করিয়া বলে, ‘তবে এতক্ষণ কী করিতেছিলে।’ মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, ‘আমি একজনের কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু যাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভুলিয়া ছিল।’ আশা এই অমূলক অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত— কিন্তু হায়, কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো একদিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই— সেই সুযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, ‘নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক?’

আশা কহিল, ‘তুমি আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিবে?’

মহেন্দ্র কহিল, ‘তোমার কল্যাণে আমারই বা বিদ্যা এমনই কী অগ্রসর হইতেছে।’

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল; তৎক্ষণাত চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, ‘আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।’

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, ‘তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।’

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পসলার মতো এক দফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সুর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাসিমার তীব্র ভর্ত্সনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়— বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র; শাঙ্গড়িকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাঙ্গড়ি তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না; অনন্দিষ্ট হইয়া আশা শাঙ্গড়ির গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, “কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।”

অবশ্যে অন্নপূর্ণা আশাকে কহিলেন, ‘তোর যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।’

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল, মহেন্দ্রকে বলিল, “তোমার এক্জামিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব।”

এ বয়সে এতবড়ো কঠিন সন্ধ্যাস্বরত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন ! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কর্তৃস্বর রূদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, ‘তবে তাই চলো, কাকীর ঘরেই যাওয়া যাক— কিন্তু তাহা হইলে তাহাকে উপরে আমাদের ঘরে আসিতে হইবে।’

আশা এতবড়ো উদার গন্তব্যে প্রস্তাবে পরিহাস প্রাণ্ত হইয়া রাগ করিল। মহেন্দ্র কহিল, ‘তার চেয়ে তুমি স্বয়ং দিনরাত্রি আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দাও, দেখো আমি এক্জামিনের পড়া মুখস্থ করি কি না।’

অতি সহজেই সেই কথা স্থির হইল। চোখে চোখে পাহারার কার্য কিরূপ ভাবে নির্বাহ হইত তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করিল এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও পুরুভুজ সমষ্টে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না।

এইরূপ অপূর্ব পঠন- পাঠন- ব্যাপার যে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বিহারী মাঝে মাঝে আসিয়া অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিত। ‘মহিনদা মহিনদা’ করিয়া সে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিত। মহেন্দ্রকে তাহার শয়নগৃহের বিবর হইতে টানিয়া না বাহির করিয়া সে কোনোমতেই ছাঢ়িত না। পড়ায় শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া সে মহেন্দ্রকে বিস্তর ভর্ত্সনা করিত।

আশাকে বলিত, ‘বোঠান, গিলিয়া খাইলে হজম হয় না, চিবাইয়া খাইতে হয়। এখন সমস্ত অন্ন এক গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজমি গুলি খুঁজিয়া পাইবে না।’

মহেন্দ্র বলিত, ‘চুনি, ও কথা শুনিয়ো না— বিহারী আমাদের সুখে হিংসা করিতেছে।’

বিহারী বলিত, ‘‘সুখ যখন তোমার হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ করো যাহাতে পরের হিংসা না হয়।’’

মহেন্দ্র উভর করিত, “পরের হিংসা পাইতে যে সুখ আছে। চুনি, আর- একটু হইলেই আমি গর্দভের মতো তোমাকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম।”

বিহারী রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত, “চুপ!”

এই- সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে বিহারীর উপরে ভারি বিরক্ত হইত। এক সময়ে তাহার সহিত বিহারীর বিবাহ- প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার একপ্রকার বিমুখ ভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেন্দ্র তাহা লইয়া আমোদ করিত।

রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকিয়া দুঃখ করিতেন। বিহারী কহিত, “মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে তখন তত বেশি ভয় নয়, কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায় তখন ফেরানো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।”

মহেন্দ্রের ফেল- করা সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মতো দাউ দাউ করিয়া জ্বালিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার গর্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অন্নপূর্ণা। তাহার আহারনিদ্রা দূর হইল।

অধ্যায় - ৬

একদিন নববর্ষার বর্ষণমুখরিত মেঘাচ্ছন্ন সায়াহে গায়ে একখানি সুবাসিত ফুরফুরে চাদর এবং গলায় একগাছি ঝুঁইফুলের গোড়ে মালা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দমনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। হঠাৎ আশাকে বিস্ময়ে চকিত করিবে বলিয়া জুতার শব্দ করিল না। ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, পুর দিকের খোলা জানালা দিয়া প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাট লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, বাতাসে দীপ নিবিয়া গেছে এবং আশা নীচের বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তকর্ত্ত্বে কাঁদিতেছে।

মহেন্দ্র দ্রুতপদে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কী হইয়াছে।”

বালিকা দ্বিতীয় আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র ক্রমশ উত্তর পাইল যে, মাসিমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পিসতুত ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেছেন।

মহেন্দ্র রাগিয়া মনে করিল, ‘গেলেন যদি, এমন বাদলার সন্ধ্যাটা মাটি করিয়া গেলেন।’

শেষকালে সমস্ত রাগ মাতার উপরে পড়িল। তিনিই তো সকল অশান্তির মূল।

মহেন্দ্র কহিল, ‘কাকী যেখানে গেছেন, আমরাও সেইখানে যাইব, দেখি, মা কাহাকে লইয়া বাগড়া করেন।’

বলিয়া অনাবশ্যক শোরগোল করিয়া জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি মুটে- ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলেন। ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইতেছিস।”

মহেন্দ্র প্রথমে কোনো উত্তর করিল না। দুই- তিন বার প্রশ্নের পর উত্তর করিল, “কাকীর কাছে যাইব।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘তোদের কোথাও যাইতে হইবে না, আমিই তোর কাকীকে আনিয়া দিতেছি।’

বলিয়া তৎক্ষণাত পালকি চড়িয়া অন্নপূর্ণার বাসায় গেলেন। গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, “প্রসন্ন হও মেজোবউ, মাপ করো।”

অন্নপূর্ণা শশব্যন্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, “দিদি, কেন আমাকে অপরাধী
করিতেছ।
তুমি যেমন আজ্ঞা করিবে তাই করিব।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে- বউ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।” বলিতে বলিতে অভিমানে ক্রোধে ধিক্কারে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দুই জা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের ঘরে যখন গেলেন তখন আশার রোদন শান্ত হইয়াছে এবং মহেন্দ্র নানা কথার ছলে তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয় বাদলার সন্ধ্যাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না যাইতেও পারে।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “চুনি, তুই আমাকে ঘরেও থাকতে দিবি না, অন্য কোথাও গেলেও সঙ্গে লাগিবি? আমার কি কোথাও শান্তি নাই?”

আশা অকস্মাত বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র একান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, “কেন কাকী, চুনি তোমার কী করিয়াছে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বউ- মানুষের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শাশুড়িকে কাঁদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিল পোড়ারমুখী।”

জীবনের কবিত- অধ্যায়ে মা খুঁড়ী যে এমন বিষ্ণ, তাহা মহেন্দ্র জানিত না।

পরদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “বাছা, তুমি একবার মহিনকে বলো, অনেক দিন দেশে যাই নাই, আমি বারাসতে যাইতে চাই।”

বিহারী কহিল, “অনেক দিনই যখন যান নাই তখন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহিনদাকে বলিয়া দেখি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হইবে তা বোধ হয় না।”

মহেন্দ্র কহিল, “তা, জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বেশি দিন মার সেখানে না থাকাই ভালো- বর্ষার সময় জায়গাটা ভালো নয়।”

মহেন্দ্র সহজেই সম্মতি দিল দেখিয়া বিহারী বিরক্ত হইল। কহিল, ‘‘মা একলা যাইবেন, কে তাহাকে দেখিবে। বৌঠানকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও- না!’’ বলিয়া একটু হাসিল।

বিহারীর গুঢ় ভরৎসনায় মহেন্দ্র কৃষ্ণিত হইয়া কহিল, ‘‘তা বুঝি আর পারি না।’’

কিন্তু কথাটা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইল না।

এমনি করিয়াই বিহারী আশাৰ চিন্ত বিমুখ করিয়া দেয়, এবং আশা তাহার উপরে বিরক্ত হইতেছে মনে করিয়া সে যেন একপ্রকারের শুক্ষ আমোদ অনুভব করে।

বলা বাঞ্ছ্য, রাজলক্ষ্মী জন্মস্থান দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন না। গ্রীষ্মে নদী যখন কমিয়া আসে তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে কোথায় কত জল, রাজলক্ষ্মীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লগি ফেলিয়া দেখিতেছিলেন। তাহার বারাসতে যাওয়ার প্রস্তাব যে এত শীত্র এত সহজেই তল পাইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। মনে মনে কহিলেন, ‘‘অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগে এবং আমার গৃহত্যাগে প্রভেদ আছে- সে হইল মন্ত্র- জানা ডাইনী আর আমি হইলাম শুন্দমাত্র মা, আমার যাওয়াই ভালো।’’

অন্নপূর্ণা ভিতরকার কথাটা বুঝিলেন, তিনি মহেন্দ্রকে বলিলেন, ‘‘দিদি গেলে আমিও থাকিতে পারিব না।’’

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে কহিল, ‘শুনিতেছ মা? তুমি গেলে কাকীও যাইবেন, তাহা হইলে আমাদের ঘরের
কাজ চলিবে কী
করিয়া।’

রাজলক্ষ্মী বিদেশবিষে জর্জরিত হইয়া কহিলেন, ‘তুমি যাইবে মেজোবড়? এও কি কখনো হয়। তুমি গেলে
চলিবে কী করিয়া। তোমার থাকা চাই-ই।’

রাজলক্ষ্মীর আর বিলম্ব সহিল না। পরদিন মধ্যাহ্নেই তিনি দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত। মহেন্দ্রই যে
তাহাকে দেশে রাখিয়া আসিবে, এ বিষয়ে বিহারীর বা আর- কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সময়কালে
দেখা গেল, মহেন্দ্র মার সঙ্গে একজন সরকার ও দারোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিহারী কহিল, ‘মহিন্দা, তুমি যে এখনো তৈরি হও নাই?’

মহেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, ‘আমার আবার কালেজের—’

বিহারী কহিল, ‘আচ্ছা তুমি থাকো, মাকে আমি পৌছাইয়া দিয়া আসিব।’

মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। বিরলে আশাকে কহিল, ‘বাস্তবিক, বিহারী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। ও
দেখাইতে চায়, যেন ও আমার চেয়ে মার কথা বেশি ভাবে।’

অন্নপূর্ণাকে থাকিতে হইল, কিন্তু তিনি লজ্জায় ক্ষেত্রে ও বিরক্তিতে সংকুচিত হইয়া রহিলেন। খুড়ীর
এইরূপ দূরভাব দেখিয়া মহেন্দ্র রাগ করিল এবং আশাও অভিমান করিয়া রহিল।

অধ্যায় - ৭

রাজলক্ষ্মী জন্মভূমিতে পৌছিলেন। বিহারী তাহাকে পৌছাইয়া চলিয়া আসিবে এরূপ কথা ছিল, কিন্তু সেখানকার অবঙ্গ দেখিয়া, সে ফিরিল না।

রাজলক্ষ্মীর পৈতৃক বাটীতে দুই- একটি অতিবৃদ্ধা বিধবা বাঁচিয়া ছিলেন মাত্র। চারি দিকে ঘন জঙ্গল ও বাঁশবন, পুকুরগীর জল সবুজবর্ণ, দিনে- দুপুরে শেয়ালের ডাকে রাজলক্ষ্মীর চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

বিহারী কহিল, ‘‘মা, জন্মভূমি বটে, কিন্তু ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’ কোনোমতেই বলিতে পারি না। কলিকাতায় চলো। এখানে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমার অধর্ম হইবে।’’

রাজলক্ষ্মীরও প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া তাহাকে আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল।

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে মহেন্দ্র এবং তদভাবে বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিধিনির্বক্ষে যাহার সহিত তাহার শুভবিবাহ হয়, সে লোকটির সমস্ত অন্তরিদ্বিয়ের মধ্যে প্লীহাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। সেই প্লীহার অতিভাবেই সে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারিল না।

তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মুহ্যমান ভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। অদ্য সেই অনাথা আসিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী পিস্শাশ্ঠাকরণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।

সেবা ইহাকেই বলে। মুহূর্তের জন্য আলস্য নাই। কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন সুন্দর রান্না, কেমন সুমিষ্ট কথাবার্তা।

রাজলক্ষ্মী বলেন, ‘‘বেলা হইল মা, তুমি দুটি খাও গে যাও।’’

সে কি শোনে? পাখা করিয়া পিসিমাকে ঘুম না পাঢ়াইয়া সে উঠে না।

রাজলক্ষ্মী বলেন, ‘‘এমন করিলে যে তোমার অসুখ করিবে মা।’’

বিনোদিনী নিজের প্রতি নিরতিশয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলে, ‘‘আমাদের দুঃখের শরীরে অসুখ করে না পিসিমা। আহা কতদিন পরে জন্মভূমিতে আসিয়াছ, এখানে কী আছে, কী দিয়া তোমাকে আদর করিব।’’

বিহারী দুইদিনে পাড়ার কর্তা হইয়া উঠিল। কেহ তার কাছে রোগের ঔষধ কেহ- বা মোকদ্দমার পরামর্শ লইতে আসে, কেহ- বা নিজের ছেলেকে বড়ো আপিসে কাজ জুটাইয়া দিবার জন্য তাহাকে ধরে, কেহ- বা তাহার কাছে দরখাস্ত লিখাইয়া লয়। বৃন্দদের তাসপাশার বৈঠক হইতে বাগ্দিদের তাড়িপানসভা পর্যন্ত সর্বত্র সে তাহার সকৌতুক কৌতুহল এবং স্বাভাবিক হণ্ড্যতা লইয়া যাতায়াত করিত- কেহ তাহাকে দূর মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত।

বিনোদিনী এই অঙ্গনে পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্বাসনদণ্ডও যথাসাধ্য লঘু করিবার জন্য অন্তঃপুরের অন্তরাল হইতে চেষ্টা করিত। বিহারী প্রত্যেক বার পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেক বার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একটি কাঁসার প্লাসে দু- চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির এক ধারে বক্ষিম ও দীনবপ্নুর গুঞ্জাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অর্থচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের সহিত ইহার একটু প্রভেদ ছিল। বিহারী তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজলক্ষ্মী কহিতেন, “এই মেয়েকে কিনা তোরা অগ্রাহ্য করিলি।”

বিহারী হাসিয়া কহিত, “ভালো করি নাই মা, ঠকিয়াছি। কিন্তু বিবাহ না করিয়া ঠকা ভালো, বিবাহ করিয়া ঠকিলেই মুশ্কিল।”

রাজলক্ষ্মী কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, ‘আহা, এই মেয়েই তো আমার বধূ হইতে পারিত। কেন হইল না।’

রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিবার প্রসঙ্গমাত্র উথাপন করিলে বিনোদিনীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। সে বলিত, “পিসিমা, তুমি দুদিনের জন্যে কেন এলে ! যখন তোমাকে জানিতাম না, দিন তো একরকম করিয়া কাটিত। এখন তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব।”

রাজলক্ষ্মী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, “মা, তুই আমার ঘরের বউ হলি নে কেন, তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম।”

সে কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোনো ছুতায় লজ্জায় সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

রাজলক্ষ্মী কলিকাতা হইতে একটা কাতর অনুনয়পত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহার মহিন জন্মাবধি কখনো এতদিন মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই— নিশ্চয় এতদিনে মার বিচ্ছেদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। রাজলক্ষ্মী তাঁহার ছেলের অভিমান এবং আবদারের সেই চিঠিখানির জন্য ত্রুষ্ট হইয়া ছিলেন।

বিহারী মহেন্দ্রের চিঠি পাইল। মহেন্দ্র লিখিয়াছে, ‘মা বোধ হয় অনেক দিন পরে জন্মভূমিতে গিয়া বেশ সুখে আছেন।’

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, ‘আহা, মহেন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছে। সুখে আছেন ! হতভাগিনী মা নাকি মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া কোথাও সুখে থাকিতে পারে।’

“ও বিহারী, তার পরে মহিন কী লিখিয়াছে, পড়িয়া শোনা- না বাছা।”

বিহারী কহিল, “তার পরে কিছুই না মা।” বলিয়া চিঠিখানা মুঠার মধ্যে দলিত করিয়া একটা বহির মধ্যে পুরিয়া ঘরের এক কোণে ধপ করিয়া ফেলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী কি আর স্থির থাকিতে পারেন। নিশ্চয়ই মহিন মার উপর এমন রাগ করিয়া লিখিয়াছে যে, বিহারী তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইল না।

বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুঃখ এবং বাংসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাঁহার অবরুদ্ধ বাংসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল। তিনি মহেন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। কহিলেন, ‘আহা, বউ লইয়া মহিন সুখে আছে, সুখে থাক— যেমন করিয়া হোক সে সুখী হোক। বউকে লইয়া আমি তাহাকে আর কোনো কষ্ট দিব না। আহা, যে মা কখনো তাহাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সেই মা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মহিন মার ‘পরে রাগ করিয়াছে!’ বার বার তাঁর চোখ দিয়া জল উচলিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে বার বার আসিয়া বলিলেন, “যাও বাবা, তুমি স্নান করো গে যাও। এখানে তোমার বড়ো অনিয়ম হইতেছে।”

বিহারীরও সেদিন স্নানহারে যেন প্রবৃত্তি ছিল না; সে কহিল, ‘মা, আমার মতো লক্ষ্মীছাড়ারা অনিয়মেই ভালো থাকে।’

রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিয়া কহিলেন, ‘না বাছা, তুমি স্নান করিতে যাও।’

বিহারী সহস্র বার অনুরুদ্ধ হইয়া নাহিতে গেল। সে ঘরের বাহির হইবামাত্রই রাজলক্ষ্মী বহির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি সেই কুণ্ঠিতদলিত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইলেন।

বিনোদিনীর হাতে চিঠি দিয়া কহিলেন, ‘দেখো তো মা, মহিন বিহারীকে কী লিখিয়াছে।’

বিনোদিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। মহেন্দ্র প্রথমটা মার কথা লিখিয়াছে; কিন্তু সে অতি অল্পই, বিহারী যতটুকু শুনাইয়াছিল তাহার অধিক নহে।

তার পরেই আশার কথা। মহেন্দ্র রঞ্জে রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল হইয়া লিখিয়াছে।

বিনোদিনী একটুখানি পড়িয়া শুনাইয়াই লজ্জিত হইয়া থামিয়া কহিল, ‘পিসিমা, ও আর কী শুনিবে।’

রাজলক্ষ্মীর মেহব্যগ্র মুখের ভাব এক মুহূর্তের মধ্যেই পাথরের মতো শক্ত হইয়া যেন জমিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, ‘থাক।’ বলিয়া চিঠি ফেরত না লইয়াই চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী সেই চিঠিখানা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্চাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্পন্ন হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র- আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলই পাক খাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পা ছড়াইয়া দেয়ালের উপর হেলান দিয়া অনেকক্ষণ সমুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের সে চিঠি বিহারী আর খুজিয়া পাইল না।

সেইদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ অন্নপূর্ণা আসিয়া উপস্থিত। দুঃসংবাদের আশঙ্কা করিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকটা হঠাৎ কঁপিয়া উঠিল— কোনো প্রশ্ন করিতে তিনি সাহস করিলেন না, অন্নপূর্ণার দিকে পাংশুবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘‘দিদি, কলিকাতার খবর সব ভালো।’’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘‘তবে তুমি এখানে যে?’’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘‘দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার তুমি লও’সে। আমার আর সংসারে মন নাই। আমি কাশী যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আসিলাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো। আর তোমার বউ, (বলিতে বলিতে চোখ ভরিয়া উঠিয়া জল পড়িতে লাগিল) সে ছেলেমানুষ, তার মা নাই, সে দোষী হোক নির্দোষ হোক সে তোমার।’’ আর বলিতে পারিলেন না।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। বিহারী খবর পাইয়া গদাই ঘোষের চগ্নীমণ্ডপ হইতে ছুটিয়া আসিল। অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া কহিল, ‘‘কাকীমা, সে কি হয়? আমাদের তুমি নির্মম হইয়া ফেলিয়া যাইবে?’’

অন্নপূর্ণা অশ্রু দমন করিয়া কহিলেন, ‘‘আমাকে আর ফিরাইবার চেষ্টা করিস নে, বেহারি— তোরা সব সুখে থাক্, আমার জন্যে কিছুই আটকাইবে না।’’

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে কহিল, ‘‘মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে সে বিদায় করিয়া দিল।’’

অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া কহিলেন, ‘‘অমন কথা বলিস নে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।’’

বিহারী দূরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা অঞ্চল হইতে এক জোড়া মোটা সোনার বালা খুলিয়া কহিলেন, ‘‘বাবা, এই বালাজোড়া তুমি রাখো— বউমা যখন আসিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়ো।’’

বিহারী বালাজোড়া মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘‘বেহারি, আমার মহিনকে আর আমার আশাকে দেখিস। রাজলক্ষ্মীর হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, ‘‘শঙ্গরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মাসে মাসে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।’’

বলিয়া ভূতলে পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থদেশে যাত্রা করিলেন।

অধ্যায় - ৮

আশা কেমন ভয় পাইয়া গেল। এ কী হইল। মা চলিয়া যান, মাসিমা চলিয়া যান। তাহাদের সুখ যেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন তাহাকেই তাড়াইবার পালা। পরিত্যক্ত শূন্য গৃহস্থালির মাঝাখানে দাম্পত্যের নৃতন প্রেমলীলা তাহার কাছে কেমন অসংগত ঠেকিতে লাগিল।

সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্শ ও বিকৃত হইয়া আসে। আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল, তাহাদের অবিশ্রাম মিলনের মধ্যে একটা শ্রান্তি ও দুর্বলতা আছে। সে মিলন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মুষড়িয়া পড়ে— সংসারের দৃঢ় ও প্রশস্ত আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে টানিয়া খাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

মহেন্দ্রও আপনার বিমুখ সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আপন প্রেমোৎসবের সকল বাতিগুলাই একসঙ্গে জ্বালাইয়া খুব সমারোহের সহিত শূন্যগুহের অকল্যাণের মধ্যে মিলনের আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা করিল। আশার মনে সে একটুখানি খোঁচা দিয়াই কহিল, ‘চুনি, তোমার আজকাল কী হইয়াছে বলো দেখি। মাসি গেছেন, তা লইয়া অমন মন ভার করিয়া আছ কেন। আমাদের দুজনার ভালোবাসাতেই কি সকল ভালোবাসার অবসান নয়।’

আশা দুঃখিত হইয়া ভাবিত, ‘তবে তো আমার ভালোবাসায় একটা কী অসম্পূর্ণতা আছে। আমি তো মাসির কথা প্রায়ই ভাবি; শাশুড়ি চলিয়া গেছেন বলিয়া তো আমার ভয় হয়।’ তখন সে প্রাণপণে এই-সকল প্রেমের অপরাধ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে।

এখন গৃহকর্ম ভালো করিয়া চলে না— চাকরবাকরেরা ফাঁকি দিতে আরস্ত করিয়াছে। একদিন বি অসুখ করিয়াছে বলিয়া আসিল না, বামুনঠাকুর মদ খাইয়া নিরন্দেশ হইয়া রহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল, ‘বেশ মজা হইয়াছে, আজ আমরা নিজেরা রঞ্জনের কাজ সারিয়া লইব।’

মহেন্দ্র গাড়ি করিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করিতে গেল। কোন জিনিসটা কী পরিমাণে দরকার, তাহা তাহার কিছুমাত্র জানা ছিল না— কতকগুলা বোৰা লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিল। সেগুলা লইয়া যে কী করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালোৱপ জানে না। পরীক্ষায় বেলা দুটা-তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভূতপূর্ব অখাদ্য উদ্ভাবন করিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল। আশা মহেন্দ্রের আমোদে যোগ দিতে পারিল না, আপন অঙ্গতা ও অক্ষমতায় মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিসপত্রের এমনি বিশ্বঙ্গলা ঘটিয়াছে যে, আবশ্যকের সময়ে কোনো জিনিস খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেন্দ্রের চিকিৎসার অন্ত একদিন তরকারি কুটিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আবর্জনার মধ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিল এবং তাহার নোটের খাতা হাতপাখার অংযাকচিনি করিয়া রান্নাঘরের ভস্মশয়্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এই- সকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের সীমা রহিল না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উচ্ছুঙ্গল যথেচ্ছাচারের প্রোতে সমস্ত ঘরকল্প ভাসাইয়া হাস্যমুখে ভাসিয়া চলা বালিকার কাছে বিভীষিকাজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুইজনে ঢাকা- বারান্দায় বিছানা করিয়া বসিয়াছে। সমুখে খোলা ছাদ। বৃষ্টির পরে কলিকাতার দিগন্তব্যাপী সৌধশিখরশ্রেণী জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। বাগান হইতে রাশীকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা লইয়া টানাটানি করিয়া, বাধা ঘটাইয়া, প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া, অনর্থক একটা কলহ সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। আশা এই- সকল অকারণ উৎপীড়ন লইয়া তাহাকে ভরৎসনা করিবার উপক্রম করিবামাত্র মহেন্দ্র কোনো- একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মুখ বন্ধ করিয়া শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেছিল।

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ির পিঞ্জরের মধ্য হইতে পোষা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তখনই মহেন্দ্র এবং আশা তাহাদের মাথার উপরে দোদুল্যমান খাঁচার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাদের কোকিল প্রতিবেশী কোকিলের কুহুধ্বনি কখনো নীরবে সহ্য করে নাই, আজ সে জবাব দেয় না কেন?

আশা উৎকর্ষিত হইয়া কহিল, “পাখির আজ কী হইল।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার কর্তৃ শুনিয়া লজ্জাবোধ করিতেছে।”

আশা সানুনয়স্বরে কহিল, “না, ঠাণ্ডা নয়, দেখো- না উহার কী হইয়াছে।”

মহেন্দ্র তখন খাঁচা পাড়িয়া নামাইল। খাঁচার আবরণ খুলিয়া দেখিল, পাখি মরিয়া গেছে। অন্ধপূর্ণার যাওয়ার পর বেহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল, পাখিকে কেহ দেখে নাই।

দেখিতে দেখিতে আশার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার আঙুল চলিল না— ফুল পড়িয়া রহিল। মহেন্দ্রের মনে আঘাত লাগিলে, অকালে রসভঙ্গের আশঙ্কায় ব্যাপারটা সে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল। কহিল, “ভালোই হইয়াছে, আমি ডাক্তারি করিতে যাইতাম, আর ওটা কুহুস্বরে তোমাকে জ্বালাইয়া মারিত।” এই বলিয়া মহেন্দ্র আশাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আন্তে আন্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া আঁচল শূন্য করিয়া বকুলগুলা ফেলিয়া দিল। কহিল, “আর কেন। ছি ছি। তুমি শীত্র যাও, মাকে ফিরাইয়া আনো গো।”

অধ্যায় - ৯

এমন সময় দোতলা হইতে “মহিনদা মহিনদা” রব উঠিল। “আরে কে হে, এসো এসো” বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর সাড়া পাইয়া মহেন্দ্রের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের সুখের বাধাস্বরূপ আসিয়াছে— আজ সেই বাধাই সুখের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আরাম বোধ করিল। মাথায় কাপড় দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, “যাও কোথায়। আর তো কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে।”

আশা কহিল, ‘ঠাকুরপোর জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই গো।’

একটা- কিছু কর্ম করিবার উপলক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আশাৰ অবসাদ কতকটা লয় হইয়া গেল।

আশা শাশুড়ির সংবাদ জানিবার জন্য মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনো সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল, ‘আ সর্বনাশ ! কী কবিত্তের মাঝখানেই পা ফেলিলাম। ভয় নাই বৌঠান, তুমি বসো, আমি পালাই।’

আশা মহেন্দ্রের মুখে চাহিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ‘বিহারী, মার কী খবর।’

বিহারী কহিল, ‘মা- খুড়ির কথা আজ কেন ভাই। সে ঢের সময় আছে। Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts!’

বলিয়া বিহারী ফিরিতে উদ্যত হইলে মহেন্দ্র তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া বসাইল। বিহারী কহিল, ‘বৌঠান, দেখো আমার অপরাধ নাই— আমাকে জোর করিয়া আনিল— পাপ করিল মহিনদা, তাহার অভিশাপটা আমার উপরে যেন না পড়ে।’

কোনো জবাব দিতে পারে না বলিয়াই এই- সব কথায় আশা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে।

বিহারী কহিল, ‘বাড়ির শ্রী তো দেখিতেছি— মাকে এখনো আনাইবার কি সময় হয় নাই।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘বিলক্ষণ, আমরা তো তাঁর জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি।’

বিহারী কহিল, ‘সেই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া পত্র লিখিতে তোমার অল্পই সময় লাগিবে, কিন্তু তাঁহার সুখের সীমা থাকিবে না। বৌঠান, মহিনদাকে সেই দু মিনিট ছুটি দিতে হইবে, তোমার কাছে আমার এই আবেদন।’

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল— তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, ‘কী শুভক্ষণেই যে তোমাদের দেখা হইয়াছিল। কিছুতেই সন্ধি হইল না— কেবলই ঠুকঠাক চলিতেছে।’

বিহারী কহিল, “তোমাকে তোমার মা তো নষ্ট করিয়াছেন, আবার স্ত্রীও নষ্ট করিতে বসিয়াছে। সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই সময় পাইলে দুই- এক কথা বলি।”

মহেন্দ্র। তাহাতে ফল কী হয়।

বিহারী। ফল তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয় না, আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হয়।

অধ্যায় - ১০

বিহারী নিজে বসিয়া মহেন্দ্রকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া এবং সে- চিঠি লইয়া পরদিনই রাজলক্ষ্মীকে আনিতে গেল। রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন, এ চিঠি বিহারীই লিখাইয়াছে— কিন্তু তবু আর থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গে বিনোদনী আসিল।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া গৃহের যেরূপ দুরবস্থা দেখিলেন— সমস্ত অমার্জিত, মলিন, বিপর্যস্ত— তাহাতে বধূর প্রতি তাঁহার মন আরো যেন বক্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধূর এ কী পরিবর্তন। সে যে ছায়ার মতো তাঁহার অনুসরণ করে। আদেশ না পাইলেও তাঁহার কর্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠেন, ‘রাখো, রাখো, ও তুমি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। জান না যে- কাজ সে- কাজে কেন হাত দেওয়া।’

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, অন্নপূর্ণা চলিয়া যাওয়াতেই বধূর এত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, ‘মহেন্দ্র মনে করিবে, খুড়ী যখন ছিল, তখন বধূকে লইয়া আমি বেশ নিষ্কণ্টকে সুখে ছিলাম— আর মা আসিতেই আমার বিরহদুঃখ আরম্ভ হইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা যে তাহার হিতৈষী এবং মা যে তাহার সুখের অন্তরায়, ইহাই প্রমাণ হইবে। কাজ কী।’

আজকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইলে বধূ যাইতে ইতস্তত করিত— কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভরৎসনা করিয়া বলিতেন, “মহিন ডাকিতেছে, সে বুঝি আর কানে তুলিতে নাই। বেশি আদর পাইলে শেষকালে এমনই ঘটিয়া থাকে। যাও, তোমার আর তরকারিতে হাত দিতে হইবে না।”

আবার সেই স্লেট- পেনসিল চারুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা। ভালোবাসার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা। উভয়ের মধ্যে কাহার প্রেমের ওজন বেশি, তাহা লইয়া বিনা- যুক্তিমূলে তুমুল তর্কবিতর্ক। বর্ষার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্নারাত্রিকে দিন করিয়া তোলা। শ্রান্তি এবং অবসাদকে গায়ের জোরে দূর করিয়া দেওয়া। পরস্পরকে এমনি করিয়া অভ্যাস করা যে, সঙ্গ যখন অসাড় চিত্তে আনন্দ দিতেছে না তখনো ক্ষণকালের জন্য মিলনপাশ হইতে মুক্তি ভয়াবহ মনে হয়— সন্তোগসুখ

ভস্যাচ্ছন্ন, অথচ কর্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না। ভোগসুখের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, সুখ অধিক দিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন দুষ্টেদ্য হইয়া উঠে।

এমন সময় বিনোদিনী একদিন আসিয়া আশার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ‘‘ভাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি দুঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই।’’

আত্মায়গ্রহে বাল্যকাল হইতে পরের মতো লালিত হইয়াছিল বলিয়া লোক- সাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কৃষ্ণিতভাব ছিল। ভয় হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী যখন তাহার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার নিখুঁত মুখ ও নিটোল ঘোবন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস করিল না।

আশা দেখিল, শাশুড়ি রাজলক্ষ্মীর নিকট বিনোদিনীর কোনোপ্রকার সংকোচ নাই। রাজলক্ষ্মীও যেন আশাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া বিনোদিনীকে বহুমান দিতেছেন, সময়ে- অসময়ে আশাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বিনোদিনীর প্রশংসাবাকে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতেছেন। আশা দেখিল, বিনোদিনী সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ- প্রভৃতি যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্বভাবসিদ্ধ- দাসদাসীদিগকে কর্মে নিয়োগ করিতে, ভরৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে লেশমাত্র কৃষ্ণিত নহে। এই সমস্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করিল।

সেই সর্বগুণশালিনী বিনোদিনী যখন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল, তখন সংকোচের বাধায় ঠেকিয়াই

বালিকার

আনন্দ আরো চার গুণ উচ্ছলিয়া পড়িল। জানুকরের মায়াতরূপ মতো তাহাদের প্রণয়বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, ‘‘এসো ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কিছু পাতাই।’’

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, ‘‘কী পাতাইবে।’’

আশা গঙ্গাজল বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিসের নাম করিল।

বিনোদিনী কহিল, ‘‘ও- সব পুরানো হইয়া গেছে; আদরের নামের আর আদর নাই।’’

আশা কহিল, ‘‘তোমার কোন্টা পছন্দ।’’

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, ‘‘চোখের বালি।’’

শ্রতিমধুর নামের দিকেই আশার বোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটিই গ্রহণ করিল।

বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, ‘‘চোখের বালি।’’ বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

অধ্যায় - ১১

আশার পক্ষে সঙ্গীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না— সুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাজে লোকের দরকার হয়।

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।

নিষ্ঠৰ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা একতলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্য, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কঠ অতিক্ষীণ স্বরে কদাচিত্ শুনা যাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নীচের বিছানায় বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া শুনগুণ-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ষ হইয়া উঠিত, নিশাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্যন্ত বাহির করিত, এক কথা বার বার করিয়া শুনিত, ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অবতারণা করিত— কহিত, ‘আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত তো কী হইত, যদি অমন হইত তো কী করিতে।’ সেই- সকল অসন্তুষ্টিত কল্পনার পথে সুখালোচনাকে সুদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতে আশারও ভালো লাগিত।

বিনোদিনী কহিত, ‘আচ্ছা ভাই চোখের বালি, তোর সঙ্গে যদি বিহারীবাবুর বিবাহ হইত।’

আশা। না ভাই, ও কথা তুমি বলিয়ো না— ছি ছি, আমার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গেও তো কথা হইয়াছিল।

বিনোদিনী। আমার সঙ্গে তো ঢের লোকের ঢের কথা হইয়াছিল। না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে— আমি যা আছি, বেশ আছি।

আশা তাহার প্রতিবাদ করে। বিনোদিনীর অবঙ্গ যে তাহার অবঙ্গার চেয়ে ভালো, এ কথা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে। ‘একবার মনে করিয়া দেখো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত। আর একটু হলেই তো হইত।’

তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এ ঘরে আজ সে অতিথিমাত্র— আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।

অপরাহ্নে বিনোদিনী নিজে উদ্যোগী হইয়া অপরাহ্ন নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামিসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাত্ পশ্চাত্ মুঝ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। আবার এক- এক দিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, ‘আঃ, আর- একটু বসোই- না। তোমার স্বামী তো পালাইতেছেন না। তিনি তো

বনের মায়ামৃগ নন, তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ।” এই বলিয়া নানা ছলে ধরিয়া রাখিয়া দেরি করাইবার চেষ্টা করিত।

মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত, “তোমার সখী যে নড়িবার নাম করেন না— তিনি বাঢ়ি ফিরিবেন কবে।”

আশা ব্যগ্র হইয়া বলিত, “না, তুমি আমার চোখের বালির উপর রাগ করিয়ো না। তুমি জান না, সে তোমার কথা শুনিতে কত ভালোবাসে— কত যত্ন করিয়া সাজাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়।”

রাজলক্ষ্মী আশাকে কাজ করিতে দিতেন না। বিনোদিনী বধূর পক্ষ লইয়া তাহাকে কাজে প্রবৃত্ত করাইল। প্রায় সমস্ত দিনই বিনোদিনীর কাজে আলস্য নাই, সেই সঙ্গে আশাকেও সে আর ছুটি দিতে চায় না। বিনোদিনী পরে- পরে এমনি কাজের শৃঙ্খল বানাইতেছিল যে, তাহার মধ্যে ফাঁক পাওয়া আশার পক্ষে ভারি কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছাদের উপরকার শূন্য ঘরের কোণে বসিয়া আক্রোশে ছটফট করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া বিনোদিনী মনে মনে তৈরি কঠিন হাসি হাসিত। আশা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিত, “এবার যাই ভাই চোখের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন।”

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত, “রোসো, এইটুকু শেষ করিয়া যাও। আর বেশি দেরি হইবে না।”

খানিক বাদে আশা আবার ছটফট করিয়া বলিয়া উঠিত, “না ভাই, এবার তিনি সত্যসত্যই রাগ করিবেন- আমাকে ছাড়ো, আমি যাই।”

বিনোদিনী বলিত, “আহা, একটু রাগ করিলই বা। সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না— তরকারিতে লক্ষামরিচের মতো।”

কিন্তু লক্ষামরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল— কেবল সঙ্গে তাহার তরকারি ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গবর্ণ হইতে থাকে। ‘এমন সুখের ঘরকলা— এমন সোহাগের স্বামী। এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল !’ (আশার গলা জড়াইয়া) “ভাই চোখের বালি, বলো- না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই। আমি তোমাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলাম তাহা বলিয়াছিলে? তোমাদের ভালোবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণ থাকে না ভাই।”

অধ্যায় - ১২

মহেন্দ্র একদিন বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল, “এ কি ভালো হইতেছে? পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কী। আমার তো ইহাতে মত নাই— কী জানি কখন কী সংকট ঘটিতে পারে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ও যে আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি তো পর মনে করি না।”

মহেন্দ্র কহিল, “না মা, ভালো হইতেছে না। আমার মতে উহাকে রাখা উচিত হয় না।”

রাজলক্ষ্মী বেশ জানিতেন, মহেন্দ্রের মত অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। তিনি বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “ও বেহারি, তুই একবার মহিনকে বুঝাইয়া বল। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধবয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক, যা হউক, আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনো পাই নাই।”

বিহারী রাজলক্ষ্মীকে কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের কাছে গেল— কহিল, “মহিনদা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ?”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, ‘‘ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না। তোমার বৌঠানকে জিঞ্জসা করো- না, আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর- সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।’’

আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জন করিল।

বিহারী কহিল, ‘‘বল কী। দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ !’’

মহেন্দ্র। ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্য চুনি ছটফট করিতেছে।

ঘোমটার ভিতর হইতে আশার দুই চক্ষু আবার ভরৎসনা বর্ণণ করিল।

বিহারী কহিল, ‘‘বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিধবার বিবাহ দিয়া দাও— বিষদাত একেবারে ভাঙিবে।’’

মহেন্দ্র। কুন্দরও তো বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

বিহারী কহিল, ‘‘থাক, ও উপমাটা এখন রাখো। বিনোদিনীর কথা আমি মাৰো মাৰো ভাবি। তোমার এখানে উনি তো চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে, যে বন দেখিয়া আসিয়াছি সেখানে উহাকে যাবজ্জীবন বনবাসে পাঠানো, সেও বড়ে কঠিন দণ্ড।’’

মহেন্দ্রের সম্মুখে এ পর্যন্ত বিনোদিনী বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহারী তাহাকে দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপৰূপে জ্বলে, আর- এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়— সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে এই কথা লইয়া অনেক পরিহাস করিল। বিহারীও তাহার জবাব দিল। কিন্তু তাহার মন বুঝিয়াছিল, এ নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, ‘দেখো বাছা, বউকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ো না। তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ- ঘরে ছিলে— আজকালকার চালচলন জান না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিয়ো।’—

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্বক আশাকে দূরে দূরে রাখিল। কহিল, ‘আমি ভাই কে। আমার মতো অবস্থার লোক আপন মান বাঁচাইয়া চলিতে না জানিলে, কোন্ দিন কী ঘটে বলা যায় কি।’

আশা সাধাসাধি কান্নাকাটি করিয়া মরে— বিনোদিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনের কথায় আশা আকর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আমল দিল না।

এ দিকে মহেন্দ্রের বাহ্যিক শিথিল এবং তাহার মুক্ষুদ্ধিষ্ঠি যেন ক্লাস্তিতে আবৃত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে যে-সকল অনিয়ম- উচ্ছৃঙ্খলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অল্পে অল্পে তাহাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অপটুতায় সে ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। প্রকাশ না করিলেও আশা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্যাদা ম্লান হইয়া যাইতেছে। মহেন্দ্রের সোহাগের মধ্যে বেসুর লাগিতেছিল— কতকটা মিথ্যা বাড়াবাড়ি, কতকটা আত্মপ্রতারণা।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিত্রাণ নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই। স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আজকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার যাইবার স্থান কোথায়।

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্তি বাসরশয়ার মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাজকর্ম, পড়াশুনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাঙ্গারি বইগুলাকে নানা অসম্ভব স্থান হইতে উদ্বার করিয়া ধুলা ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান- প্যাটেলুন- কয়টা রৌদ্রে দিবার উপক্রম করিল।

অধ্যায় - ১৩

বিনোদিনী যখন নিতান্তই ধরা দিল না তখন আশার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, ‘ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সম্মুখে বাহির হও না কেন। পলাইয়া বেড়াও কী জন্য।’

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সতেজে উত্তর করিল, ‘ছি ছি।’

আশা কহিল, ‘কেন। মার কাছে শুনিয়াছি, তুমি তো আমাদের পর নও।’

বিনোদিনী গন্তীরমুখে কহিল, ‘সংসারে আপন- পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে সেই আপন- যে পর বলিয়া জানে, সে আপন হইলেও পর।’

আশা মনে মনে ভাবিল, এ কথার আর উত্তর নাই। বাস্তবিকই তাহার স্বামী বিনোদিনীর প্রতি অন্যায় করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকারণে বিরক্ত হন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যন্ত আবদার করিয়া ধরিল, ‘আমার চোখের বালির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে।’

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, ‘তোমার সাহস তো কম নয়।’

আশা জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেন, ভয় কিসের।’

মহেন্দ্র। তোমার স্বীর যেরকম রূপের বর্ণনা কর, সে তো বড়ো নিরাপদ জায়গা নয় !

আশা কহিল, ‘আচ্ছা, সে আমি সামলাইতে পারিব। তুমি ঠাট্টা রাখিয়া দাও— তার সঙ্গে আলাপ করিবে কি না বলো।’

বিনোদিনীকে দেখিবে বলিয়া মহেন্দ্রের যে কৌতুহল ছিল না, তাহা নহে। এমন- কি, আজকাল তাহাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহও জন্মে। সেই অনাবশ্যক আগ্রহটা তাহার নিজের কাছে উচিত বলিয়া ঠেকে নাই।

হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত- অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে মাতার অধিকার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এইজন্য ইতিপূর্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে সে এমনভাবে রক্ষা করিতে চায় যে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌতুহলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে যে বড়ো খুঁতখুঁতে এবং অত্যন্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা গর্ব ছিল। এমন- কি, বিহারীকে সে বন্ধু বলিত বলিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না। অন্য কেহ যদি তাহার নিকট আকৃষ্ট হইয়া আসিত, তবে মহেন্দ্র যেন তাহাকে গায়ে পড়িয়া উপেক্ষা দেখাইত, এবং বিহারীর নিকটে সেই হতভাগ্য সম্বন্ধে উপহাসতীর অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইতরসাধারণের প্রতি নিজের একান্ত ঔদাসীন্য ঘোষণা করিত। বিহারী ইহাতে আপত্তি করিলে মহেন্দ্র বলিত, ‘তুমি পার বিহারী, যেখানে যাও তোমার বন্ধুর অভাব হয় না; আমি কিন্তু যাকে- তাকে বন্ধু বলিয়া টানাটানি করিতে পারি না।’

সেই মহেন্দ্রের মন আজকাল যখন মাঝে মাঝে অনিবার্য ব্যগ্রতা ও কৌতুহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন খাটো হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সে তাহার মাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরস্ত করিল।

মহেন্দ্র কহিল, “থাক ছুনি। তোমার ঢোকের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই। পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে স্থানেকে কোথায় আনিবে।”

আশা কহিল, ‘আচ্ছা, তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বসাইব না, আমারই অংশ আমি বালিকে দিব।’

মহেন্দ্র কহিল, “তুমি তো দিবে, আমি দিতে দিব কেন।”

আশা যে বিনোদিনীকে ভালোবাসিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে তাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের খর্বতা প্রতিপন্থ হয়। মহেন্দ্র অহংকার করিয়া বলিত, ‘আমার মতো অনন্যনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।’ আশা তাহা কিছুতেই মানিত না— ইহা লইয়া ঝগড়া করিত, কাঁদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেন্দ্র তাহাদের দুজনের মাঝখানে বিনোদিনীকে সূচ্যগ্র স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, ইহাই তাহার গর্বের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের এই গর্ব আশার সহ্য হইত না, কিন্তু আজ সে পরাভব স্বীকার করিয়া কহিল, ‘আচ্ছা, বেশ, আমার খাতিরেই তুমি আমার বালির সঙ্গে আলাপ করো।’

আশায় নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালোবাসার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক রাজি হইল। বলিয়া রাখিল, ‘কিন্তু তাই বলিয়া যখন- তখন উৎপাত করিলে বাঁচিব না।’

পরদিন প্রত্যুম্বে বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া ধরিল। বিনোদিনী কহিল, ‘এ কী আশ্চর্য। চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দরবারে !’

আশা কহিল, ‘তোমাদের ও- সব কবিতার কথা আমার আসে না ভাই, কেন বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো। যে তোমার কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে কথা শোনাও’সে।’

বিনোদিনী কহিল, ‘সে রসিক লোকটি কে।’

আশা কহিল, ‘তোমার দেবর, আমার স্বামী। না ভাই, ঠাট্টা নয়— তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।’

বিনোদিনী মনে মনে কহিল, ‘স্ত্রীর হৃকুমে আমার প্রতি তলব পড়িয়াছে, আমি অমনি ছুটিয়া যাইব, আমাকে তেমন পাও নাই।’

বিনোদিনী কোনোমতেই রাজি হইল না। আশা তখন স্বামীর কাছে বড়ো অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র মনে মনে বড়ো রাগ করিল। তাহার কাছে বাহির হইতে আপত্তি ! তাহাকে অন্য সাধারণ পুরুষের মতো জ্ঞান করা ! আর কেহ হইলে তো এতদিনে অগ্রসর হইয়া নানা কৌশলে বিনোদিনীর সঙ্গে

দেখাসাক্ষাৎ আলাপ- পরিচয় করিত। মহেন্দ্র যে তাহার চেষ্টামাত্রও করে নাই, ইহাতেই কি বিনোদিনী তাহার পরিচয় পায় নাই। বিনোদিনী যদি একবার ভালো করিয়া জানে, তবে অন্য পুরুষ এবং মহেন্দ্রের প্রভেদ বুঝিতে পারে।

বিনোদিনীও দুদিন পূর্বে আক্রোশের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল, ‘এতকাল বাড়িতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না। যখন পিসিমার ঘরে থাকি তখন কোনো ছুতা করিয়াও যে মার ঘরে আসে না। এত উদাসীন্য কিসের। আমি কি জড়পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।’

আশা স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল, “তুমি কালেজে গেছ বলিয়া চোখের বালিকে আমাদের ঘরে আনিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আসিয়া পড়িবে— তা হইলেই সে জন্ম হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “কী অপরাধে তাহাকে এতবড়ো কঠিন শাসনের আয়োজন।”

আশা কহিল, “না সত্যই আমার ভারি রাগ হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দেখা করিতেও তার আপত্তি ! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব তবে ছাড়িব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার প্রিয়স্থীর দর্শনাভাবে আমি মরিয়া যাইতেছি না। আমি অমন ছুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না।”

আশা সানুনয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, “মাথা খাও, একটিবার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিয়ো।”

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। আশা কহিল, “লক্ষ্মীটি, আমার অনুরোধ রাখো।”

মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল— সেইজন্য অতিরিক্ত মাত্রায় উদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সম্মতি দিল।

শরৎকালের স্বচ্ছ নিষ্ঠক মধ্যাহ্নে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জন শয়নগৃহে বসিয়া আশাকে কার্পেটের জুতা বুনিতে শিখাইতেছিল। আশা অন্যমনস্ক হইয়া ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিয়া গণনায় ভুল করিয়া বিনোদিনীর নিকট নিজের অসাধ্য অপটুত্ব প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, “ও তোমার হইবে না, আমার কাজ আছে আমি যাই।”

আশা কহিল, “আর একটু বোসো, এবার দেখো, আমি ভুল করিব না।” বলিয়া আবার সেলাই লইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দপদে বিনোদিনীর পশ্চাতে দ্বারের নিকট মহেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। আশা সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়া আস্তে আস্তে হাসিতে লাগিল।

বিনোদিনী কহিল, “হঠাৎ হাসির কথা কী মনে পড়িল।” আশা আর থাকিতে পারিল না। উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কার্পেট বিনোদিনীর গায়ের উপরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ‘না ভাই, ঠিক বলিয়াছ— ও আমার হইবে না’— বলিয়া বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া দ্বিগুণ হাসিতে লাগিল।

প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাপ্টল্যে এবং ভাবভঙ্গিতে তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কখন মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। নিতান্ত সরল নিরীহের মতো সে আশার এই অত্যন্ত ক্ষীণ ফাঁদের মধ্যে ধরা দিল।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, “হাসির কারণ হইতে আমি হতভাগ্য কেন বঞ্চিত হই।”

বিনোদিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “হয় আপনি বসুন আমি যাই, নয় আপনিও বসুন আমিও বসি।”

বিনোদিনী সাধারণ মেয়ের মতো আশার সহিত হাত- কাড়াকাড়ি করিয়া মহাকোলাহলে লজ্জার ধূম বাধাইয়া দিল না। সহজ সুরেই বলিল, “কেবল আপনার অনুরোধেই বসিলাম, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিবেন না।”

মহেন্দ্র কহিল, “এই বলিয়া অভিশাপ দিব, আপনার যেন অনেকক্ষণ চলৎশক্তি না থাকে।”

বিনোদিনী কহিল, ‘সে অভিশাপকে আমি ভয় করি না। কেননা, আপনার অনেকক্ষণ খুব বেশিক্ষণ হইবে না। বোধ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল।’

বলিয়া আবার সে উঠিবার চেষ্টা করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “মাথা খাও আর একটু বসো।”

অধ্যায় - ১৪

আশা জিজ্ঞাসা করিল, ‘সত্য করিয়া বলো, আমার চোখের বালিকে কেমন লাগিল।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘মন্দ নয়।’

আশা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, ‘তোমার কাউকে আর পছন্দই হয় না।’

মহেন্দ্র। কেবল একটি লোক ছাড়।

আশা কহিল, ‘আচ্ছা, ওর সঙ্গে আর- একটু ভালো করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আবার আলাপ ! এখন বুঝি বরাবরই এমনি চলিবে।’

আশা কহিল, ‘ভদ্রতার খাতিরেও তো মানুষের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়। একদিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাশুনা বন্ধ কর, তবে চোখের বালি কী মনে করিবে বলো দেখি। তোমার কিন্তু সকলই আশ্চর্য। আর কেউ হইলে অমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সাধিয়া বেড়াইত, তোমার যেন একটা মন্ত্র বিপদ উপস্থিত হইল।’

অন্য লোকের সঙ্গে তাহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুশি হইল। কহিল, ‘আচ্ছা, বেশ তো। ব্যন্ত হইবার দরকার কী। আমার তো পালাইবার স্থান নাই, তোমার স্থানও পালাইবার তাড়া দেখি না—সুতরাং দেখা মাঝে মাঝে হইবেই, এবং দেখা হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিবে, তোমার স্বামীর সেটুকু শিক্ষা আছে।’

মহেন্দ্র মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোনো- না- কোনো ছুতায় দেখা দিবেই। ভুল বুঝিয়াছিল। বিনোদিনী কাছ দিয়াও যায় না—দৈবাং যাতায়াতের পথেও দেখা হয় না।

পাছে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রসঙ্গ স্তুর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সঙ্গলাভের জন্য স্বাভাবিক সামান্য ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে দিয়া মহেন্দ্রের ব্যগ্রতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর ওদাস্যে তাহাকে আরো উত্তেজিত করিতে থাকিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হইবার পরদিনে মহেন্দ্র নিতান্তই যেন প্রসঙ্গক্রমে হাস্যচ্ছলে আশাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা, তোমার অযোগ্য এই স্বামীটিকে চোখের বালির কেমন লাগিল।’

প্রশ্ন করিবার পূর্বেই আশাৰ কাছ হইতে এ সমষ্টি উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিস্তারিত রিপোর্ট পাইবে, মহেন্দ্রের এৱ্যাপ দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেজন্য সবুর করিয়া যখন ফল পাইল না, তখন লীলাচ্ছলে প্রশ্নটা উত্থাপন করিল।

আশা মুশকিলে পড়িল। চোখের বালি কোনো কথাই বলে নাই। তাহাতে আশা স্থীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীকে বলিল, “রোসো, দু- চারি দিন আগে আলাপ হটক, তার পরে তো বলিবে। কাল কতক্ষণেরই বাদেখা, ক’টা কথাই বা হইয়াছিল।”

ইহাতেও মহেন্দ্র কিছু নিরাশ হইল এবং বিনোদিনী সম্পর্কে নিশ্চেষ্টতা দেখানো তাহার পক্ষে আরো দুরহ হইল।

এই- সকল আলোচনার মধ্যে বিহারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কী মহিন্দা, আজ তোমাদের তর্কটা কী লইয়া।’

মহেন্দ্র কহিল, “দেখো তো ভাই, কুমুদিনী না প্রমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার বৌঠান চুলের দড়ি না মাছের কাঁটা না কী একটা পাতাইয়াছেন, কিন্তু আমাকেও তাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা দেশালাইয়ের কাঠি পাতাইতে হইবে, এ হইলে তো বাঁচা যায় না।”

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে তুমুল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী ক্ষণকাল নিরুত্তরে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল— কহিল, “বৌঠান, লক্ষণ ভালো নয়। এ- সব ভোলাইবার কথা। তোমার চোখের বালিকে আমি দেখিয়াছি। আরো যদি ঘন ঘন দেখিতে পাই, তবে সেটাকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিব না, সে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহিন্দা যখন এত করিয়া বেকবুল যাইতেছেন তখন বড়ো সন্দেহের কথা।”

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক প্রভেদ, আশা তাহার আর- একটি প্রমাণ পাইল।

হঠাতে মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ- অভ্যাসের শখ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর- বেহারাদের পর্যন্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, ‘আচ্ছা।’

চোখের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিল, ‘না।’

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই বিনোদিনীর অগোচর রহিল না।

মতলব এই হইল, মধ্যাহ্নে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনোমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেন্দ্র সেই অবস্থায় ছবি তুলিয়া অবাধ্য স্থীরে উপযুক্তরূপ জন্ম করিবে।

আশ্চর্য এই, বিনোদিনী কোনোদিন দিনের বেলায় ঘুমায় না। কিন্তু আশার ঘরে আসিয়া সেদিন তাহার চোখ তুলিয়া পড়িল। গায়ে একখানি লাল শাল দিয়া খোলা জানালার দিকে মুখ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া

এমনই সুন্দর ভঙিতে ঘুমাইয়া পড়িল যে মহেন্দ্র কহিল, “ঠিক মনে হইতেছ, যেন ছবি লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে।”

মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাদিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন-কি, আর্টের খাতিরে অতি সন্তর্পণে শিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল- পছন্দ না হওয়ায় পুনরায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল। আশাকে কানে কানে কহিল, “পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বাঁ দিকে সরাইয়া দাও।”

অপটু আশা কানে কানে কহিল, “আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব- তুমি সরাইয়া দাও।”

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশ্যে যেই ছবি লইবার জন্য ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি যেন কিসের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আশা উচ্চেঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বিনোদিনী বড়োই রাগ করিল- তাহার জ্যোতির্ময় চক্ষু দুইটি হইতে মহেন্দ্রের প্রতি অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া কহিল, “ভারি অন্যায়।”

মহেন্দ্র কহিল, “অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না, ইহাতে যে আমার ইহকাল পরকাল দুই গেল ! অন্যায়টাকে শেষ করিতে দিয়া তাহার পরে দণ্ড দিবেন।”

আশাও বিনোদিনীকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িল। ছবি লওয়া হইল। কিন্তু প্রথম ছবিটা খারাপ হইয়া গেল। সুতরাং পরের দিন আর- একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার দুই স্থানে একত্র করিয়া বন্ধুত্বের চিরনিদর্শনস্বরূপ একখানি ছবি তোলার প্রস্তাবে বিনোদিনী ‘না’ বলিতে পারিল না। কহিল, “কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।”

শুনিয়া মহেন্দ্র সে ছবিটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ পরিচয় বহুদূর অগ্সর হইয়া গেল।

অধ্যায় - ১৫

বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই- চাপা আগুন আবার জলিয়া উঠে। নবদ্বিতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু ম্লান হইতেছিল, তৃতীয়পক্ষের ঘা খাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।

আশার হাস্যালাপ করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অজ্ঞ জোগাইতে পারিত; এইজন্য বিনোদিনীর অন্তরালে আশা ভাবি একটা আশ্রয় পাইল। মহেন্দ্রকে সর্বদাই আমোদের উভেজনায় রাখিতে তাহাকে আর অসাধ্যসাধন করিতে হইত না।

বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পরের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল— প্রেমের সংগীত একেবারেই তারস্বরের নিখাদ হইতেই শুরু হইয়াছিল— সুদ ভাঙ্গিয়া না খাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার চেষ্টায় ছিল। এই খেপামির বন্যাকে তাহারা প্রাত্যহিক সংসারের সহজ স্ন্যাতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে। নেশার পরেই মাঝখানে যে অবসাদ আসে, সেটা দূর করিতে মানুষ আবার যে- নেশা চায় সে- নেশা আশা কোথা হইতে জোগাইবে। এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। আশা স্বামীকে প্রফুল্ল দেখিয়া আরাম পাইল।

এখন আর তাহার নিজের চেষ্টা রহিল না। মহেন্দ্র- বিনোদিনী যখন উপহাস- পরিহাস করিত, তখন সে কেবল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যোগ দিত। তাসখেলায় মহেন্দ্র যখন আশাকে অন্যায় ফঁকি দিত তখন সে বিনোদিনীকে বিচারক মানিয়া সকরণ অভিযোগের অবতারণা করিত। মহেন্দ্র তাহাকে ঠাট্টা করিলে বা কোনো অসংগত কথা বলিলে সে প্রত্যাশা করিত, বিনোদিনী তাহার হইয়া উপযুক্ত জবাব দিয়া দিবে।

এইরূপে তিনজনের সভা জমিয়া উঠিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাজে শৈথিল্য ছিল না। রাঁধাবাড়া, ঘরকম্বা দেখা, রাজলক্ষ্মীর সেবা করা, সমস্ত সে নিঃশেষপূর্বক সমাধা করিয়া তবে আমোদে যোগ দিত। মহেন্দ্র অস্থির হইয়া বলিত, “চাকর দাসীগুলাকে না কাজ করিতে দিয়া তুমি মাটি করিবে দেখিতেছি।” বিনোদিনী বলিত, “নিজে কাজ না করিয়া মাটি হওয়ার চেয়ে সে ভালো। যাও, তুমি কালেজে যাও।”

মহেন্দ্র। আজ বাদলার দিনটাতে—

বিনোদিনী। না সে হইবে না— তোমার গাড়ি তৈরি হইয়া আছে— কালেজে যাইতে হইবে।

মহেন্দ্র। আমি তো গাড়ি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। আমি বলিয়া দিয়াছি।— বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজে যাইবার কাপড় আনিয়া সমুখে উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। তোমার রাজপুতের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল, যুদ্ধকালে আত্মীয়কে বর্ম পরাইয়া দিতে।

আমোদের প্রলোভনে ছুটি লওয়া, পড়া ফাঁকি দেওয়া, বিনোদিনী কোনোমতেই প্রশ্রয় দিত না। তাহার কঠিন শাসনে দিনে দুপুরে অনিয়ত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল, এবং এইরূপে সায়াহের অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত রমণীয় লোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা নিজের অবসানের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে মাঝে মাঝে ঠিক সময়মত আহার প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া মহেন্দ্র আনন্দে কালেজ কামাই করিত। এখন বিনোদিনী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া মহেন্দ্রের কালেজের খাওয়া সকাল- সকাল ঠিক করিয়া দেয় এবং খাওয়া হইলেই মহেন্দ্র খবর পায়— গাড়ি তৈয়ার। পূর্বে কাপড়গুলি প্রতিদিন এমন ভাঁজ- করা পরিপাটি অবস্থায় পাওয়া দূরে থাক, ধোপার বাড়ি গেছে কি আলমারির কোনো- একটা অনিদেশ্য স্থানে আগোচরে পড়িয়া আছে, তাহা দীর্ঘকাল সন্ধান ব্যতীত জানা যাইত না।

প্রথম- প্রথম বিনোদিনী এই- সকল বিশ্বজ্ঞলা লইয়া মহেন্দ্রের সমুখে আশাকে সহাস্য ভৃৎসনা করিত— মহেন্দ্রও আশার নিরূপায় নৈপুণ্যহীনতায় সন্মেহে হাসিত। অবশেষে স্থীবাংসল্যবশে আশার হাত হইতে তাহার কর্তব্যভার বিনোদিনী নিজের হাতে কাঢ়িয়া লইল। ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

চাপকানের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোনো উপায় করিতে পারিতেছে না— বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া হতবুদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাঢ়িয়া লইয়া চটপট সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেন্দ্রের প্রস্তুত অন্নে বিড়ালে মুখ দিল— আশা ভাবিয়া অস্ত্রি; বিনোদিনী তখনই রান্নাঘরে গিয়া কোথা হইতে কী সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল; আশা আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র এইরূপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্মে ও বিশ্রামে, সর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের জুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তাহার কঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল। আশা আজকাল স্থীরহস্তের প্রসাধনে পরিপাটি- পরিচ্ছন্ন হইয়া সুন্দরবেশে সুগন্ধ মাখিয়া মহেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে যেন কতকটা আশার নিজের, কতকটা আর- একজনের— তাহার সাজসজ্জা- সৌন্দর্যে আনন্দে সে যেন গঙ্গাযমুনার মতো তাহার স্থীর সঙ্গে মিলিয়া গেছে।

বিহারীর আজকাল পূর্বের মতো আদর নাই— তাহার ডাক পড়ে না। বিহারী মহেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, কাল রবিবার আছে, দুপুরবেলা আসিয়া সে মহেন্দ্রের মার রান্না খাইবে। মহেন্দ্র দেখিল রবিবারটা নিতান্ত মাটি হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইল, রবিবারে বিশেষ কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

তবু বিহারী আহারাত্তে একবার মহেন্দ্রের বাড়ির খোঁজ লইতে আসিল। বেহারার কাছে শুনিল, মহেন্দ্র বাড়ি হইতে বাহিরে যায় নাই। “মহিনদা” বলিয়া সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বিহারী মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, ‘তারি মাথা ধরিয়াছে।’ বলিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া পড়িল। আশা সে কথা শুনিয়া এবং মহেন্দ্রের মুখের ভাব দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল— কী করা কর্তব্য, স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। বিনোদিনী বেশ জানিত ব্যাপারটা গুরুতর নহে, তবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কহিল, “অনেকক্ষণ বসিয়া আছ, একটুখানি শোও। আমি ওডিকলোন আনিয়া দিই।”

মহেন্দ্র বলিল, “থাক, দরকার নাই।”

বিনোদিনী শুনিল না, দ্রুতপদে ওডিকলোন বরফজলে মিশাইয়া উপস্থিত করিল। আশার হাতে ভিজা রূমাল দিয়া কহিল, ‘মহেন্দ্রবাবুর মাথায় বাঁধিয়া দাও।’

মহেন্দ্র বার বার বলিতে লাগিল, “থাক- না।” বিহারী অবরুদ্ধহাস্যে নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র সগর্বে ভাবিল,

‘বিহারীটা দেখুক, আমার কত আদর।’

আশা বিহারীর সম্মুখে লজ্জাকস্পিত হস্তে ভালো করিয়া বাঁধিতে পারিল না— ফেঁটাখানেক ওডিকলোন গড়াইয়া মহেন্দ্রের চোখে পড়িল। বিনোদিনী আশার হাত হইতে রূমাল লইয়া সুনিপুণ করিয়া বাঁধিল এবং আর- একটি বন্ধনাঘে ওডিকলোন ভিজাইয়া অল্প অল্প করিয়া নিংড়াইয়া দিল— আশা মাথায় ঘোমটা টানিয়া পাখা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী স্নিফস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহেন্দ্রবাবু, আরাম পাচ্ছেন কি।’

এইরপে কঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বিনোদিনী দ্রুতকটাক্ষে একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া লইল। দেখিল, বিহারীর চক্ষু কৌতুকে হাসিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে প্রহসন। বিনোদিনী বুঝিয়া লইল, এ লোকটিকে ভোলানো সহজ ব্যাপার নহে— কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।

বিহারী হাসিয়া কহিল, ‘বিনোদ- বৌঠান, এমনতরো শুশ্রষা পাইলে রোগ সারিবে না, বাড়িয়া যাইবে।’

বিনোদিনী। তা কেমন করিয়া জানিব, আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ। আপনাদের ডাক্তারিশাস্ত্রে বুঝি এইমতো লেখা আছে।

বিহারী। আছেই তো। সেবা দেখিয়া আমারও কপাল ধরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পোড়াকপালকে বিনাচিকিৎসাতেই চটপট সারিয়া উঠিতে হয়। মহিনদার কপালের জোর বেশি।

বিনোদিনী ভিজা বন্ধনাঘে রাখিয়া দিয়া কহিল, ‘কাজ নাই, বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুতেই করুন।’

বিহারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কয়দিন সে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিল, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র বিনোদিনী ও আশায় মিলিয়া আপনা- আপনি যে এতখানি তাল পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহা সে জানিত না। আজ সে বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া দেখিল, বিনোদিনীও তাহাকে দেখিয়া লইল।

বিহারী কিছু তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, ‘ঠিক কথা। বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুই করিবে। আমিই মাথাধরা আনিয়াছিলাম, আমি তাহা সঙ্গে লইয়া চলিলাম। ওডিকলোন আর বাজে খরচ করিবেন না।’ আশার দিকে চাহিয়া কহিল, ‘বৌঠান, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভালো।’

অধ্যায় - ১৬

বিহারী ভাবিল, ‘আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হটক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।’

বিহারী আহুন- অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়াই মহেন্দ্রের ব্যহের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনোদিনীকে কহিল, “বিনোদ- বৌঠান, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়াছে, স্ত্রী মাটি করিতেছে— তুমিও সেই দলে না ভিড়িয়া একটা নৃতন পথ দেখাও— দোহাই তোমার।”

মহেন্দ্র। অর্থাৎ—

বিহারী। অর্থাৎ আমার মতো লোক, যাহাকে কেহ কোনোকালে পোঁছে না—

মহেন্দ্র। তাহাকে মাটি করো। মাটি হইবার উমেদারি সহজ নয় হে বিহারী, দরখাস্ত পেশ করিলেই হয় না।

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, ‘মাটি হইবার ক্ষমতা থাকা চাই, বিহারীবাবু।’

বিহারী কহিল, ‘নিজগুণ না থাকিলেও হাতের গুণে হইতে পারে। একবার প্রশ্ন দিয়া দেখোই- না।’

বিনোদিনী। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে কিছু হয় না, অসাবধান থাকিতে হয়। কী বল, ভাই চোখের বালি। তোমার এই দেওরের ভার তুমিই লও- না, ভাই।

আশা তাহাকে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঠেলিয়া দিল। বিহারীও এ ঠাট্টায় যোগ দিল না।

আশার সম্বন্ধে বিহারী কোনো ঠাট্টা সহিবে না, এটুকু বিনোদিনীর কাছে এড়াইতে পারে নাই। বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিঁধিল।

সে পুনরায় আশাকে কহিল, ‘তোমার এই ভিক্ষুক দেওরাটি আমাকে উপলক্ষ করিয়া তোমারই কাছে আদর ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে— কিছু দে, ভাই।’

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ক্ষণকালের জন্য বিহারীর মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, ‘আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহিনদার সঙ্গেই নগদ কারবার।’

বিহারী সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে, বিনোদিনীর ইহা বুবিতে বাকি রহিল না। বুবিল, বিহারীর সম্মুখে সশস্ত্রে থাকিতে হইবে।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইল। খোলসা কথায় কবিত্বের মাধ্যম নষ্ট হয়। সে দ্বিতীয় তীব্র স্বরেই কহিল, ‘বিহারী, তোমার মহিনদা কোনো কারবারে যান না— হাতে যা আছে, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।’

বিহারী। তিনি না যেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা থাকিলে কারবারের টেউ বাহির হইতে আসিয়াও লাগে।

বিনোদিনী। আপনার উপস্থিত হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার ঢেউটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে!—
বলিয়া সে সকটাক্ষহাস্যে আশাকে টিপিল। আশা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। বিহারী পরাভূত হইয়া
ক্রোধে নীরব হইল; উঠিবার উপক্রম করিতেই বিনোদিনী কহিল, “হতাশ হইয়া যাবেন না, বিহারীবাবু।
আমি চোখের বালিকে পাঠাইয়া দিতেছি।”

বিনোদিনী চলিয়া যাইতেই সভাভঙ্গে মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। মহেন্দ্রের অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া বিহারীর
রংক আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিল, ‘মহিন্দা, নিজের সর্বনাশ করিতে চাও, করো— বরাবর
তোমার সেই অভ্যস হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রয়
করিয়া আছে, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না। এখনো বলিতেছি, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না।’

বলিতে বলিতে বিহারীর কষ্ট রংক হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র রংকরোধে কহিল, ‘বিহারী, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হেঁয়ালি ছাড়িয়া স্পষ্ট
কথা কও।’

বিহারী কহিল, ‘স্পষ্টই কহিব। বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না
জানিয়া মুঠের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ।’

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিয়া কহিল, ‘মিথ্যা কথা। তুমি যদি ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন অন্যায় সন্দেহের
চোখে দেখ, তবে অন্তঃপুরে তোমার আসা উচিত নয়।’

এমন সময় একটি থালায় মিষ্টান্ন সাজাইয়া বিনোদিনী হাস্যমুখে তাহা বিহারীর সম্মুখে রাখিল। বিহারী
কহিল, ‘এ কী ব্যাপার। আমার তো ক্ষুধা নাই।’

বিনোদিনী কহিল, ‘সে কি হয়। একটু মিষ্টমুখ করিয়া আপনাকে যাইতেই হইবে।’

বিহারী হাসিয়া কহিল, ‘আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল বুঝি। সমাদর আরম্ভ হইল।’

বিনোদিনী অত্যন্ত টিপিয়া হাসিল; কহিল, ‘আপনি যখন দেওর তখন সম্পর্কের যে জোর আছে। যেখানে
দাবি করা চলে
সেখানে ভিক্ষা করা কেন। আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন। কী বলেন মহেন্দ্রবাবু।’

মহেন্দ্রবাবুর তখন বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না।

বিনোদিনী। বিহারীবাবু, লজ্জা করিয়া খাইতেছেন না, না রাগ করিয়া? আর- কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে
হইবে?

বিহারী। কোনো দরকার নাই। যাহা পাইলাম তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে পারিবার জো নাই। মিষ্টান্ন দিলেও মুখ বন্ধ হয় না।

রাত্রে আশা মহেন্দ্রের নিকটে বিহারী সম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করিল— মহেন্দ্র অন্য দিনের মতো হাসিয়া উড়াইয়া দিল না— সম্পূর্ণ ঘোগ দিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি গেল। কহিল, “বিহারী, বিনোদিনী হাজার হটক ঠিক বাড়ির মেয়ে নয়— তুমি সামনে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।”

বিহারী কহিল, “তাই নাকি। তবে কাজটা ভালো হয় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, তাঁর সামনে নাই গেলাম।”

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইল। এত সহজে এই অপ্রিয় কার্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।

সেইদিনই বিহারী মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া কহিল, “বিনোদ- বৌঠান, মাপ করিতে হইবে।”

বিনোদিনী। কেন, বিহারীবাবু।

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে শুনিলাম, আমি অন্তঃপুরে আপনার সামনে বাহির হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। তাই ক্ষমা চাহিয়া বিদায় হইব।

বিনোদিনী। সে কি হয়, বিহারীবাবু। আমি আজ আছি কাল নাই, আপনি আমার জন্যে কেন যাইবেন। এত গোল হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না।

এই বলিয়া বিনোদিনী মুখ স্লান করিয়া যেন অশ্রুসংবরণ করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিহারী ক্ষণকালের জন্যে মনে করিল, ‘মিথ্যা সন্দেহ করিয়া আমি বিনোদিনীকে অন্যায় আঘাত করিয়াছি।’

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজলক্ষ্মী বিপন্নভাবে আসিয়া কহিলেন, “মহিন, বিপিনের বউ যে বাড়ি যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “কেন মা, এখানে তাঁর কি অসুবিধা হইতেছে।”

রাজলক্ষ্মী। অসুবিধা না। বউ বলিতেছে, তাহার মতো সমর্থবয়সের বিধবা মেয়ে পরের বাড়ি বেশি দিন থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।

মহেন্দ্র ক্ষুদ্রভাবে কহিল, “এ বুঝি পরের বাড়ি হইল?”

বিহারী বসিয়া ছিল— মহেন্দ্র তাহার প্রতি ভরৎসনাদৃষ্টি নিষ্কেপ করিল।

অনুতঙ্গ বিহারী ভাবিল, ‘কাল আমার কথাবার্তায় একটু যেন নিন্দার আভাস ছিল; বিনোদিনী বোধ হয় তাহাতেই বেদনা পাইয়াছে।’

স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া বিনোদিনীর উপর অভিমান করিয়া বসিল।

ইনি বলিলেন, “আমাদের পর মনে কর, ভাই !” উনি বলিলেন, “এতদিন পরে আমরা পর হইলাম!”

বিনোদিনী কহিল, ‘‘আমাকে কি তোমরা চিরকাল ধরিয়া রাখিবে, ভাই।’’

মহেন্দ্র কহিল, “এত কি আমাদের স্পর্ধা।”

আশা কহিল, ‘‘তবে কেন এমন করিয়া আমাদের মন কাঢ়িয়া লইলে।’’

সেদিন কিছুই স্থির হইল না। বিনোদিনী কহিল, ‘‘না ভাই, কাজ নাই, দুদিনের জন্য মায়া না বাড়ানোই ভালো।’’ বলিয়া ব্যাকুলচক্ষে একবার মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

পরদিন বিহারী আসিয়া কহিল, ‘‘বিনোদ- বৌঠান, যাবার কথা কেন বলিতেছেন। কিছু দোষ করিয়াছি কি— তাহারই শাস্তি?’’

বিনোদিনী একটু মুখ ফিরাইয়া কহিল, ‘‘দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ।’’

বিহারী। আপনি যদি চলিয়া যান তো আমার কেবলই মনে হইবে, আমারই উপর রাগ করিয়া গেলেন।

বিনোদিনী করণ্ণচক্ষে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিল— কহিল, ‘‘আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বলুন- না।’’

বিহারী মুশ্কিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ কথা সে কেমন করিয়া বলিবে। কহিল, ‘‘অবশ্য আপনাকে তো যাইতেই হইবে, নাহয় আর দু- চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে ক্ষতি কী।’’

বিনোদিনী দুই চক্ষু নত করিয়া কহিল, ‘‘আপনারা সকলেই আমাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন— আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন— কিন্তু আপনারা বড়ো অন্যায় করিতেছেন।’’

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চক্ষুপল্লবের মধ্য দিয়া মোটা মোটা অশ্রু ফোঁটা দ্রুতবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিহারী এই নীরব অজ্ঞ অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ‘‘কয়দিনমাত্র আসিয়া আপনার গুগে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজন্যই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না— কিছু মনে করিবেন না বিনোদ- বৌঠান, এমন লক্ষ্মীকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় দেয় !’’

আশা এক কোণে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে আঁচল তুলিয়া ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার পরে বিনোদিনী আর যাইবার কথা উত্থাপন করিল না।

অধ্যায় - ১৭

মাঝখানের এই গোলমালটা একেবারে মুছিয়া ফেলিবার জন্য মহেন্দ্র প্রস্তাব করিল, “আসছে রবিবারে দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।”

আশা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিনোদিনী কিছুতেই রাজি হইল না। মহেন্দ্র ও আশা বিনোদিনীর আপন্তিতে ভারি মুষড়িয়া গেল। তাহারা মনে করিল, আজকাল বিনোদিনী কেমন যেন দূরে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

বিকালবেলায় বিহারী আসিবামাত্র বিনোদিনী কহিল, “দেখুন তো বিহারীবাবু, মহিনবাবু দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিতে যাইবেন, আমি সঙ্গে যাইতে চাহি নাই বলিয়া আজ সকাল হইতে দুই জনে মিলিয়া রাগ করিয়া বসিয়াছেন।”

বিহারী কহিল, “অন্যায় রাগ করেন নাই। আপনি না গেলে ইঁহাদের চড়িভাতিতে যে কাণ্টা হইবে, অতিবড়ো শক্রও যেন তেমন না হয়।”

বিনোদিনী। চলুন- না, বিহারীবাবু। আপনি যদি যান, তবে আমি যাইতে রাজি আছি।

বিহারী। উত্তম কথা। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কর্তা কী বলেন।

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর এই বিশেষ পক্ষপাতে কর্তা গৃহিণী উভয়েই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। বিহারীকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাবে মহেন্দ্রের অর্ধেক উৎসাহ উড়িয়া গেল। বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে সকল সময়েই অপ্রিয়, এই কথাটাই বন্ধুর মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য মহেন্দ্র ব্যস্ত— কিন্তু অতঃপর বিহারীকে আটক করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে।

মহেন্দ্র কহিল, “তা বেশ তো, ভালোই তো। কিন্তু বিহারী, তুমি যেখানে যাও একটা হাঙ্গামা না করিয়া ছাড় না। হয়তো সেখানে পাড়া হইতে রাজ্যের ছেলে জোটাইয়া বসিবে, নয় তো কোন্ গোরার সঙ্গে মারামারিই বাধাইয়া দিবে— কিছু বলা যায় না।”

বিহারী মহেন্দ্রের আন্তরিক অনিছা বুঝিয়া মনে মনে হাসিল— কহিল, “সেই তো সংসারের মজা, কিসে কী হয়, কোথায় কী ফেসাদ ঘটে, আগে হইতে কিছুই বলিবার জো নাই। বিনোদ- বৌঠান, তোরের বেলায় ছাড়িতে হইবে, আমি ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হইব।”

রবিবার ভোরে জিনিসপত্র ও চাকরদের জন্য একখানি থার্ড ক্লাস ও মনিবদের জন্য একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। বিহারী মন্ত- একটা প্যাকবাক্স সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত। মহেন্দ্র কহিল, “ওটা আবার কী আনিলে। চাকরদের গাড়িতে তো আর ধরিবে না।”

বিহারী কহিল, “ব্যস্ত হইয়ো না দাদা, সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।”

বিনোদিনী ও আশা গাড়িতে প্রবেশ করিল। বিহারীকে লইয়া কী করিবে, মহেন্দ্র তাই ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। বিহারী বোঝাটা গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিয়া চট করিয়া কোচবাঞ্চে চড়িয়া বসিল।

মহেন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ভাবিতেছিল, ‘বিহারী ভিতরেই বসে কি কী করে, তাহার ঠিক নাই।’ বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, ‘বিহারীবাবু, পড়িয়া যাবেন না তো?’

বিহারী শুনিতে পাইয়া কহিল, ‘ভয় করিবেন না, পতন ও মূর্ছা— ওটা আমার পার্টের মধ্যে নাই।’

গাড়ি চলিতেই মহেন্দ্র কহিল, ‘আমিই নাহয় উপরে গিয়া বসি, বিহারীকে ভিতরে পাঠাইয়া দিই।’

আশা ব্যস্ত হইয়া তাহার চাদর চাপিয়া কহিল, ‘না, তুমি যাইতে পারিবে না।’

বিনোদিনী কহিল, ‘আপনার অভ্যাস নাই, কাজ কী, যদি পড়িয়া যান।’

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, ‘পড়িয়া যাব? কখনো না।’ বলিয়া তখনই বাহির হইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল, ‘আপনি বিহারীবাবুকে দোষ দেন, কিন্তু আপনিই তো হঙ্গাম বাধাইতে অদ্বিতীয়।’

মহেন্দ্র মুখ ভার করিয়া কহিল, ‘আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। আমি একটা আলাদা গাড়ি ভাড়া করিয়া যাই, বিহারী ভিতরে আসিয়া বসুক।’

আশা কহিল, ‘তা যদি হয়, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।’

বিনোদিনী কহিল, ‘আর আমি বুঝি গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িব?’ এমনি গোলমাল করিয়া কথাটা থামিয়া গেল।

মহেন্দ্র সমস্ত পথ মুখ অত্যন্ত গন্তব্য করিয়া রাখিল।

দমদমের বাগানে গাড়ি পৌঁছিল। চাকরদের গাড়ি অনেক আগে ছাড়িয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার খোঁজ নাই।

শরৎকালের প্রাতঃকাল অতি মধুর। রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্মল আলোকে বালমল করিতেছে। প্রাচীরের গায়ে শেফালিগাছের সারি রহিয়াছে, তলদেশ ফুলে আচ্ছন্ন এবং গঙ্গে আমোদিত।

আশা কলিকাতার ইষ্টকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া বন্যমৃগীর মতো উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে লইয়া রাশীকৃত ফুল কুড়াইল, গাছ হইতে পাকা আতা পাড়িয়া আতাগাছের তলায় বসিয়া খাইল, দুই সখীতে দিঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করিল। এই দুই নারীতে মিলিয়া একটি নিরৰ্থক আনন্দে- গাছের ছায়া এবং শাখাচূড়ত আলোক, দিঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পপল্লবকে পুলকিত সচেতন করিয়া তুলিল।

স্নানের পর দুই সখী আসিয়া দেখিল, চাকরদের গাড়ি তখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। মহেন্দ্র বাড়ির বারান্দায় চৌকি লইয়া অত্যন্ত শুক্ষমুখে একটা বিলাতি দোকানের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, ‘বিহারীবাবু কোথায়!?’

মহেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর করিল, ‘জানি না।’

বিনোদিনী। চলুন, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করি গে।

মহেন্দ্র। তাহাকে কেহ ছুরি করিয়া লইবে, এমন আশঙ্কা নাই। না খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে।

বিনোদিনী। কিন্তু তিনি হয়তো আপনার জন্য ভাবিয়া মরিতেছেন, পাছে দুর্লভ রত্ন খোওয়া যায়। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আসা যাক।

জলাশয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো বটগাছ আছে, সেইখানে বিহারী তাহার প্যাকবাস্ক খুলিয়া একটি কেরোসিন- চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে। সকলে আসিবামাত্র আতিথ্য করিয়া বাঁধা বেদির উপর বসাইয়া এক এক পেয়ালা গরম চা এবং ছোটো রেকাবিতে দুই একটি মিষ্টান্ন ধরিয়া দিল। বিনোদিনী বারবার বলিতে লাগিল, ‘ভাগ্যে বিহারীবাবু সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই তো রক্ষা, নহিলে চা না পাইলে মহেন্দ্রবাবুর কী দশা হইত।’

চা পাইয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল, তবু বলিল, “বিহারীর সমস্ত বাড়াবাড়ি। চড়িভাতি করিতে আসিয়াছি, এখানেও সমস্ত দস্তরমত আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। ইহাতে মজা থাকে না।”

বিহারী কহিল, ‘তবে দাও ভাই তোমার চায়ের পেয়ালা, তুমি না খাইয়া মজা করো গে— বাধা দিব না।’

বেলা হয়, চাকররা আসিল না। বিহারীর বাস্তু হইতে আহারাদির সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বাহির হইতে লাগিল। চাল- ডাল, তরি- তরকারি এবং ছোটো ছোটো বোতলে পেষা মশলা আবিষ্কৃত হইল। বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, ‘বিহারীবাবু, আপনি যে আমাদেরও ছাড়াইয়াছেন। ঘরে তো গৃহিণী নাই, তবে শিখিলেন কোথা হইতে।’

বিহারী কহিল, ‘প্রাণের দায়ে শিখিয়াছি, নিজের যত্ন নিজেকেই করিতে হয়।’

বিহারী নিতান্ত পরিহাস করিয়া কহিল, কিন্তু বিনোদিনী গন্তীর হইয়া বিহারীর মুখে করণচক্ষের কৃপা বর্ষণ করিল।

বিহারী ও বিনোদিনীতে মিলিয়া ঝাঁধাবাড়ায় প্রবৃত্ত হইল। আশা ক্ষীণ সংকুচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে, বিহারী তাহাতে বাধা দিল। অপটু মহেন্দ্র সাহায্য করিবার কোনো চেষ্টাও করিল না। সে গুঁড়ির উপরে হেলান দিয়া একটা পায়ের উপরে আর একটা পা তুলিয়া কম্পিত বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের ন্যূন্য দেখিতে লাগিল।

রঞ্জন প্রায় শেষ হইলে পর বিনোদিনী কহিল, ‘মহিনবাবু, আপনি ঐ বটের পাতা গনিয়া শেষ করিতে পারিবেন না, এবারে স্নান করিতে যান।’

ভৃত্যের দল এতক্ষণে জিনিসপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ি পথের মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছিল। তখন বেলা দুপুর হইয়া গেছে।

আহারান্তে সেই বটগাছের তলায় তাস খেলিবার প্রস্তাৱ হইল— মহেন্দ্ৰ কোনোমতেই গা দিল না এবং দেখিতে দেখিতে ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িল। আশা বাড়ির মধ্যে গিয়া দ্বার রংদ্ব কৱিয়া বিশ্বামের উদ্যোগ কৱিল।

বিনোদিনী মাথার উপরে একটুখানি কাপড় তুলিয়া দিয়া কহিল, ‘আমি তবে ঘৰে যাই।’

বিহারী কহিল, ‘কোথায় যাইবেন, একটু গল্প কৱণ। আপনাদের দেশের কথা বলুন।’

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তৰপল্লব মৰ্মৱিত কৱিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘিৰ পাড়ে জামগাছের ঘনপত্ৰের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকাৰ কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথিৰ কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল, বিনোদিনীৰ মুখে খৰযোবনেৰ যে একটি দীপ্তি সৰ্বদাই বিৱাজ কৱিত, বাল্যসূতিৰ ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিফ্ফ কৱিয়া দিল। বিনোদিনীৰ চক্ষে যে কৌতুকতীতি কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীৰ মনে এ পৰ্যন্ত নানাপ্ৰকাৱ সংশয় উপস্থিতি হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় স্নান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আৱ- একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলেৰ কেন্দ্ৰহুলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধাৰায় সৱস হইয়া আছে, অপৱিতৃষ্ণ রঞ্জৱস কৌতুকবিলাসেৰ দহনজালায় এখনো নারীপ্ৰকৃতি শুক্ষ হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ সতীষ্ঠীভাৱে একান্ত- ভক্তিভৱে পতিসেবা কৱিতেছে, কল্যাণপৱিপূৰ্ণা জননীৰ মতো সন্তানকে কোলে ধৰিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূৰ্বে মুহূৰ্তেৰ জন্যও বিহারীৰ মনে উদিত হয় নাই- আজ যেন রঞ্জমধ্যেৰ পটখানা ক্ষণকালেৰ জন্য উড়িয়া গিয়া ঘৰেৰ ভিতৰকাৱ একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, বিনোদিনী বাহিৱে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তৰে একটি পূজারতা নারী নিৱশনে তপস্যা কৱিতেছে।

বিহারী দীৰ্ঘনিশাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, ‘প্ৰকৃত- আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পাৱে না, অন্তৰ্যামীই জানেন; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিৱে গড়িয়া উঠে সংসাৱেৰ কাছে সেইটেই সত্য।’ বিহারী কথাটাকে থামিতে দিল না- প্ৰশ্ন কৱিয়া কৱিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল; বিনোদিনী এ- সকল কথা এ পৰ্যন্ত এমন কৱিয়া শোনাইবাৱ লোক পায় নাই- বিশেষত, কোনো পুৱন্ধৈৰ কাছে সে এমন আত্মবিস্মৃত স্বাভাৱিক ভাৱে কথা কহে নাই- আজ অজন্ম কলকঞ্চে নিতান্ত সহজ হৃদয়েৰ কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্ৰকৃতি যেন নববাৱিধাৰায় স্নাত, স্নিফ্ফ এবং পৱিত্ৰ হইয়া গেল।

তোৱে উঠিবাৱ উপদ্রবে ক্লান্ত মহেন্দ্ৰেৰ পাঁচটাৰ সময় ঘুম ভাঙিল। বিৱক্ত হইয়া কহিল, “এবাৱ ফিৱিবাৱ উদ্যোগ কৱা যাক।”

বিনোদিনী কহিল, ‘আৱ- একটু সন্ধ্যা কৱিয়া গেলে কি ক্ষতি আছে।’

মহেন্দ্ৰ কহিল, ‘না, শেষকালে মাতাল গোৱাৰ হাতে পড়িতে হইবে?’

জিনিসপত্ৰ গুছাইয়া তুলিতে অন্ধকাৱ হইয়া আসিল। এমন সময় চাকৱ আসিয়া খবৱ দিল, ‘ঠিকা গাড়ি কোথায় গেছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গাড়ি বাগানেৰ বাহিৱে অপেক্ষা কৱিতেছিল, দুইজন গোৱা গাড়োয়ানেৰ প্ৰতি বল প্ৰকাশ কৱিয়া স্টেশনে লইয়া গেছে।’

আৱ- একটা গাড়ি ভাড়া কৰিতে চাকৰকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিৱৰ্ক মহেন্দ্ৰ কেবলই মনে মনে কহিতে লাগিল, ‘আজ দিনটা মিথ্যা মাটি হইয়াছে।’ অধৈর্য সে আৱ কিছুতেই গোপন কৰিতে পাৱে না, এমনি হইল।

শুল্কপক্ষেৰ চাঁদ ক্ৰমে শাখাজালজড়িত দিক্প্রান্ত হইতে মুক্ত আকাশে আৱোহণ কৱিল। নিষ্ঠন্ধ নিষ্ঠস্প বাগান ছায়ালোকে খচিত হইয়া উঠিল। আজ এই মায়ামণ্ডিত পৃথিবীৰ মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কী একটা অপূৰ্বভাবে অনুভব কৱিল। আজ সে যখন তরুণীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধৰিল, তাহার মধ্যে প্ৰণয়েৰ কুণ্ডিমতা কিছুই ছিল না। আশা দেখিল, বিনোদিনীৰ দুই চক্ষু দিয়া জল ঝৱিয়া পড়িতেছে। আশা ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা কৱিল, “কী ভাই চোখেৰ বালি, তুমি কাঁদিতেছ কেন?”

বিনোদিনী কহিল, “কিছুই নয় ভাই, আমি বেশ আছি। আজ দিনটা আমাৱ বড়ো ভালো লাগিল।”

আশা জিজ্ঞাসা কৱিল, “কিসে তোমাৱ এত ভালো লাগিল, ভাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আমাৱ মনে হইতেছে, আমি যেন মৱিয়া গেছি, যেন পৱলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমাৱ সমস্তই মিলিতে পাৱে।”

বিস্মিত আশা এ- সব কথা কিছুই বুবিতে পাৱিল না। সে মৃত্যুৰ কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া কহিল, “ছি ভাই চোখেৰ বালি, অমন কথা বলিতে নাই।”

গাড়ি পাওয়া গেল। বিহারী পুনৱায় কোচবাঞ্চে ঢিয়া বসিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া বাহিৱেৰ দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎস্নায় সন্তুষ্টি তরুণেণী ধাৰমান নিবিড় ছায়াস্তোত্ৰে মতো তাহার চোখেৰ উপৰ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়িৰ কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্ৰ সুনীৰ্ধ পথ নিতান্ত বিমৰ্শ হইয়া বসিয়া থাকিল।

অধ্যায় - ১৮

চড়িভাতির দুর্দিনের পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আর- এক বার ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎসুক ছিল। কিন্তু তাহার পরদিনেই রাজলক্ষ্মী ইনফ্লুয়েঞ্জ- জ্বরে পড়িলেন। রোগ গুরুতর নহে, তবু তাহার অসুখ ও দুর্বলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিনরাত্রি তাহার সেবায় নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, “দিনরাত এমন করিয়া খাটিলে শেষকালে তুমই যে অসুখে পড়িবে। মার সেবার জন্যে আমি লোক ঠিক করিয়া দিতেছি।”

বিহারী কহিল, “মহিনদা, তুমি অত ব্যস্ত হইয়ো না। উনি সেবা করিতেছেন, করিতে দাও। এমন করিয়া কি আর কেহ করিতে পারিবে।”

মহেন্দ্র রোগীর ঘরে ঘনঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। একটা লোক কোনো কাজ করিতেছে না, অথচ কাজের সময় সর্বদাই সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কর্মিষ্ঠা বিনোদিনীর পক্ষে অসহ্য। সে বিরক্ত হইয়া দুই-তিনবার কহিল, “মহিনবাবু, আপনি এখানে বসিয়া থাকিয়া কী সুবিধা করিতেছেন। আপনি যান— অনর্থক কালেজ কামাই করিবেন না।”

মহেন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করে, ইহাতে বিনোদিনীর গর্ব এবং সুখ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এমনতরো কাঙ্গালপনা, ঝুঁঁগনা মাতার শয্যাপার্শ্বেও লুক্ষণ্যদয়ে বসিয়া থাকা— ইহাতে তাহার ধৈর্য থাকিত না, ঘৃণাবোধ হইত। কোনো কাজ যখন বিনোদিনীর উপর নির্ভর করে, তখন সে আর- কিছুই মনে রাখে না। যতক্ষণ খাওয়ানো- দাওয়ানো, রোগীর সেবা, ঘরের কাজ প্রয়োজন, ততক্ষণ বিনোদিনীকে কেহ অনবধান দেখে নাই— সেও প্রয়োজনের সময় কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না।

বিহারী অল্পক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে রাজলক্ষ্মীর সংবাদ লইতে আসে। ঘরে তুকিয়াই কী দরকার, তাহা সে তখনই বুঝিতে পারে— কোথায় একটা- কিছুর অভাব আছে, তাহা তাহার চোখে পড়ে— মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যায়। বিনোদিনী মনে বুঝিতে পারিত, বিহারী তাহার শুশ্রাবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে। সেইজন্য বিহারীর আগমনে সে যেন বিশেষ পূরক্ষার লাভ করিত।

মহেন্দ্র নিতান্ত ধিককারবেগে অত্যন্ত কড়া নিয়মে কালেজে বাহির হইতে লাগিল। একে তাহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া রহিল, তাহার পরে এ কী পরিবর্তন। খাবার ঠিক সময়ে হয় না, সইস্টা নিরাম্বেশ হয়, মোজাজোড়ার ছিদ্র ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে। এখন এই- সমস্ত বিশ্বজ্ঞানায় মহেন্দ্রের পূর্বের ন্যায় আমোদ বোধ হয় না। যখন যেটি দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে সুসজ্জিত পাইবার আরাম কাহাকে বলে, তাহা সে কয়দিন জানিতে পারিয়াছে। এক্ষণে তাহার অভাবে, আশার অশিক্ষিত অপটুতায় মহেন্দ্রের আর কৌতুকবোধ হয় না।

“চুনি, আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, স্নানের আগেই আমার জামায় বোতাম পরাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, আর আমার চাপকান- প্যাণ্টলুন ঠিক করিয়া রাখিয়া দিবে— একদিনও তাহা হয় না। স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার দু ঘণ্টা যায়।”

অনুত্ত আশা লজ্জায় ম্লান হইয়া বলে, “আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।”

“বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে! নিজের হাতে করিতে দোষ কী। তোমার দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়!”

ইহা আশাৰ পক্ষে বজ্রাঘাত। এমন ভৱৎসনা সে কখনো পায় নাই। এ জবাৰ তাহার মুখে বা মনে আসিল না যে, ‘তুমই তো আমাৰ কৰ্মশিক্ষাৰ ব্যাঘাত কৰিয়াছ।’-এই ধাৰণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকৰ্মশিক্ষা নিয়ত অভ্যস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। সে মনে কৰিত, ‘আমাৰ স্বাভাৱিক অক্ষমতা ও নিৰ্বুদ্ধিতাৰ সহিত কোনো কাজ ঠিকমতো কৰিয়া উঠিতে পাৰি না।’ মহেন্দ্ৰ যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া বিনোদিনীৰ সহিত তুলনা দিয়া আশাৰে ধিক্কার দিয়াছে, তখন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্ৰহণ কৰিয়াছে।

আশা এক- একবাৰ তাহার রংগণা শাশ্বতিৰ ঘৰেৱ আশেপাশে ঘুৱিয়া বেড়ায়— এক- একবাৰ লজ্জিতভাৱে ঘৰেৱ দ্বাৰেৱ কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে সংসাৱেৱ পক্ষে আবশ্যক কৰিয়া তুলিতে ইচ্ছা কৰে, সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ তাহার কাজ চাহে না। সে জানে না কেমন কৰিয়া কাজেৰ মধ্যে প্ৰৱেশ কৰা যায়, কেমন কৰিয়া সংসাৱেৱ মধ্যে স্থান কৰিয়া লইতে হয়। সে নিজেৰ অক্ষমতাৰ সংকোচে বাহিৱে বাহিৱে ফিৰে। তাহার কী- একটা মনোবেদনাৰ কথা অন্তৱে প্ৰতিদিন বাঢ়িতেছে, কিন্তু তাহার সেই অপৰিস্কৃট বেদনা, সেই অব্যক্ত আশক্ষাকে সে স্পষ্ট কৰিয়া বুৰিতে পাৱে না। সে অনুভব কৰে, তাহার চারি দিকেৰ সমষ্টই সে যেন নষ্ট কৰিতেছে— কিন্তু কেমন কৰিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কেমন কৰিয়াই যে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেমন কৰিলে যে তাহার প্ৰতিকাৰ হইতে পাৱে তাহা সে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবল গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা কৰে, ‘আমি অত্যন্ত অযোগ্য, নিতান্ত অক্ষম, আমাৰ মৃচ্যুতাৰ কোথাও তুলনা নাই।’

পূৰ্বে তো আশা ও মহেন্দ্ৰ সুদীৰ্ঘকালে দুই জনে এক গৃহকোণে বসিয়া কখনো কথা কহিয়া, কখনো কথা না কহিয়া, পৱিপূৰ্ণ সুখে সময় কাটাইয়াছে। আজকাল বিনোদিনীৰ অভাৱে আশাৰ সঙ্গে একলা বসিয়া মহেন্দ্ৰেৰ মুখে কিছুতেই যেন সহজে কথা জোগায় না— এবং কিছু না কহিয়া চুপ কৰিয়া থাকিতেও তাহার বাধো- বাধো ঠেকে।

মহেন্দ্ৰ বেহারাকে জিজ্ঞাসা কৰিল, “ও চিঠি কাহার।”

“বিহারীবাবুৰ।”

“কে দিল।”

“বহু- ঠাকুৱাণী।” (বিনোদিনী)

“দেখি” বলিয়া চিঠিখানা লইল। ইচ্ছা হইল ছিঁড়িয়া পড়ে। দু- চারিবাৰ উলটাপালটা কৰিয়া নাড়িয়া- চাড়িয়া বেহারার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। যদি চিঠি খুলিত, তবে দেখিত, তাহাতে লেখা আছে, ‘পিসিমা কোনোমতেই সাগু- বাৰ্লি খাইতে চান না, আজ কি তাঁহাকে ডালেৱ বোল খাইতে দেওয়া হইবে।’ গ্ৰন্থপথ্য লইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্ৰকে কখনো কোনো কথা জিজ্ঞাসা কৰিত না, সে- সম্বন্ধে বিহারীৰ প্ৰতিই তাহার নিৰ্ভৰ।

মহেন্দ্ৰ বাৱান্দায় খানিকক্ষণ পায়চাৰি কৰিয়া ঘৰে ঢুকিয়া দেখিল, দেয়ালে টাঙানো একটা ছবিৰ দড়ি ছিন্নপ্ৰায় হওয়াতে ছবিটা বাঁকা হইয়া আছে। আশাৰে অত্যন্ত ধৰক দিয়া কহিল, ‘তোমাৰ চোখে কিছুই

পড়ে না, এমনি করিয়া সমস্ত জিনিস নষ্ট হইয়া যায়।” দমদমের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া যে-তোড়া বিনোদনী পিতলের ফুলদানিতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, আজও তাহা শুক্র অবস্থায় তেমনিভাবে আছে; অন্যদিন মহেন্দ্র এ- সমস্ত লক্ষ্যই করে না— আজ তাহা চোখে পড়িল। কহিল, “বিনোদনী আসিয়া না ফেলিয়া দিলে, ও আর ফেলাই হইবে না।” বলিয়া ফুলসুন্দ ফুলদানি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল, তাহা ঠংঠং শব্দে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিল। ‘কেন আশা আমার মনের মতো হইতেছে না, কেন সে আমার মনের মতো কাজ করিতেছে না, কেন তাহার স্বভাবগত শৈথিল্য ও দুর্বলতায় সে আমাকে দাস্পত্যের পথে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতেছে না, সর্বদা আমাকে বিক্ষিণ্ণ করিয়া দিতেছে।’— এই কথা মহেন্দ্র মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে হঠাতে দেখিল, আশার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেছে, সে খাটের থাম ধরিয়া আছে, তাহার ঠেঁট- দুটি কাঁপিতেছে— কাঁপিতে কাঁপিতে সে হঠাতে বেগে পাশের ঘর দিয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে গিয়া ফুলদানিটা কুড়াইয়া আনিয়া রাখিল। ঘরের কোণে তাহার পড়িবার টেবিল ছিল— চৌকিতে বসিয়া সেই টেবিলটার উপর হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রাখিল।

সন্ধ্যার পর ঘরে আলো দিয়া গেল, কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র দ্রুতপদে ছাদের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি নটা বাজিল, মহেন্দ্রদের লোকবিরল গৃহ রাত- দুপুরের মতো নিষ্কৃত হইয়া গেল— তবু আশা আসিল না। মহেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশা সংকুচিত পদে আসিয়া ছাদের প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রাখিল। মহেন্দ্র কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল— মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর বুকের উপর আশার কান্না ফাটিয়া পড়িল— সে আর থামিতে পারে না, তাহার চোখের জল আর ফুরায় না, কান্নার শব্দ গলা ছাড়িয়া বাহির হইতে চায়, সে আর চাপা থাকে না। মহেন্দ্র তাহাকে বক্ষে বদ্ধ করিয়া কেশচুম্বন করিল— নিঃশব্দ আকাশে তারাগুলি নিষ্কৃত হইয়া চাহিয়া রাখিল।

রাত্রে বিছানায় বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, “কালেজে আমাদের নাইট- ডিউটি অধিক পড়িয়াছে, অতএব এখন কিছুকাল আমাকে কালেজের কাছেই বাসা করিয়া থাকিতে হইবে।”

আশা ভাবিল, ‘এখনো কি রাগ আছে। আমার উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন? নিজের নির্ণয়তায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম? আমার তো মরা ভালো ছিল।’

কিন্তু মহেন্দ্রের ব্যবহারে রাগের লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। সে অনেকক্ষণ কিছু না বলিয়া আশার মুখ বুকের উপর রাখিল এবং বারংবার অঙ্গুলি দিয়া তাহার চুল চিরিতে চিরিতে তাহার খেঁপা শিথিল করিয়া দিল। পূর্বে আদরের দিনে মহেন্দ্র এমন করিয়া আশার বাঁধা চুল খুলিয়া দিত— আশা তাহাতে আপত্তি করিত। আজ আর সে তাহাতে কোনো আপত্তি না করিয়া পুলকে বিহুল হইয়া চুপ করিয়া রাখিল। হঠাতে এক সময় তাহার ললাটের উপর অশ্রবিন্দু পড়িল, এবং মহেন্দ্র তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া মেহরগন্ধ স্বরে ডাকিল, ‘চুনি।’ আশা কথায় তাহার কোনো উত্তর না দিয়া দুই কোমল হস্তে মহেন্দ্রকে চাপিয়া ধরিল। মহেন্দ্র কহিল, ‘অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করো।’

আশা তাহার কুসুম- সুকুমার করপল্লব মহেন্দ্রের মুখের উপর চাপা দিয়া কহিল, ‘না, না, অমন কথা বলিয়ো না। তুমি কোনো অপরাধ কর নাই। সকল দোষ আমার। আমাকে তোমার দাসীর মতো শাসন করো। আমাকে তোমার চরণশ্রয়ের যোগ্য করিয়া লও।’

বিদায়ের প্রভাতে শ্যাত্যাগ করিবার সময় মহেন্দ্র কহিল, ‘চুনি, আমার রত্ন, তোমাকে আমার হৃদয়ে সকলের উপরে ধারণ করিয়া রাখিব, সেখানে কেহ তোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।’

তখন আশা দৃঢ়চিত্রে সর্বপ্রকার ত্যাগস্থীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীর নিকট নিজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দাবি দাখিল করিল। কহিল, “তুমি আমাকে রোজ একখানি করিয়া চিঠি দিবে?”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমি কি দিবে?”

আশা কহিল, ‘আমি কি লিখিতে জানি।’

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছে অলকণ্ঠে টানিয়া দিয়া কহিল, “তুমি অক্ষয়কুমার দন্তের চেয়ে ভালো লিখিতে পার— চারুপাঠ যাহাকে বলে।”

আশা কহিল, ‘যাও, আমাকে আর ঠাট্টা করিয়ো না।’

যাইবার পূর্বে আশা যথাসাধ্য নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোর্টম্যাণ্টে সাজাইতে বসিল। মহেন্দ্রের মোটা মোটা শীতের কাপড় ঠিকমতো ভাঁজ করা কঠিন, বাক্সে ধরানো শক্ত— উভয়ে মিলিয়া কোনোমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুসি করিয়া, যাহা এক বাক্সে ধরিত, তাহাতে দুই বাক্স বোঝাই করিয়া তুলিল। তবু যাহা ভুলক্রমে বাকি রহিল, তাহাতে আরো অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুঁটুলির সৃষ্টি হইল। ইহা লইয়া আশা যদিও বার বার লজ্জাবোধ করিল, তবু তাহাদের কাড়াকাড়ি, কৌতুক ও পরম্পরের প্রতি সহাস্য দোষারোপে পূর্বেকার আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। এ যে বিদায়ের আয়োজন হইতেছে, তাহা আশা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল। সহিস দশবার গাড়ি তৈয়ারির কথা মহেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না— অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, “ঘোড়া খুলিয়া দাও।”

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হয়। তখন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরম্পরাকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠি লেখা সম্বন্ধে বারংবার প্রতিশ্রূত করাইয়া লইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরম্পরের বিচ্ছেদ হইল।

রাজলক্ষ্মী আজ দুইদিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় গায়ে মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে তাস খেলিতেছেন। আজ তাহার শরীরে কোনো গ্রানি নাই। মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর দিকে একেবারেই চাহিল না— মাকে কহিল, “মা, কালেজে আমার রাত্রের কাজ পড়িয়াছে, এখানে থাকিয়া সুবিধা হয় না— কালেজের কাছে বাসা লইয়াছি। সেখানে আজ হইতে থাকিব।”

রাজলক্ষ্মী মনে মনে অভিমান করিয়া কহিলেন, ‘তা যাও। পড়ার ক্ষতি হইলে কেমন করিয়া থাকিবে।’

যদিও তাহার রোগ সারিয়াছে, তবু মহেন্দ্র যাইবে শুনিয়া তখনি তিনি নিজেকে অত্যন্ত রুগ্ণ ও দুর্বল বলিয়া কল্পনা করিলেন; বিনোদিনীকে বলিলেন, “দাও তো বাছা, বালিশটা আগাইয়া দাও।” বলিয়া বালিশ অবলম্বন করিয়া শুইলেন, বিনোদিনী আন্তে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মহেন্দ্র একবার মার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিল। রাজলক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, ‘নাড়ী দেখিয়া তো ভারি বোঝা যায়। তোর আর ভাবিতে হইবে না, আমি বেশ আছি।’ বলিয়া যন্ত দুর্বলভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কোনোপ্রকার বিদায়সন্তান না করিয়া রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘ব্যাপারখানা কী ! অভিমান, না রাগ, না ভয় ? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে কেয়ার করেন না? বাসায় গিয়া থাকিবেন? দেখি কতদিন থাকিতে পারেন?’

কিন্তু বিনোদিনীরও মনে মনে একটা অশান্ত ভাব উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে সে প্রতিদিন নানা পাশে বদ্ধ ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, সে- কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এ- পাশ ও- পাশ করিতে লাগিল। বাড়ি হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার

প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ- যত্ন বিনোদিনীর প্রগয়বঞ্চিত চিন্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত— তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে- বেদনায় জাগরুক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উভেজনা ছিল। যে- মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে- মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবৃদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুরেরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, ‘কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।’ কিন্তু যে কারণেই বল, দন্ধ হইতেই হটক বা দন্ধ করিতেই হটক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিদ্ধি অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিশ্চাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, ‘সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।’

আশা ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া সন্ধ্যার সময় মহেন্দ্রের বাহিরের ঘরে, মাথার- তেলে- দাগ- পড়া মহেন্দ্রের বসিবার কেদারা, কাগজপত্র- ছড়ানো ডেক্স, তাহার বই, তাহার ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্র বার বার নাড়াচাড়া এবং অঞ্চল দিয়া ঝাড়- পৌঁচ করিতেছিল। এইরূপে মহেন্দ্রের সকল জিনিস নানা রূপে স্পর্শ করিয়া, একবার রাখিয়া, একবার তুলিয়া, আশার বিরহসন্ধ্যা কাটিতেছিল। বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; আশা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া তাহার নাড়াচাড়ার কাজ রাখিয়া দিয়া, কী যেন খুঁজিতেছে এমনিতরো ভান করিল। বিনোদিনী গন্তব্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কী হচ্ছে তোর, ভাই !’

আশা মুখে একটুখানি হাসি জাগাইয়া কহিল, ‘কিছুই না, ভাই।’

বিনোদিনী তখন আশার গলা জড়াইয়া কহিল, “কেন ভাই বালি, ঠাকুরপো এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন !”

আশা বিনোদিনীর এই প্রশ্নমাত্রেই সংশয়ান্বিত সশঙ্কিত হইয়া উত্তর করিল , ‘তুমি তো জানই, ভাই- কালেজে তাঁহার বিশেষ কাজ পড়িয়াছে বলিয়া গেছেন।’

বিনোদিনী ডান হাতে আশার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া যেন করণ্যায় বিগলিত হইয়া শুন্ধভাবে একবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল এবং দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিল।

আশার বুক দমিয়া গেল। নিজেকে সে নির্বোধ এবং বিনোদিনীকে বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিত। বিনোদিনীর ভাবখানা দেখিয়া হঠাৎ তাহার বিশ্বসংসার অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে স্পষ্ট করিয়া কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। দেয়ালের কাছে একটা সোফার উপরে বসিল। বিনোদিনীও তাহার পাশে বসিয়া দৃঢ় বাহু দিয়া আশাকে বুকের কাছে বাঁধিয়া ধরিল।

সখীর সেই আলিঙ্গনে আশা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দ্বারের কাছে অন্ধ ভিখারি খঙ্গনি বাজাইয়া গাহিতেছিল, ‘চরণতরণী দে মা, তারণী তারা।’

বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিয়া দ্বারের কাছে পৌছিতেই দেখিল— আশা কাঁদিতেছে, এবং বিনোদিনী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেছে। দেখিয়াই বিহারী সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। পাশের শূন্য ঘরে গিয়া অন্ধকারে বসিল। দুই করতলে মাথা চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, আশা কেন কাঁদিবে। যে মেয়ে স্বভাবতই কাহারও কাছে লেশমাত্র অপরাধ করিতে অক্ষম, তাহাকেও কাঁদাইতে পারে এমন পাষণ্ড জগতে কে আছে ! তার পরে বিনোদিনী যেমন করিয়া সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহা মনে আনিয়া মনে মনে কহিল, ‘বিনোদিনীকে ভারি ভুল বুঝিয়াছিলাম। সেবায় সান্ত্বনায়, নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে সে মর্তবাসিনী দেবী।’

বিহারী অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অন্ধের গান থামিয়া গেলে বিহারী সশব্দে পা ফেলিয়া, কাশিয়া, ঘরের মহেন্দ্রের দিকে চলিল। দ্বারের কাছে না যাইতেই ঘোমটা টানিয়া আশা দ্রুতপদে অঙ্গঃপুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

ঘরে চুকিতেই বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, “এ কী বিহারীবাবু ! আপনার কি অসুখ করিয়াছে।”

বিহারী। কিছু না।

বিনোদিনী। চোখ দুটো অমন লাল কেন।

বিহারী তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, ‘বিনোদ- বৌঠান, মহেন্দ্র কোথায় গেল।’

বিনোদিনী মুখ গন্তীর করিয়া কহিল, “শুনিলাম, হাসপাতালে তাহার কাজ পড়িয়াছে বলিয়া কালেজের কাছে তিনি বাসা করিয়া আছেন। বিহারীবাবু একটু সরুন, আমি তবে আসি।”

অন্যমনক্ষ বিহারী দ্বারের কাছে বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার সময় একলা বাহিরের ঘরে বিনোদিনীর সঙ্গে কথাবার্তা লোকের চক্ষে সুন্দৃশ্য নয়, সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল। বিনোদিনীর চলিয়া যাইবার সময় বিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া লইল, ‘বিনোদ- বৌঠান, আশাকে তুমি দেখিয়ো। সে সরলা, কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে আঘাত হইতে বাঁচাইতেও পারে না।’

বিহারী অন্ধকারে বিনোদিনীর মুখ দেখিতে পাইল না, সে মুখে হিংসার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আজ বিহারীকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে, আশার জন্য করুণায় তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ

সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে ! দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ ! প্রতিকূল ভাগ্য- বশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিন্তক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্তি ধরিল ।

অত্যন্ত মিষ্টস্বরে বিনোদিনী বিহারীকে বলিয়া গেল, ‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বিহারীবাবু। আমার চোখের বালির জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে বেশি কষ্ট দিবেন না।’

অধ্যায় - ২০

অনতিকাল পরেই মহেন্দ্র তাহার ছাত্রাবাসে চেনা হাতের অক্ষরে একখানি চিঠি পাইল। দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে খুলিল না— বুকের কাছে পকেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিল। কালেজে লেকচার শুনিতে শুনিতে, হাসপাতাল ঘুরিতে ঘুরিতে, হঠাৎ এক- একবার মনে হইতে লাগিল, ভালোবাসার একটা পাখি তাহার বুকের নীড়ে বাসা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেই তাহার সমস্ত কোমল কুজন কানে শুনিত হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যায় এক সময় মহেন্দ্র নির্জন ঘরে ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেশ করিয়া হেলান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। পকেট হইতে তাহার দেহতাপত্তি চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল। অনেকক্ষণ চিঠি না খুলিয়া লেফাফার উপরকার শিরোনামা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই। আশা নিজের মনের ভাব ঠিকমতো ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সন্দাবনা ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথাগুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার কাঁচা হাতে বহুত্বে লেখা নিজের নামটি পড়িয়া মহেন্দ্র নিজের নামের সঙ্গে যেন একটা রাগিণী শুনিতে পাইল—তাহা সাধ্বী নারী- হৃদয়ের অতি নিভৃত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সংগীত।

এই দুই- একদিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের মন হইতে দীর্ঘ- মিলনের সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া সরলা বধূর নবপ্রেমে উদ্ভাসিত সুখস্মৃতি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেষাশেষি প্রাত্যহিক ঘরকমার খুঁটিনাটি অসুবিধা তাহাকে উত্ত্বক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে- সমস্ত অপসারিত হইয়া কেবলমাত্র কর্মহীন কারণহীন একটি বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের আলোকে আশার মানসীমূর্তি তাহার মনের মধ্যে প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাফা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া নিজের ললাটে কপোলে বুলাইয়া লইল। একদিন মহেন্দ্র যে- এসেন্স আশাকে উপহার দিয়াছিল, সেই এসেন্সের গন্ধ চিঠির কাগজ হইতে উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খুলিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু এ কী। যেমন বাঁকাচোরা লাইন, তেমন সাদাসিধা ভাষা নয় তো। কাঁচা- কাঁচা অক্ষর, কিন্তু কথাগুলি তো তাহার সঙ্গে মিলিল না। লেখা আছে—

‘প্রিয়তম, যাহাকে ভুলিবার জন্য চলিয়া গেছ, এ লেখায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিব কেন। যে লতাকে ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে, সে আবার কোন্ লজ্জায় জড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে। সে কেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া গেল না !

‘কিন্তু এটুকুতে তোমার কী ক্ষতি হইবে, নাথ। নাহয় ক্ষণকালের জন্য মনে পড়িলই বা। মনে তাহাতে কতটুকুই বা বাজিবে। আর, তোমার অবহেলা যে কাঁটার মতো আমার পাঁজরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিল। সকল দিন, সকল রাত, সকল কাজ, সকল চিঞ্চির মধ্যে যে দিকে ফিরি, সেই দিকেই যে আমাকে বিঁধিতে লাগিল। তুমি যেমন করিয়া ভুলিলে, আমাকে তেমনি করিয়া ভুলিবার একটা উপায় বলিয়া দাও।

‘নাথ, তুমি যে আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে, সে কি আমারই অপরাধ। আমি কি স্বপ্নেও এত সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমি কোথা হইতে আসিলাম, আমাকে কে জানিত। আমাকে যদি না চাহিয়া দেখিতে, আমাকে যদি তোমার ঘরে বিনা-বেতনের দাসী হইয়া থাকিতে হইত, আমি কি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারিতাম। তুমি নিজেই আমার কোন্ গুণে ভুলিলে প্রিয়তম, কী দেখিয়া আমার এত আদর বাঢ়াইলে। আর, আজ বিনা-মেঘে যদি বজ্রপাতাই হইল, তবে সে বজ্র কেবল দন্ধ করিল কেন। একেবারে দেহমন কেন ছাই করিয়া দিল না।

‘এই দুটো দিনে অনেক সহ্য করিলাম, অনেক ভাবিলাম, কিন্তু, একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না— ঘরে থাকিয়াও কি তুমি আমাকে ফেলিতে পারিতে না। আমার জন্যও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল। আমি কি তোমার এতখানি জুড়িয়া আছি। আমাকে তোমার ঘরের কোণে, তোমার ঘরের বাহিরে ফেলিয়া রাখিলেও কি আমি তোমার চোখে পড়িতাম। তাই যদি হয়, তুমি কেন গেলে, আমার কি কোথাও যাইবার পথ ছিল না। ভসিয়া আসিয়াছি, ভসিয়া যাইতাম।’

এ কী চিঠি। এ ভাষা কাহার, তাহা মহেন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল না। অকস্মাত আহত মৃর্ছিতের মতো মহেন্দ্র সে- চিঠিখানি লইয়া স্তম্ভিত হইয়া রাহিল। যে- লাইনে রেলগাড়ির মতো তাহার মন পূর্ণবেগে ছুটিয়াছিল, সেই লাইনেই বিপরীত দিক হইতে একটা ধাক্কা খাইয়া লাইনের বাহিরে তাহার মনটা যেন উলটাপালটা স্তুপাকার বিকল হইয়া পড়িয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে দুইবার তিনবার করিয়া পড়িল। কিছুকাল যাহা সুন্দূর আভাসের মতো ছিল, আজ তাহা যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার জীবনাকাশের এক কোণে যে ধূমকেতুটা ছায়ার মতো দেখাইতেছিল, আজ তাহার উদ্যত বিশাল পুচ্ছ অগ্নিরেখায় দীপ্যমান হইয়া দেখা দিল।

এ চিঠি বিনোদনীরই। সরলা আশা নিজের মনে করিয়া তাহা লিখিয়াছে। পূর্বে যে কথা সে কখনো ভাবে নাই, বিনোদনীর রচনামত চিঠি লিখিতে গিয়া সেই- সব কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নকল- করা কথা বাহির হইতে বন্ধমূল হইয়া তাহার আন্তরিক হইয়া গেল; যে- নৃতন বেদনার সৃষ্টি হইল, এমন সুন্দর করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে আশা কখনোই পারিত না। সে ভাবিতে লাগিল, ‘সখী আমার মনের কথা এমন ঠিকটি বুঝিল কী করিয়া। কেমন করিয়া এমন ঠিকটি প্রকাশ করিয়া বলিল।’ অন্তরঙ্গ সখীকে আশা আরো যেন বেশি আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় করিয়া ধরিল, কারণ, যে- ব্যথাটা তাহার মনের মধ্যে, তাহার ভাষাটি তাহার সখীর কাছে— সে এতই নিরূপায়।

মহেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া ন্দ কুণ্ঠিত করিয়া বিনোদনীর উপর রাগ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, মাঝে থেকে রাগ হইল আশার উপর। ‘দেখো দেখি, আশার এ কী মুঢ়তা, স্বামীর প্রতি এ কী অত্যাচার।’ বলিয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া প্রমাণস্বরূপ চিঠিখানা আবার পড়িল। পড়িয়া ভিতরে ভিতরে একটা হর্ষসঞ্চার হইতে লাগিল। চিঠিখানাকে সে আশারই চিঠি মনে করিয়া পড়িবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু এ ভাষায় কেনেমতেই সরলা আশাকে মনে করাইয়া দেয় না। দু- চার লাইন পড়িবামাত্র একটা সুখেন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মনের মতো মনকে চারি দিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। এই প্রচন্ড অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ নিকটাগত, বিষাক্ত অথচ মধুর, একই কালে উপহাত অথচ প্রত্যাহাত প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে মাতাল করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিজের হাতে- পায়ে কোথাও এক জায়গায় ছুরি বসাইয়া বা আর কিছু করিয়া নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর- কোনো দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। টেবিলে সজোরে মুষ্টি বসাইয়া চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, “দূর করো, চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলি।” বলিয়া চিঠিখানি ল্যাম্পের কাছাকাছি লইয়া গেল। পুড়াইল না, আর- একবার পড়িয়া ফেলিল। পরদিন

ত্ব্য টেবিল হইতে কাগজপোড়া ছাই অনেক ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা আশার চিঠির ছাই নহে, চিঠির উত্তর দিবার অনেকগুলো অসম্পূর্ণ চেষ্টাকে মহেন্দ্র পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে।

অধ্যায় - ২১

ইতিমধ্যে আরো এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল।—

‘তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না? ভালোই করিয়াছ। ঠিক কথা তো লেখা যায় না; তোমার যা জবাব, সে আমি মনে মনে বুবিয়া লইলাম। ভক্ত যখন তাহার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন। দুখিনীর বিল্পত্রখানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে।’

‘কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না, হৃদয়দেব! তুমি বর দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই। তাই আজিও এই দু- ছত্র চিঠি লিখিলাম— হে আমার পাষাণ- ঠাকুর, তুমি অবিচলিত হইয়া থাকো।’—

মহেন্দ্র আবার চিঠির উত্তর লিখিতে প্ৰত্ৰ হইল। কিন্তু আশাকে লিখিতে গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলমের মুখে আপনি আসিয়া পড়ে। ঢাকিয়া লুকাইয়া কৌশল করিয়া লিখিতে পারে না। অনেকগুলি ছিঁড়িয়া রাত্রে অনেক প্রহর কাটাইয়া একটা যদি বা লিখিল, সেটা লেফাফায় পুরিয়া উপরে আশার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ তাহার পিঠে যেন কাহার চাবুক পড়িল— কে যেন বলিল, “পাষণ্ড, বিশ্বস্ত বালিকার প্রতি এমনি করিয়া প্রতারণা?” চিঠি মহেন্দ্র সহস্র টুকুরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং বাকি রাতটা টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া নিজেকে যেন নিজের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

তৃতীয় পত্র— ‘যে একেবারেই অভিমান করিতে জানে না, সে কি ভালোবাসে। নিজের ভালোবাসাকে যদি অনাদর- অপমান হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি, তবে সে ভালোবাসা তোমাকে দিব কেমন করিয়া।

‘তোমার মন হয়তো ঠিক বুবি নাই, তাই এত সাহস করিয়াছি। তাই যখন ত্যাগ করিয়া গেলে, তখনো নিজে অগ্রসর হইয়া চিঠি লিখিয়াছি, যখন চুপ করিয়া ছিলে, তখনো মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তোমাকে যদি ভুল করিয়া থাকি, সে কি আমারই দোষ। একবার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সব কথা মনে করিয়া দেখো দেখি, যাহা বুবিয়াছিলাম, সে কি তুমিই বোঝাও নাই।

‘সে যাই হোক, ভুল হোক সত্য হোক, যাহা লিখিয়াছি সে আর মুছিবে না, যাহা দিয়াছি সে আর ফিরাইতে পারিব না, এই আক্ষেপ। ছি ছি, এমন লজ্জাও নারীর ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ভালো যে বাসে সে নিজের ভালোবাসাকে বরাবর অপদস্থ করিতে পারে। যদি আমার চিঠি না চাও তো থাক, যদি উত্তর না লিখিবে তবে এই পর্যন্ত— ’

ইহার পর মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মনে করিল, ‘অত্যন্ত রাগ করিয়াই ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি। বিনোদিনী মনে করে, তাহাকে ভুলিবার জন্যই ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছি! বিনোদিনীর সেই স্পর্ধাকে হাতে হাতে অপ্রমাণ করিবার জন্যই তখনই মহেন্দ্র ঘরে ফিরিবার সংকল্প করিল।

এমন সময় বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। বিহারীকে দেখিবামাত্র মহেন্দ্রের ভিতরের পুলক যেন দিগ্ধণ বাড়িয়া উঠিল। ইতিপূর্বে নানা সন্দেহে ভিতরে ভিতরে বিহারীর প্রতি তাহার ঈর্ষা জন্মিতেছিল, উভয়ের

বন্ধুত্ব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। পত্রপাঠের পর আজ সমস্ত ঈর্ষাভার বিসর্জন দিয়া বিহারীকে সে অতিরিক্ত আবেগের সহিত আহ্বান করিয়া লইল। চৌকি হইতে উঠিয়া, বিহারীর পিঠে চাপড় মারিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে একটা কেদারার উপরে টানিয়া বসাইয়া দিল।

কিন্তু বিহারীর মুখ আজ বিমর্শ। মহেন্দ্র ভাবিল, বেচারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে বিনোদনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারী, এর মধ্যে আমাদের ওখানে গিয়াছিলে?”

বিহারী গম্ভীরমুখে কহিল, “এখনি সেখান হইতে আসিতেছি।”

মহেন্দ্র বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কৌতুকবোধ করিল। মনে মনে কহিল, ‘হতভাগ্য বিহারী। ঢ্রালোকের ভালোবাসা হইতে বেচারা একেবারে বঞ্চিত।’ বলিয়া নিজের বুকের পকেটের কাছটায় এক বার হাত দিয়া চাপ দিল—ভিতর হইতে তিনটে চিঠি খড়খড় করিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “সবাইকে কেমন দেখিলে?”

বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল, “বাড়ি ছাড়িয়া তুমি যে এখানে?”

মহেন্দ্র কহিল, “আজকাল প্রায় নাইট- ডিউটি পড়ে— বাড়িতে অসুবিধা হয়।”

বিহারী কহিল, “এর আগেও তো নাইট- ডিউটি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমাকে তো বাড়ি ছাড়িতে দেখি নাই।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “মনে কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে না কি।”

বিহারী কহিল, ‘না, ঠাট্টা নয়, এখনি বাড়ি চলো।’

মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিল; বিহারীর অনুরোধ শুনিয়া সে হঠাত নিজেকে ভুলাইল, যেন বাড়ি যাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কহিল, “সে কি হয়, বিহারী। তা হলে আমার বৎসরটাই নষ্ট হইবে।”

বিহারী কহিল, ‘দেখো মহিনদা, তোমাকে আমি এতটুকু বয়স হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি অন্যায় করিতেছ।’

মহেন্দ্র। কার ’পরে অন্যায় করিতেছি জজসাহেব !

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, ‘তুমি যে চিরকাল হৃদয়ের বড়াই করিয়া আসিয়াছ, তোমার হৃদয় গেল কোথায় মহিনদা।’

মহেন্দ্র। সম্প্রতি কালেজের হাসপাতালে।

বিহারী। থামো মহিনদা, থামো। তুমি এখানে আমার সঙ্গে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া কথা কহিতেছ, সেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে, অন্দরের ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

আশার কান্নার কথা শুনিয়া হঠাৎ মহেন্দ্রের মন একটা প্রতিঘাত পাইল। জগতে আর যে কাহারো সুখদুঃখ আছে, সে কথা তাহার নূতন নেশার কাছে স্থান পায় নাই। হঠাৎ চমক লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল, “আশা কাঁদিতেছে কী জন্য।”

বিহারী বিরক্ত হইয়া কহিল, ‘সে কথা তুমি জান না, আমি জানি?’

মহেন্দ্র। তোমার মহিন্দা সর্বজ্ঞ নয় বলিয়া যদি রাগ করিতেই হয় তো মহিন্দার স্মষ্টিকর্তার উপর রাগ করো।

তখন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বলিল। বলিতে বলিতে বিনোদিনীর বক্ষেলগ্ন আশার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া বিহারীর প্রায় কঢ়িরোধ হইয়া আসিল।

বিহারীর এই প্রবল আবেগ দেখিয়া মহেন্দ্র আশ্র্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র জানিত বিহারীর হন্দয়ের বালাই নাই— এ উপসর্গ কবে জুটিল। যেদিন কুমারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল, সেই দিন হইতে নাকি। বেচারা বিহারী। মহেন্দ্র মনে মনে তাহাকে বেচারা বলিল বটে, কিন্তু দুঃখবোধ না করিয়া বরঞ্চ একটু আমোদ পাইল। আশার মনটি একান্তভাবে যে কোন্ দিকে, তাহা মহেন্দ্র নিশ্চয় জানিত। ‘অন্য লোকের কাছে যাহারা বাঞ্ছার ধন, কিন্তু আয়ত্তের অতীত, আমার কাছে তাহারা চিরদিনের জন্য আপনি ধরা দিয়াছে’, ইহাতে মহেন্দ্র বক্ষের মধ্যে একটা গর্বের স্ফীতি অনুভব করিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে কহিল, ‘আচ্ছা চলো, যাওয়া যাক। তবে একটা গাড়ি ডাকো।’

অধ্যায় - ২২

মহেন্দ্র ঘরে ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহার মুখ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশয় ক্ষণকালের কুয়াশার মতো এক মুহূর্তেই কাটিয়া গেল। নিজের চিঠির কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মহেন্দ্রের সামনে সে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। মহেন্দ্র তাহার উপরে ভর্ত্সনা করিয়া কহিল, “এমন অপবাদ দিয়া চিঠিগুলা লিখিলে কী করিয়া।”

বলিয়া পকেট হইতে বহুবার পাঠিত সেই চিঠি তিনখানি বাহির করিল। আশা ব্যাকুল হইয়া কহিল, “তোমার পায়ে পড়ি, ও চিঠিগুলো ছিঁড়িয়া ফেলো।” বলিয়া মহেন্দ্রের হাত হইতে চিঠিগুলা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র তাহাকে নিরস করিয়া সেগুলি পকেটে পুরিল। কহিল, ‘আমি কর্তব্যের অনুরোধে গেলাম, আর তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে না? আমাকে সন্দেহ করিলে?’

আশা ছল-ছল চোখে কহিল, “এবারকার মতো আমাকে মাপ করো। এমন আর কথনোই হইবে না।”

মহেন্দ্র কহিল, ‘কথনো না?’

আশা কহিল, ‘কথনো না।’

তখন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আশা কহিল, ‘চিঠিগুলা দাও, ছিঁড়িয়া ফেলি।’

মহেন্দ্র কহিল, “না, ও থাক!”

আশা সবিনয়ে মনে করিল, ‘আমার শাস্তিস্বরূপ এ চিঠিগুলি উনি রাখিলেন।’

এই চিঠির ব্যাপারে বিনোদিনীর উপর আশার মনটা একটু যেন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর আগমনবার্তা লইয়া সে সখীর কাছে আনন্দ করিতে গেল না— বরঞ্চ বিনোদিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল। বিনোদিনী সেটুকু লক্ষ করিল এবং কাজের ছল করিয়া একেবারে দূরে রাখিল।

মহেন্দ্র ভাবিল, ‘এ তো বড়ো অঙ্গুত। আমি ভাবিয়াছিলাম, এবার বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়াই দেখা যাইবে— উলটা হইল? তবে সে চিঠিগুলার অর্থ কী?’

নারীহৃদয়ের রহস্য বুঝিবার কোনো চেষ্টা করিবে না বলিয়াই মহেন্দ্র মনকে দৃঢ় করিয়াছিল— ভাবিয়াছিল, ‘বিনোদিনী যদি কাছে আসিবার চেষ্টা করে, তবু আমি দূরে থাকিব।’ আজ সে মনে মনে কহিল, ‘না, এ তো ঠিক হইতেছে না। যেন আমাদের মধ্যে সত্যই কী একটা বিকার ঘটিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা আমোদপ্রমোদ করিয়া এই সংশয়াচ্ছন্ন গুমটের ভাবটা দূর করিয়া দেওয়া উচিত।’

আশাকে মহেন্দ্র কহিল, ‘‘দেখিতেছি, আমিই তোমার সখীর চোখের বালি হইলাম। আজকাল তাহার আর দেখাই পাওয়া যায় না।’’

আশা উদাসীন ভাবে উত্তর করিল, ‘কে জানে, তাহার কী হইয়াছে।’

এ দিকে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কাঁদো- কাঁদো হইয়া কহিলেন, ‘‘বিপিনের বউকে আর তো ধরিয়া রাখা যায় না।’’

মহেন্দ্র চকিত ভাব সামলাইয়া কহিল, ‘‘কেন, মা।’’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘কি জানি বাছা, সে তো এবার বাড়ি যাইবার জন্য নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে। তুই তো কাহাকেও খাতির করিতে জানিস না। ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়িতে আছে, উহাকে আপনার লোকের মতো আদর- যত্ন না করিলে থাকিবে কেন।’’

বিনোদিনী শোবার ঘরে বসিয়া বিছানার চাদর সেলাই করিতেছিল। মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া ডাকিল, ‘‘বালি।’’

বিনোদিনী সংযত হইয়া বসিল। কহিল, ‘‘কী, মহেন্দ্রবাবু।’’

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘কী সর্বনাশ। মহেন্দ্র আবার বাবু হইলেন কবে।’’

বিনোদিনী আবার চাদর সেলাইয়ের দিকে নতচক্ষু নিবন্ধ রাখিয়া কহিল, ‘‘তবে কী বলিয়া ডাকিব।’’

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘তোমার সখীকে যা বল— চোখের বালি।’’

বিনোদিনী অন্যদিনের মতো ঠাট্টা করিয়া তাহার কোনো উত্তর দিল না—সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “ওটা বুঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না !”

বিনোদিনী একটু থামিয়া দাঁত দিয়া সেলাইয়ের প্রান্ত হইতে খানিকটা বাড়তি সুতা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, “কী জানি, সে আপনি জানেন।”

বলিয়াই তাহার সর্বপ্রকার উত্তর চাপা দিয়া গন্তীরমুখে কহিল, “কালেজ হইতে হঠাত ফেরা হইল যে?”

মহেন্দ্র কহিল, “কেবল মড়া কাটিয়া আর কত দিন চলিবে।”

আবার বিনোদিনী দস্ত দিয়া সুতা ছেদন করিল এবং মুখ না তুলিয়াই কহিল, “এখন বুঝি জিয়ন্তের আবশ্যক।”

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সঙ্গে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাস্যপরিহাস উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আসের জমাইয়া তুলিবে। কিন্তু এমনি গান্তীর্যের ভার তাহার উপর চাপিয়া আসিল যে, লঘু জবাব প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুখের কাছে জোগাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন একরকম কঠিন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা সবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল— ব্যবধানটাকে কোনো-একটা নাড়া দিয়া ভূমিসাং করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্যঘাতের প্রতিঘাত না দিয়া হঠাত তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, “তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে কেন। কোনো অপরাধ করিয়াছি?”

বিনোদিনী তখন একটু সরিয়া সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া দুই বিশাল উজ্জ্বল চক্ষ মহেন্দ্রের মুখের উপর স্থির রাখিয়া কহিল,

“কর্তব্যকর্ম তো সকলেরই আছে। আপনি যে সকল ছাড়িয়া কালেজের বাসায় যান, সে কি কাহারো অপরাধে। আমারও যাইতে হইবে না? আমারও কর্তব্য নাই?”

মহেন্দ্র ভালো উত্তর অনেক ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার এমন কী কর্তব্য যে না গেলেই নয়।”

বিনোদিনী অত্যন্ত সাবধানে সূচিতে সুতা পরাইতে পরাইতে কহিল, “কর্তব্য আছে কি না, সে নিজের মনই জানে। আপনার কাছে তাহার আর কী তালিকা দিব।”

মহেন্দ্র গন্তীর চিন্তিত মুখে জানালার বাহিরে একটা সুদূর নারিকেলগাছের মাথার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনী নিঃশব্দে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায়, এমনি হইল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র হঠাত কথা কহিল। অকসমাং নিঃশব্দতাভঙ্গে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল— তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, “তোমাকে কোনো অনুনয়- বিনয়েই রাখা যাইবে না?”

বিনোদিনী তাহার আহত অঙ্গুলি হইতে রক্তবিন্দু শুষিয়া লইয়া কহিল, “কিসের জন্য এত অনুনয়- বিনয়। আমি থাকিলেই কী, আর না থাকিলেই কী। আপনার তাহাতে কী আসে যায়।”

বলিতে বলিতে গলাটা যেন ভারি হইয়া আসিল; বিনোদিনী অত্যন্ত মাথা নিচু করিয়া সেলাইয়ের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিল— মনে হইল, হয়তো বা তাহার নতনেত্রের পল্লবপ্রাণ্তে একটুখানি জলের রেখা দেখা দিয়াছে। মাঘের অপরাহ্ন তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।

মহেন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রূপ সজলস্বরে কহিল, “যদি তাহাতে আমার আসে যায়, তবে তুমি থাকিবে?”

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিল। মহেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। নিজের শেষ কথাটা ভীষণ ব্যঙ্গের মতো তাহার নিজের কানে বারংবার প্রতিষ্ঠানিত হইতে লাগিল। অপরাধী জিহ্বাকে মহেন্দ্র দন্ত দ্বারা দংশন করিল— তাহার পর হইতে রসনা নির্বাক হইয়া রহিল।

এমন সময় এই নৈশব্দ্যপরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল। বিনোদিনী তৎক্ষণাত যেন পূর্ব-কথোপকথনের অনুবৃত্তিস্বরূপে হাসিয়া মহেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল, “আমার গুমর তোমরা যখন এত বাড়াইলে, তখন আমারও কর্তব্য, তোমাদের একটা কথা রাখা। যতক্ষণ না বিদায় দিবে ততক্ষণ রহিলাম।”

আশা স্বামীর কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। কহিল, “তবে এই কথা রহিল। তাহা হইলে তিন- সত্য করো, যতক্ষণ না বিদায় দিব ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।”

বিনোদিনী তিন বার স্বীকার করিল। আশা কহিল, “ভাই চোখের বালি, সেই যদি রহিলেই তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন। শেষকালে আমার স্বামীর কাছে তো হার মানিতে হইল।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি?”

মহেন্দ্র এতক্ষণ স্তন্ত্রিত হইয়া ছিল; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সমস্ত ঘর ভরিয়াছে, লাঞ্ছনা যেন তাহার সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া। আশার সঙ্গে কেমন করিয়া সে প্রসন্নমুখে স্বাভাবিকভাবে কথা কহিবে। এক মুহূর্তের মধ্যে কেমন করিয়া সে আপনার বীভৎস অসংযমকে সহাস্য চটুলতায় পরিণত করিবে। এই পৈশাচিক ইন্দ্রজাল তাহার আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল। সে গন্তীরমুখে কহিল, “আমারই তো হার হইয়াছে।” বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরেই আবার মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে কহিল, “আমাকে মাপ করো।”

বিনোদিনী কহিল, “অপরাধ কী করিয়াছ, ঠাকুরপো।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “জোর কই করিলে, তাহা তো দেখিলাম না। ভালোবাসিয়া ভালো মুখেই তো থাকিতে বলিলে। তাহাকে কি জোর বলে। বলো তো ভাই, চোখের বালি, গায়ের জোর আর ভালোবাসা কি একই হইল।”

আশা তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কহিল, “কখনোই না।”

বিনোদিনী কহিল, ‘ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কষ্ট হইবে, সে তো আমার সৌভাগ্য। কী বল ভাই চোখের বালি, সংসারে এমন সুহৃদ কয় জন পাওয়া যায়। তেমন ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী, অদ্বিতীয়ে যদিহি পাওয়া যায়, তবে আমিহি বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইব কেন।’

আশা তাহার স্বামীকে অপদস্থভাবে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া ঈষৎ ব্যথিতচিত্তে কহিল, ‘তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে ভাই। আমার স্বামী তো হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থামো।’

মহেন্দ্র আবার দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইল। তখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া বিহারী মহেন্দ্রের সঙ্গানে আসিতেছিল। মহেন্দ্র তাহাকে দ্বারের সমুখে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল, ‘ভাই বিহারী, আমার মতো পাষণ্ড আর জগতে নাই।’ এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল।

ঘরের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আসিল, ‘বিহারী- ঠাকুরপো।’

বিহারী কহিল, ‘একটু বাদে আসছি, বিনোদ- বৌঢ়ান।’

বিনোদিনী কহিল, ‘একবার শুনেই যাও- না।’

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মুহূর্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল— ঘোমটার মধ্য হইতে আশার মুখ যতটুকু দেখিতে পাইল, সেখানে বিশাদ বা বেদনার কোনো চিহ্নই তো দেখা গেল না। আশা উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, বিনোদিনী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল— কহিল, ‘আচ্ছা, বিহারী- ঠাকুরপো, আমার চোখের বালির সঙ্গে কি তোমার সত্ত্ব- সম্পর্ক। তোমাকে দেখলেই ও পালাতে চায় কেন।’

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বিনোদিনীকে তাড়না করিল।

বিহারী হাসিয়া উত্তর করিল, ‘বিধাতা আমাকে তেমন সুদৃশ্য করিয়া গড়েন নাই বলিয়া।’

বিনোদিনী। দেখছিস ভাই বালি, বিহারী- ঠাকুরপো বাঁচাইয়া কথা বলিতে জানেন— তোর রঞ্চিকে দোষ না দিয়া বিধাতাকেই দোষ দিলেন। লক্ষণটির মতো এমন সুলক্ষণ দেবর পাইয়াও তাহাকে আদর করিতে শিখিলি না— তোরই কপাল মন্দ।

বিহারী। তোমার যদি তাহাতে দয়া হয় বিনোদ- বৌঢ়ান, তবে আর আমার আক্ষেপ কিসের।

বিনোদিনী। সমুদ্র তো পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধারা নইলে চাতকের তৃষ্ণা মেটে না কেন।

আশাকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে জোর করিয়া বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। বিহারীও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। বিনোদিনী কহিল, ‘ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কী হইয়াছে, বলিতে পার?’

শুনিয়াই বিহারী থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, ‘তাহা তো জানি না। কিছু হইয়াছে নাকি।’

বিনোদিনী। কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না।

বিহারী উদ্বিগ্ন মুখে চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। কথাটা খোলসা শুনিবে বলিয়া বিনোদিনীর মুখের
দিকে
ব্যগ্রভাবে
চাহিয়া
অপেক্ষা করিয়া রহিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া মনোযোগ দিয়া চাদর সেলাই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিহারী কহিল, ‘মহিন্দার সম্বন্ধে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়াছ।’

বিনোদিনী অত্যন্ত সাধারণভাবে কহিল, ‘কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না। আমার চোখের বালির জন্যে আমার কেবলই ভাবনা হয়।’ বলিয়া দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া সেলাই রাখিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, ‘বৌঠান, একটু বোসো।’ বলিয়া একটা চৌকিতে বসিল।

বিনোদিনী ঘরের সমস্ত জানালা- দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া কেরোসিনের বাতি উস্কাইয়া সেলাই টানিয়া লইয়া বিছানার দূরপ্রান্তে গিয়া বসিল। কহিল, ‘ঠাকুরপো, আমি তো চিরদিন এখানে থাকিব না— কিন্তু আমি চলিয়া গেলে আমার চোখের বালির উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়ো— সে যেন অসুখী না হয়।’ বলিয়া যেন হৃদযোচ্ছাস সংবরণ করিয়া লইবার জন্য বিনোদিনী অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

বিহারী বলিয়া উঠিল, ‘বৌঠান, তোমাকে থাকিতেই হইবে। তোমার নিজের বলিতে কেহ নাই— এই সরলা মেয়েটিকে সুখে দুঃখে রক্ষা করিবার ভার তুমি লও— তুমি তাহাকে ফেলিয়া গেলে আমি তো আর উপায় দেখি না।’

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, তুমি তো সংসারের গতিক জান। এখানে বরাবর থাকিব কেমন করিয়া। লোকে কী বলিবে।

বিহারী। লোকে যা বলে বলুক, তুমি কান দিয়ো না। তুমি দেবী— অসহায়া বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে রক্ষা করা তোমারই উপযুক্ত কাজ। বৌঠান, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমিও সংকীর্ণ- হৃদয় সাধারণ ইতরলোকদের মতো মনে মনে তোমার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম, একবার এমনও মনে হইয়াছিল, যেন আশার সুখে তুমি ঈর্ষা করিতেছ— যেন— কিন্তু সে- সব কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পাপ আছে। তার পরে, তোমার দেবীহৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি— তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর সর্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তবু বিহারীর এই ভক্তিউপহার সে মনে মনেও মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন জিনিস সে কখনো কাহারো কাছ হইতে পায় নাই। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, সে যেন যথার্থই পবিত্র উন্নত— আশার প্রতি একটা অনিদেশ্য দয়ায় তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং সেই অশ্রুধারা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিজেকে পূজনীয়া বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল।

বিহারী বিনোদিনীকে অশ্রু ফেলিতে দেখিয়া নিজের অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র যে হঠাত নিজেকে পাষণ্ড বলিয়া কেন ঘোষণা করিল, বিহারী তাহার কোনো তৎপর্য খুঁজিয়া পাইল না। ঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র নাই। খবর পাইল, মহেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বে মহেন্দ্র অকারণে কখনোই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইত না। সুপরিচিত লোকের এবং সুপরিচিত ঘরের বাহিরে মহেন্দ্রের অত্যন্ত ক্লান্তি ও পীড়া বোধ হইত। বিহারী ভাবিতে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেল।

বিনোদিনী আশাকে নিজের শয়নঘরে আনিয়া বুকের কাছে টানিয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া কহিল, ‘ভাই চোখের বালি, আমি বড়ো হতভাগিনী, আমি বড়ো অলক্ষণা।’

আশা ব্যথিত হইয়া তাহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া মেহাদ্রকঞ্চি বলিল, ‘কেন ভাই, অমন কথা কেন বলিতেছ।’

বিনোদিনী রোদনোচ্ছসিত শিশুর মতো আশার বক্ষে মুখ রাখিয়া কহিল, ‘আমি যেখানে থাকিব, সেখানে কেবল মন্দই হইবে। দে ভাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাই।’

আশা চিবুকে হাত দিয়া বিনোদিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, ‘লক্ষ্মীটি ভাই, অমন কথা বলিস নে— তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না— আমাকে ছাড়িয়া যাইবার কথা কেন আজ তোর মনে আসিল।’

মহেন্দ্রের দেখা না পাইয়া বিহারী কোনো একটা ছুতায় পুনর্বার বিনোদিনীর ঘরে আসিয়া মহেন্দ্র ও আশার মধ্যবর্তী আশঙ্কার কথাটা আর- একটু স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে পরদিন সকালে তাহাদের বাড়ি খাইতে যাইতে বলিবার জন্য বিনোদিনীকে অনুরোধ করিবার উপলক্ষ লইয়া সে উপস্থিত হইল। ‘বিনোদ- বৌঠান’ বলিয়া ডাকিয়াই হঠাত কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোকে বাহির হইতেই আলিঙ্গনবন্দ সাশ্রমনেত্র দুই স্থীরকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। আশার হঠাত মনে হইল, নিশ্চয়ই বিহারী তাহার চোখের বালিকে কোনো অন্যায় নিন্দা করিয়া কিছু বলিয়াছে, তাই সে আজ এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা তুলিয়াছে। বিহারীবাবুর ভারি অন্যায়। উহার মন ভালো নয়। আশা বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। বিহারীও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা চড়াইয়া বিগলিতহৃদয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেদিন রাত্রে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, ‘চুনি, আমি কাল সকালের প্যাসেজ্যারেই কাশী চলিয়া যাইব।’

আশার বক্ষঃস্থল ধূক করিয়া উঠিল— কহিল, ‘কেন।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘কাকীমাকে অনেক দিন দেখি নাই।’

শুনিয়া আশা বড়োই লজ্জাবোধ করিল; এ কথা পূর্বেই তাহার মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল; নিজের সুখদুঃখের আকর্ষণে স্নেহময়ী মাসিমাকে সে যে ভুলিয়াছিল, অথচ মহেন্দ্র সেই প্রবাসী- তপস্বিনীকে মনে করিয়াছে, ইহাতে নিজেকে কঠিনহৃদয়া বলিয়া বড়োই ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল, ‘তিনি আমারই হাতে তাঁহার সংসারের একমাত্র মেহের ধনকে সমর্পণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন— তাঁহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না।’

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের কষ্ট বাস্পরঞ্জ হইয়া আসিল; মেহপূর্ণ নীরব আশীর্বাদ ও অব্যক্ত মঙ্গলকামনার সহিত বারংবার সে আশার ললাট ও মন্তকের উপর দক্ষিণ করতল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই অকস্মাত মেহাবেগের সম্পূর্ণ মর্ম বুঝিতে পারিল না, কেবল তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া অশ্র পড়িতে লাগিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকারণ মেহাতিশয়ে যে- সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোনো যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। কিন্তু মনে হইল, যেন ইহা তাহার জীবনে কিসের একটা সূচনা। ভালো কি মন্দ কে জানে।

তয়ব্যাকুলচিত্তে সে মহেন্দ্রকে বাহ্যিক বদ্ধ করিল। মহেন্দ্র তাহার সেই অকারণ আশঙ্কার আবেশ অনুভব করিতে পারিল। কহিল, “চুনি, তোমার উপর তোমার পুণ্যবতী মাসিমার আশীর্বাদ আছে, তোমার কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। তিনি তোমারই মঙ্গলের জন্য তাহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া গেছেন, তোমার কখনো কোনো অকল্যাণ হইতে পারে না।”

আশা তখন দৃঢ়চিত্তে সমস্ত ভয় দূর করিয়া ফেলিল। স্বামীর এই আশীর্বাদ অক্ষয়করচের মতো গ্রহণ করিল। সে মনে মনে বারংবার তাহার মাসিমার পবিত্র পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল, এবং একাগ্রমনে কহিল, ‘মা, তোমার আশীর্বাদ আমার স্বামীকে সর্বদা রক্ষা করুক।’

পরদিনে মহেন্দ্র চলিয়া গেল, বিনোদিনীকে কিছুই বলিয়া গেল না। বিনোদিনী মনে মনে কহিল, ‘নিজে অন্যায় করা হইল, আবার আমার উপরে রাগ ! এমন সাধু তো দেখি নাই। কিন্তু এমন সাধুত্ব বেশিদিন টেঁকে না।’

অধ্যায় - ২৩

সংসারত্যাগিনী অন্নপূর্ণা বহুদিন পরে হঠাত মহেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া যেমন মেহে আনন্দে আপ্সুত হইয়া গেলেন, তেমনি তাঁহার হঠাত ভয় হইল, বুঝি আশাকে লইয়া মার সঙ্গে মহেন্দ্রের আবার কোনো বিরোধ ঘটিয়াছে এবং মহেন্দ্র তাঁহার কাছে নালিশ জানাইয়া সান্ত্বনালাভ করিতে আসিয়াছে। মহেন্দ্র শিশুকাল হইতেই সকলপ্রকার সংকট ও সন্তাপের সময় তাহার কাকীর কাছে ছুটিয়া আসে। কাহারো উপর রাগ করিলে অন্নপূর্ণা তাহার রাগ থামাইয়া দিয়াছেন, দুঃখবোধ করিলে তাহা সহজে সহ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতে মহেন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা যে সংকটের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকারচেষ্টা দূরে থাক, কোনোপ্রকার সান্ত্বনা পর্যন্ত তিনি দিতে অক্ষম। সে সম্বন্ধে যেভাবে যেমন করিয়াই তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই মহেন্দ্রের সাংসারিক বিপ্লব আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবে ইহাই যখন নিশ্চয় বুঝিলেন, তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। রংগৃণ শিশু যখন জল চাহিয়া কাঁদে, এবং জল দেওয়া যখন কবিরাজের নিতান্ত নিষেধ, তখন পীড়িতচিত্তে মা যেমন অন্য ঘরে চলিয়া যান, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া নিজেকে প্রবাসে লইয়া গেছেন। দূর তীর্থবাসে থাকিয়া ধর্মকর্মের নিয়মিত অনুষ্ঠানে এ কয়দিন সংসার অনেকটা ভুলিয়াছিলেন, মহেন্দ্র আবার কি সেই- সকল বিরোধের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রচলন ক্ষতে আঘাত করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে লইয়া তাহার মার সম্বন্ধে কোনো নালিশের কথা তুলিল না। তখন অন্নপূর্ণার আশঙ্কা অন্য পথে গেল। যে মহেন্দ্র আশাকে ছাড়িয়া কালেজে যাইতে পারিত না, সে আজ কাকীর খোঁজ লইতে কাশী আসে কেন। তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্র টান ক্রমে টিলা হইয়া আসিতেছে। মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “হঁ রে মহিন, আমার মাথা খা, ঠিক করিয়া বল দেখি, চুনি কেমন আছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে তো বেশ ভালো আছে কাকীমা।”

“আজকাল সে কী করে, মহিন। তোরা কি এখনো তেমনি ছেলেমানুষ আছিস, না কাজকর্মে ঘরকন্ধায় মন দিয়াছিস?”

মহেন্দ্র কহিল, “ছেলেমানুষি একেবারেই বন্ধ। সকল ঝঁঝঁটের মূল সেই চারুপাঠখানা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাইবার জো নাই। তুমি থাকিলে দেখিয়া খুশি হইতে— লেখাপড়া শেখায় অবহেলা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যতদূর কর্তব্য, চুনি তাহা একান্ত মনে পালন করিতেছে।”

“মহিন, বিহারী কী করিতেছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “নিজের কাজ ছাড়া আর- সমস্তই করিতেছে। নায়েব- গোমস্তায় তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখে; কী চক্ষে দেখে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বিহারীর চিরকাল ঐ দশা। তাহার নিজের কাজ পরে দেখে, পরের কাজ সে নিজে দেখে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি বিবাহ করিবে না, মহিন।”

মহেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিল, “কই, কিছুমাত্র উদ্যোগ তো দেখি না।”

শুনিয়া অন্নপূর্ণা হৃদয়ের গোপন স্থানে একটা আঘাত পাইলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বোনবিকে দেখিয়া, একবার বিহারী আগ্রহের সহিত বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার সেই উন্মুখ আগ্রহ অন্যায় করিয়া অকস্মাত দলিত হইয়াছে। বিহারী বলিয়াছিল, ‘কাকীমা, আমাকে আর বিবাহ করিতে কখনো অনুরোধ করিয়ো না।’ সেই বড়ো অভিমানের কথা অন্নপূর্ণার কানে বাজিতেছিল। তাহার একান্ত অনুগত সেই স্নেহের বিহারীকে তিনি এমন মনভাঙ্গ অবঙ্গায় ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত বির্মৰ্ষ ও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘এখনো কি আশার প্রতি বিহারীর মন পড়িয়া আছে।’

মহেন্দ্র কখনো ঠাট্টার ছলে, কখনো গন্তীরভাবে, তাহাদের ঘরকন্নার আধুনিক সমস্ত খবর- বার্তা জানাইল, বিনোদিনীর কথার উল্লেখমাত্র করিল না।

এখন কালেজ খোলা, কাশীতে মহেন্দ্রের বেশি দিন থাকিবার কথা নয়। কিন্তু কঠিন রোগের পর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া আরোগ্যলাভের যে সুখ, মহেন্দ্র কাশীতে অন্নপূর্ণার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন সেই সুখ অনুভব করিতেছিল- তাই একে একে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা বিরোধ জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেটা দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া গেল। কয়দিন সর্বদা ধর্মপরায়ণ অন্নপূর্ণার মেহমুখচ্ছবির সমুখে থাকিয়া, সংসারের কর্তব্যপালন এমনি সহজ ও সুখকর মনে হইতে লাগিল যে, তাহার পূর্বেকার আতঙ্ক হাস্যকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না। এমন- কি, তাহার মুখের চেহারাই মহেন্দ্র স্পষ্ট করিয়া মনে আনিতে পারে না। অবশ্যে মহেন্দ্র খুব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, ‘আশাকে আমার হৃদয় হইতে এক চুল সরাইয়া বসিতে পারে, এমন তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।’

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কহিল, ‘কাকীমা, আমার কালেজ কামাই যাইতেছে- এবারকার মতো তবে আসি। যদিও তুমি সংসারের মায়া কাটাইয়া একান্তে আসিয়া আছ- তবু অনুমতি করো মাঝে মাঝে আসিয়া তোমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইব।’

মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন আশাকে তাহার মাসির মেহেপহার সিঁড়ুরের কৌটা ও একটি সাদা পাথরের চুমকি ঘটি দিল, তখন তাহার চোখ দিয়া বরঘার করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাসিমার সেই পরমমেহময় ধৈর্য ও মাসিমার প্রতি তাহাদের ও তাহার শাশুড়ির নানাপ্রকার উপদ্রব স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, “আমার বড়ো ইচ্ছা করে, আমি একবার মাসিমার কাছে গিয়া তাহার ক্ষমা ও পায়ের ধুলা লইয়া আসি। সে কি কোনোমতেই ঘটিতে পারে না।”

মহেন্দ্র আশার বেদনা বুঝিল, এবং কিছুদিনের জন্য কাশীতে সে তাহার মাসিমার কাছে যায়, ইহাতে তাহার সম্মতিও হইল। কিন্তু পুনর্বার কালেজ কামাই করিয়া আশাকে কাশী পৌঁছাইয়া দিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল।

আশা কহিল, ‘জেঠাইমা তো অল্পদিনের মধ্যেই কাশী যাইবেন, সেই সঙ্গে গেলে কি ক্ষতি আছে।’

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে গিয়া কহিল, ‘মা, বউ একবার কাশীতে কাকীমাকে দেখিতে যাইতে চায়।’

রাজলক্ষ্মী শ্লেষবাক্যে কহিলেন, ‘বউ যাইতে চান তো অবশ্যই যাইবেন, যাও, তাহাকে লইয়া যাও।’

মহেন্দ্র যে আবার অন্নপূর্ণার কাছে যাতায়াত আরস্ত করিল, ইহা রাজলক্ষ্মীর ভালো লাগে নাই। বধূর যাইবার প্রস্তাবে তিনি মনে মনে আরো বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র কহিল, “আমার কালেজ আছে, আমি রাখিতে যাইতে পারিব না। তাহার জেঠামশায়ের সঙ্গে যাইবে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “সে তো ভালো কথা। জেঠামশায়রা বড়োলোক, কখনো আমাদের মতো গরিবের ছায়া মাড়ান না, তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলে কত গৌরব !”

মাতার উত্তরোত্তর শেষবাক্যে মহেন্দ্রের মন একেবারে কঠিন হইয়া বাঁকিল। সে কোনো উত্তর না দিয়া আশাকে কাশী পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী যখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ও বিহারী, শুনিয়াছিস, আমাদের বউমা যে কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।”

বিহারী কহিল, ‘বল কী মা, মহিনদা আবার কালেজ কামাই করিয়া কাশী যাইবে?’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “না না, মহিন কেন যাইবেন। তা হইলে আর বিবিয়ানা হইল কই। মহিন এখানে থাকিবেন, বউ তাঁহার জেঠামহারাজের সঙ্গে কাশী যাইবেন। সবাই সাহেব- বিবি হইয়া উঠিল।”

বিহারী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইল, বর্তমান কালের সাহেবিয়ানা স্মরণ করিয়া নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, ‘ব্যাপারখানা কী। মহেন্দ্র যখন কাশী গেল আশা এখানে রহিল; আবার মহেন্দ্র যখন ফিরিল তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে। দুজনের মাঝখানে একটা কী গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন চলিবে? বন্ধু হইয়াও আমরা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারিবে না— দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব?’

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া মহেন্দ্র তাহার শয়নঘরে আসিয়া বসিয়া ছিল। বিনোদনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই— তাই আশা তাহাকে পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আসিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আশা- বৌঠানের কি কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘না হইবে কেন। বাধাটা কী আছে।’

বিহারী কহিল, ‘বাধার কথা কে বলিতেছে। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল তোমাদের মাথায় আসিল যে?’

মহেন্দ্র কহিল, ‘মাসিকে দেখিবার ইচ্ছা— প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রে এমন মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে।’

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুমি সঙ্গে যাইতেছ?’

প্রশ্ন শুনিয়াই মহেন্দ্র ভাবিল, ‘জেঠার সঙ্গে আশাকে পাঠানো সংগত নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আসিয়াছে’ পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে ক্রোধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাই সংক্ষেপে বলিল, ‘না।’

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। সে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর আগোচর ছিল না। একবার জিদ ধরিলে তাহাকে টলানো যায় না, তাহাও সে জানিত। তাই মহেন্দ্রের যাওয়ার কথা আর তুলিল না। মনে মনে ভাবিল, ‘বেচোরা আশা যদি কোনো বেদনা বহন করিয়াই চলিয়া যাইতেছে হয়, তবে সঙ্গে বিনোদিনী গেলে তাহার সান্ত্বনা হইবে।’ তাই ধীরে ধীরে কহিল, “বিনোদ- বৌঠান তাঁর সঙ্গে গেলে হয় না?”

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, “বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে- কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলো। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহু দূরে লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।”

অত্যন্ত বেদনার স্থানে দুই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে— রংধনকষ্ঠ বিহারী তেমনি পাংশমুখে তাহার চৌকি হইতে উঠিয়া মহেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল— হঠাৎ থামিয়া বহুকষ্টে স্বর বাহির করিয়া কহিল, “ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, আমি বিদায় হই।” বলিয়া উলিতে উলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল !

পাশের ঘর হইতে বিনোদিনী ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, “বিহারী- ঠাকুরপো !”

বিহারী দেয়ালে ভর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কী, বিনোদ- বৌঠান !”

বিনোদিনী কহিল, “ঠাকুরপো, চোখের বালির সঙ্গে আমি কাশীতে যাইব।”

বিহারী কহিল, ‘না না, বৌঠান, সে হইবে না, সে কিছুতেই হইবে না। তোমাকে মিনতি করিতেছি— আমার কথায় কিছুই করিয়ো না। আমি এখানকার কেহ নই, আমি এখানকার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না, তাহাতে ভালো হইবে না। তুমি দেবী, তুমি যাহা ভালো বোধ কর, তাহাই করিয়ো। আমি চলিলাম।’

বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে বিন্যস নমস্কার করিয়া চলিল। বিনোদিনী কহিল, ‘আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারো ভালো হইবে না। ইহার পরে আমাকে দোষ দিয়ো না।’

বিহারী চলিয়া গেল। মহেন্দ্র স্তুতি হইয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী তাহার প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের মতো একটা কঠোর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সে- ঘরে আশা একান্ত লজ্জায় সংকোচে মরিয়া যাইতেছিল। বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, এ কথা মহেন্দ্রের মুখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না। আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে ! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসে না বটে ! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননির পুতুলটিকে।

মহেন্দ্র সেই যে আবেগের মুখে বিহারীকে বলিয়াছিল, ‘আমি পাষণ্ড’— তাহার পর আবেগ শান্তির পর হইতে সেই হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য সে বিহারীর কাছে কৃষ্ণিত হইয়া ছিল। সে মনে করিতেছিল, তাহার সব কথাই যেন ব্যক্ত হইয়া গেছে। সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না, অথচ বিহারী জানিয়াছে যে সে ভালোবাসে— ইহাতে বিহারীর উপরে তাহার বড়ো একটা বিরক্তি জন্মিতেছিল। বিশেষত, তাহার পর হইতে যতবার বিহারী তাহার সমুখে আসিতেছিল তাহার মনে হইতেছিল, যেন বিহারী সকৌতূহলে তাহার একটা ভিতরকার কথা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সেই- সমস্ত বিরক্তি উত্তরোত্তর জমিতেছিল— আজ একটু আঘাতেই বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিনোদিনী পাশের ঘর হইতে যেরূপ ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিল, যেরূপ আর্টকঞ্চে বিহারীকে রাখিতে চেষ্টা করিল এবং বিহারীর আদেশ পালন স্বরূপে আশার সহিত কাশী যাইতে প্রস্তুত হইল, ইহা মহেন্দ্রের পক্ষে অভিবিতপূর্ব। এই দৃশ্যটি মহেন্দ্রকে প্রবল আঘাতে অভিভূত করিয়া দিল। সে বলিয়াছিল, সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না; কিন্তু যাহা শুনিল, যাহা দেখিল, তাহা তাহাকে সুস্থির হইতে দিল না, তাহাকে চারি দিক হইতে বিচির আকারে পীড়ন করিতে লাগিল। আর কেবলই নিষ্ফল পরিতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল, ‘বিনোদিনী শুনিয়াছে— আমি বলিয়াছি আমি তাহাকে ভালোবাসি না’।

অধ্যায় - ২৪

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, ‘আমি বলিয়াছি মিথ্যা কথা, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি না। অত্যন্ত কঠিন করিয়া বলিয়াছি। আমি যে তাহাকে ভালোবাসি তাহা না- ই হইল, কিন্তু ভালোবাসি না, এ কথাটা বড়ে কঠোর। এ কথায় আঘাত না পায় এমন স্ত্রীলোক কে আছে। ইহার প্রতিবাদ করিবার অবসর কবে কোথায় পাইব। ভালোবাসি এ কথা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ভালোবাসি না, এই কথাটাকে একটু ফিকা করিয়া, নরম করিয়া জানানো দরকার। বিনোদিনীর মনে এমন- একটা নিষ্ঠুর অথচ ভুল সংক্ষার থাকিতে দেওয়া অন্যায়।’

এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার বাক্সর মধ্য হইতে আর- একবার তাহার চিঠি তিনখানি পড়িল। মনে মনে কহিল, ‘বিনোদিনী আমাকে যে ভালোবাসে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাল সে বিহারীর কাছে অমন করিয়া আসিয়া পড়িল কেন। সে কেবল আমাকে দেখাইয়া। আমি যখন তাহাকে ভালোবাসি না স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, তখন সে কোনো সুযোগে আমার কাছে তাহার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান না করিয়া কী করিবে। এমনি করিয়া আমার কাছে অবমানিত হইয়া হয়তো সে বিহারীকে ভালোবাসিতেও পারে।’

মহেন্দ্রের ক্ষেত্রে এতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, নিজের চাঞ্চল্যে সে নিজে আশ্চর্য এবং ভীত হইয়া উঠিল। নাহয় বিনোদিনী শুনিয়াছে, মহেন্দ্র তাহাকে ভালোবাসে না- তাহাতে দোষ কী। নাহয় এই কথায় অভিমানিনী বিনোদিনী তাহার উপর হইতে মন সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে- তাহাতেই বা ক্ষতি কী। বড়ের সময় নৌকার শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে যেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।

রাত্রে মহেন্দ্র আশার মুখ বক্ষের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘চুনি, তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাস ঠিক করিয়া বলো।’

আশা ভাবিল, “এ কেমন প্রশ্ন। বিহারীকে লইয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক যে- কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে।” সে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, ‘ছি ছি, আজ তুমি এমন প্রশ্ন কেন করিলে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বলো- আমার ভালোবাসায় তুমি কবে কোথায় কী অভাব দেখিয়াছ।’

মহেন্দ্র আশাকে পীড়ন করিয়া তাহার মাধুর্য বাহির করিবার জন্য কহিল, “তবে তুমি কাশী যাইতে চাহিতেছ কেন।”

আশা কহিল, ‘আমি কাশী যাইতে চাই না, আমি কোথাও যাইব না।’

মহেন্দ্র। তখন তো চাহিয়াছিলে।

আশা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কহিল, ‘তুমি তো জান, কেন চাহিয়াছিলাম।’

মহেন্দ্র। আমাকে ছাড়িয়া তোমার মাসির কাছে বোধ হয় বেশ সুখে থাকিতে।

আশা কহিল, ‘কখনো না। আমি সুখের জন্য যাইতে চাহি নাই।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আমি সত্য বলিতেছি ছুনি, তুমি আর- কাহাকেও বিবাহ করিলে তের বেশি সুখী হইতে পারিতে।’

শুনিয়া আশা চকিতের মধ্যে মহেন্দ্রের বক্ষ হইতে সরিয়া গিয়া, বালিশে মুখ ঢাকিয়া, কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া রহিল— মুহূর্তপরেই তাহার কানা আর চাপা রহিল না। মহেন্দ্র তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বক্ষে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, আশা বালিশ ছাড়িল না। পতিরুতার এই অভিমানে মহেন্দ্র সুখে গর্বে ধিক্কারে ক্ষুঁক হইতে লাগিল।

যে- সব কথা ভিতরে- ভিতরে আভাসে ছিল, সেইগুলা হঠাৎ স্পষ্ট কথায় পরিষ্কৃট হইয়া সকলেরই মনে একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল— অমন স্পষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে বিহারী কেন কোনো প্রতিবাদ করিল না। যদি সে মিথ্যা প্রতিবাদও করিত, তাহা হইলেও যেন বিনোদিনী একটু খুশি হইত। বেশ হইয়াছে, মহেন্দ্র বিহারীকে যে- আঘাত করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাপ্যই ছিল। বিহারীর মতো অমন মহৎ লোক কেন আশাকে ভালোবাসিবে। এই আঘাতে বিহারীকে যে দূরে লইয়া গেছে, সে যেন ভালোই হইয়াছে— বিনোদিনী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু বিহারীর সেই মৃত্যুবাগাহত রক্তহীন পাংশু মুখ বিনোদিনীকে সকল কর্মের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। বিনোদিনীর অন্তরে যে সেবাপরায়ণা নারীপ্রকৃতি ছিল, সে সেই আর্ত মুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রংগুল শিশুকে যেমন মাতা বুকের কাছে দোলাইয়া বেড়ায়, তেমনি সেই আতুর মূর্তিকে বিনোদিনী আপন হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল; তাহাকে সুস্থ করিয়া সেই মুখে আবার রক্তের রেখা, প্রাণের প্রবাহ, হাস্যের বিকাশ দেখিবার জন্য বিনোদিনীর একটা অধীর ওৎসুক্য জন্মিল।

দুই- তিন দিন সকল কর্মের মধ্যে এইরূপ উল্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী একখানি সান্ত্বনার পত্র লিখিল, কহিল—

‘ঠাকুরপো, আমি তোমার সেদিনকার সেই শুক্ষ মুখ দেখিয়া অবধি প্রাণমনে কামনা করিতেছি, তুমি সুস্থ হও, তুমি যেমন ছিলে তেমনিটি হও— সেই সহজ হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার কবে শুনিব। তুমি কেমন আছ, আমাকে একটি ছত্র লিখিয়া জানাও।
তোমার বিনোদ- বৌঠান।’

বিনোদিনী দরোয়ানের হাত দিয়া বিহারীর ঠিকানায় চিঠি পাঠাইয়া দিল।

আশাকে বিহারী ভালোবাসে, এ কথা যে এমন কৃত করিয়া, এমন গার্হিতভাবে মহেন্দ্র মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কারণ, সে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনো মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা বজ্জাহত হইল— তার পরে ক্রোধে ঘৃণায় ছটফট করিয়া বলিতে লাগিল, ‘অন্যায়, অসংগত, অমূলক।’

কিন্তু কথাটা যখন একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা দেখিবার উপলক্ষে সেই যে একদিন সূর্যাস্তকালে বাগানের উচ্চুসিত পুষ্পগন্ধপ্রবাহে লজ্জিতা বালিকার সুকুমার

মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অনুরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল, এবং বুকের কাছে কী যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কঠের কাছ পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘরাত্রি ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া, বাড়ির সমুখের পথে দ্রুতপদে পায়চারি করিতে করিতে, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। যাহা সংযত ছিল তাহা উদ্বাম হইল; নিজের কাছেও যাহার কোনো প্রমাণ ছিল না, মহেন্দ্রের বাক্যে তাহা বিরাট প্রাণ পাইয়া বিহারীর অন্তর- বাহির ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

তখন সে নিজেকে অপরাধী বলিয়া বুঝিল। মনে মনে কহিল, ‘আমার তো আর রাগ করা শোভা পায় না, মহেন্দ্রের কাছে তো ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতে হইবে। সেদিন এমনভাবে চলিয়া আসিয়াছিলাম, যেন মহেন্দ্র দোষী, আমি বিচারক— সে অন্যায় স্বীকার করিয়া আসিব।’

বিহারী জানিত, আশা কাশী চলিয়া গেছে। একদিন সে সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের দ্বারের সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মীর দূরসম্পর্কের মামা সাধুচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সাধ্বী, কদিন আসিতে পারি নাই— এখানকার সব খবর ভালো?” সাধুচরণ সকলের কুশল জানাইল। বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “বৌঠান কাশীতে কবে গেলেন।” সাধুচরণ কহিল, ‘তিনি যান নাই। তাহার কাশী যাওয়া হইবে না।’ শুনিয়া কিছু না মানিয়া অন্তঃপুরে যাইবার জন্য বিহারীর মন ছুটিল। পূর্বে যেমন সহজে যেমন আনন্দে আত্মীয়ের মতো সে পরিচিত সিঁড়ি বাহিয়া ভিতরে যাইত, সকলের সঙ্গে স্নিফ্ফ কৌতুকের সহিত হাস্যলাপ করিয়া আসিত, কিছুই মনে হইত না, আজ তাহা অবিহিত, তাহা দুর্লভ, জানিয়াই তাহার চিন্ত যেন উন্মত্ত হইল। আর- একটিবার, কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে গিয়া ঘরের ছেলের মতো রাজলক্ষ্মীর সহিত কথা সারিয়া, একবার ঘোমটাত্ত্ব আশাকে বৌঠান বলিয়া দুটো তুচ্ছ কথা কহিয়া আসা তাহার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। সাধুচরণ কহিল, ‘ভাই, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ভিতরে চলো।’

শুনিয়া বিহারী দ্রুতবেগে ভিতরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া সাধুকে কহিল, ‘যাই একটা কাজ আছে।’ বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। সেই রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দরোয়ান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া আসিল। মহেন্দ্র তখন দেউড়ির সমুখে ছোটো বাগানটিতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাহার চিঠি।” দরোয়ান সমস্ত বলিল। মহেন্দ্র চিঠিখানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া বিনোদিনীর হাতে দিবে— অপরাধিনী বিনোদিনীর লজ্জিত মুখ একবার সে দেখিয়া আসিবে— কোনো কথা বলিবে না। এই চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কারণ যে আছেই, মহেন্দ্রের মনে তাহাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্বেও আর- একদিন বিহারীর নামে এমনি একখানা চিঠি গিয়াছিল। চিঠিতে কী লেখা আছে, এ কথা না জানিয়া মহেন্দ্র কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনকে বুঝাইল— বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালোমন্দের জন্য সে দায়ী। অতএব এরূপ সন্দেহজনক পত্র খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তব্য। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

মহেন্দ্র ছোটো চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। তাহা সরল ভাষায় লেখা, সেইজন্য অকৃত্রিম উদ্বেগ তাহার মধ্য হইতে পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। চিঠিখানা পুনঃপুন পাঠ করিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়া মহেন্দ্র ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, বিনোদিনীর মনের গতি কোন্ দিকে। তাহার কেবলই আশঙ্কা হইতে লাগিল, ‘আমি যে

তাহাকে ভালোবাসি না বলিয়া অপমান করিয়াছি, সেই অভিমানেই বিনোদিনী অন্য দিকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে। রাগ করিয়া আমার আশা সে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে।’

এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের ধৈর্যরক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যে- বিনোদিনী তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছিল, সে যে মুহূর্তকালের মৃচ্যুতায় সম্পূর্ণ তাহার অধিকারচুত হইয়া যাইবে, সেই সন্তাননায় মহেন্দ্রকে স্থির থাকিতে দিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, ‘বিনোদিনী আমাকে যদি মনে মনে ভালোবাসে, তাহা বিনোদিনীর পক্ষে মঙ্গলকর— এক জায়গায় সে বদ্ধ হইয়া থাকিবে।’ আমি নিজের মন জানি, আমি তো তাহার প্রতি কখনোই অন্যায় করিব না। সে আমাকে নিরাপদে ভালোবাসিতে পারে। আমি আশাকে ভালোবাসি, আমার দ্বারা তাহার কোনো ভয় নাই। কিন্তু সে যদি অন্য কোনো দিকে মন দেয় তবে তাহার কী সর্বনাশ হইতে পারে কে জানে। মহেন্দ্র স্থির করিল, নিজেকে ধরা না দিয়া বিনোদিনীর মন কোনো অবকাশে আর- একবার ফিরাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, বিনোদিনী পথের মধ্যেই যেন কাহার জন্য উৎকর্ণিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অমনি মহেন্দ্রের মনে চকিতের মধ্যে বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, “ওগো, মিথ্যা দাঁড়াইয়া আছ, দেখা পাইবে না। এই তোমার চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে।” বলিয়া চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

বিনোদিনী কহিল, ‘খোলা যে?’

মহেন্দ্র তাহার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল। বিহারী চিঠি খুলিয়া পড়িয়া কোনো উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরত পাঠাইয়াছে মনে করিয়া বিনোদিনীর সর্বাঙ্গের সমস্ত শিরা দ্বাৰ দ্বাৰ করিতে লাগিল। যে দরোয়ান চিঠি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল; সে অন্য কাজে অনুপস্থিত ছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের মুখ হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু ক্ষরিয়া পড়ে, রূদ্ধ শায়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্ত নেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জ্বালা অশ্রজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা হইল না— সেই দুই- চারি লাইন কালির দাগকে অতীত হইতে বর্তমান হইতে একেবারেই মুছিয়া ফেলিবার, একেবারেই ‘না’ করিয়া দিবার কোনো উপায় নাই কেন। ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সন্তুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুদ্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভষ্ট, সমস্ত সন্তবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিগুরুষ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

অধ্যায় - ২৫

সেদিন নৃতন ফাল্গুনে প্রথম বসন্তের হাওয়া দিতেই আশা অনেক দিন পরে সন্ধ্যার আরঙ্গে ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে। একখানি মাসিক কাগজ লইয়া খণ্ডশ প্রকাশিত একটা গল্প খুব মনোযোগ দিয়া সেই অল্প আলোকে পড়িতেছিল। গল্পের নায়ক তখন সংবৎসর পরে পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিবার সময় ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে, আশার হৃদয় উদ্বেগে কাঁপিতেছিল, এ দিকে হতভাগিনী নায়িকা ঠিক সেই সময়েই বিপদের স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আশা চোখের জল আর রাখিতে পারে না। আশা বাংলা গল্পের অত্যন্ত উদার সমালোচক ছিল। যাহা পড়িত, তাহাই মনে হইত চমৎকার। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিত, “ভাই চোখের বালি, মাথা খাও, এ গল্পটা পড়িয়া দেখো। এমন সুন্দর ! পড়িয়া আর কাঁদিয়া বাঁচি না।” বিনোদিনী ভালোমন্দ বিচার করিয়া আশার উচ্ছুসিত উৎসাহে বড়ো আগাত করিত।

আজিকার এই গল্পটা আশা মহেন্দ্রকে পড়াইবে বলিয়া স্থির করিয়া যখন সজলচক্ষে কাগজখানা বন্ধ করিল, এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের মুখ দেখিয়াই আশা উৎকর্ষিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র জোর করিয়া প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “একলা ছাদের উপর কোন্ ভাগ্যবানের ভাবনায় আছ?”

আশা নায়ক- নায়িকার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া কহিল, “তোমার কী শরীর আজ ভালো নাই।”

মহেন্দ্র। শরীর বেশ আছে।

আশা। তবে তুমি মনে মনে কী একটা ভাবিতেছ, আমাকে খুলিয়া বলো।

মহেন্দ্র আশার বাটা হইতে একটা পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিয়া কহিল, ‘আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার মাসিমা বেচারা কত দিন তোমাকে দেখেন নাই। একবার হঠাত যদি তুমি তাঁহার কাছে গিয়া পড়িতে পার, তবে তিনি কত খুশিই হন।’

আশা কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাত এ কথা আবার নৃতন করিয়া কেন মহেন্দ্রের মনে উদয় হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, ‘তোমার যাইতে ইচ্ছা করে না?’

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। মাসিকে দেখিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করে, আবার মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছাও করে না। আশা কহিল, ‘কালেজের ছুটি পাইলে তুমি যখন যাইতে পারিবে, আমিও সঙ্গে যাইব।’

মহেন্দ্র। ছুটি পাইলেও যাইবার জো নাই; পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

আশা। তবে থাক, এখন না- ই গেলাম।

মহেন্দ্র। থাক কেন। যাইতে চাহিয়াছিলে, যাও- না।

আশা। না, আমার যাইবার ইচ্ছা নাই।

মহেন্দ্র। এই সেদিন এত ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ ইচ্ছা চলিয়া গেল?

আশা এই কথায় চুপ করিয়া চোখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীর সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য বাধাহীন অবসর চাহিয়া মহেন্দ্রের মন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার একটা অকারণ রাগের সঞ্চার হইল। কহিল, ‘আমার উপর মনে মনে তোমার কোনো সন্দেহ জনিয়াছে নাকি। তাই আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়া রাখিতে চাও?’

আশার স্বাভাবিক মৃদুতা নম্রতা ধৈর্য মহেন্দ্রের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, ‘মাসির কাছে যাইতে ইচ্ছা আছে, বলো যে, আমি যাইবই, আমাকে যেমন করিয়া হোক পাঠাইয়া দাও—তা নয়, কখনো হাঁ, কখনো না, কখনো চুপচাপ— এ কী রকম।’

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা বিস্মিত ভীত হইয়া উঠিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়া কোনো উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন যে কখনো হঠাৎ এত আদর করে, কখনো হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে না। এইরূপে মহেন্দ্র যতই তাহার কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে, ততই আশার কম্পান্বিত চিত্ত ভয়ে ও ভালোবাসায় তাহাকে যেন অত্যন্ত অধিক করিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে।

মহেন্দ্রকে আশা মনে মনে সন্দেহ করিয়া চোখে চোখে পাহারা দিতে চায় ! ইহা কি কঠিন উপহাস, না নির্দিয় সন্দেহ? শপথ করিয়া কি ইহার প্রতিবাদ আবশ্যিক, না হাস্য করিয়া ইহা উড়াইয়া দিবার কথা?

হতবুদ্ধি আশাকে পুনশ্চ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অধীর মহেন্দ্র দ্রুতবেগে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন কোথায় রহিল মাসিক পত্রের সেই গল্পের নায়ক, কোথায় রহিল গল্পের নায়িকা। সূর্যাস্তের আভা অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, সন্ধ্যারস্তের ক্ষণিক বসন্তের বাতাস গিয়া শীতের হাওয়া দিতে লাগিল—তখনো আশা সেই মাদুরের উপর লুক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক রাত্রে আশা শয়নঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র তাহাকে না ডাকিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। তখনই আশার মনে হইল, স্নেহময়ী মাসির প্রতি তাহার উদাসীনতা কল্পনা করিয়া মহেন্দ্র তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে। বিছানার মধ্যে ঢুকিয়াই আশা মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া তাহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া রহিল। তখন মহেন্দ্র করণায় বিচলিত হইয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল। আশা কিছুতেই উঠিল না। সে কহিল, “আমি যদি কোনো দোষ করিয়া থাকি, আমাকে মাপ করো।”

মহেন্দ্র আর্দ্ধচিত্তে কহিল, ‘তোমার কোনো দোষ নাই, চুনি। আমি নিতান্ত পাষণ্ড, তাই তোমাকে অকারণে আঘাত করিয়াছি।’

তখন মহেন্দ্রের দুই পা অভিষিক্ত করিয়া আশার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া তাহাকে দুই বাহুতে তুলিয়া আপনার পাশে শোয়াইল। আশার রোদনবেগ থামিলে সে কহিল, ‘মাসিকে কি আমার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করে না। কিন্তু তোমাকে ফেলিয়া আমার যাইতে মন সরে না। তাই আমি যাইতে চাই নাই, তুমি রাগ করিয়ো না।’

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার আদ্র কপোল মুছাইতে মুছাইতে কহিল, “এ কি রাগ করিবার কথা, চুনি। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার না, সে লইয়া আমি রাগ করিব? তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না।”

আশা কহিল, ‘না, আমি কাশী যাইব।’

মহেন্দ্র। কেন।

আশা। তোমাকে মনে মনে সন্দেহ করিয়া যাইতেছি না— এ কথা যখন একবার তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন আমাকে কিছুদিনের জন্যও যাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শিত্ত তোমাকে করিতে হইবে?

আশা। তাহা আমি জানি না— কিন্তু পাপ আমার কোনোখানে হইয়াছেই, নহিলে এমন- সকল অসন্তুষ্টি কথা উঠিতেই পারিত না। যে- সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না, সে- সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে।

মহেন্দ্র। তাহার কারণ, আমি যে কী মন্দ লোক তাহা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর।

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল, ‘আবার ! ও কথা বলিয়ো না। কিন্তু এবার আমি কাশী যাইবই।’

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, ‘আচ্ছা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি নষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে কী হইবে।’

আশা কহিল, ‘তোমার আর অত ভয় দেখাইতে হইবে না, আমি কিনা ভাবিয়া অঙ্গির হইতেছি।’

মহেন্দ্র। কিন্তু ভাবা উচিত। তোমার এমন স্বামীটিকে যদি অসাবধানে বিগড়াইতে দাও, তবে এর পরে কাহাকে দোষ দিবে?

আশা। তোমাকে দোষ দিব না, সেজন্য তুমি ভাবিয়ো না।

মহেন্দ্র। তখন নিজের দোষ স্বীকার করিবে?

আশা। একশোবার।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, তাহা হইলে কাল একবার তোমার জেঠামশায়ের সঙ্গে গিয়া কথাবার্তা ঠিক করিয়া আসিব।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ‘অনেক রাত হইয়াছে’ বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পুনর্বার এ পাশে ফিরিয়া কহিল, ‘চুনি, কাজ নাই, তুমি নাই- বা গেলে।’

আশা কাতর হইয়া কহিল, “আবার বারণ করিতেছ কেন। এবার একবার না গেলে তোমার সেই ভরৎসনাটা আমার গায়ে লাগিয়া থাকিবে। আমাকে দু- চার দিনের জন্যও পাঠাইয়া দাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা।” বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

কাশী যাইবার আগের দিন আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া কহিল, “ভাই বালি, আমার গা ছুঁইয়া একটা কথা বল।”

বিনোদিনী আশার গাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, “কী কথা, ভাই। তোমার অনুরোধ আমি রাখিব না?”

আশা। কে জানে ভাই, আজকাল তুমি কী রকম হইয়া গেছ। কোনোমতেই যেন আমার স্বামীর কাছে বাহির হইতে চাও না।

বিনোদিনী। কেন চাই না সে কি তুই জানিস নে, ভাই। সেদিন বিহারীবাবুকে মহেন্দ্রবাবু যে কথা বলিলেন, সে কি তুই নিজের কানে শুনিস নাই। এ- সকল কথা যখন উঠিল তখন কি আর বাহির হওয়া উচিত— তুমিই বলো- না, ভাই বালি।

ঠিক উচিত যে নহে, তাহা আশা বুঝিত। এ- সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর, তাহাও সে নিজের মন হইতেই সম্প্রতি বুঝিয়াছে। তবু বলিল, ‘কথা অমন কত উঠিয়া থাকে, সে- সব যদি না সহিতে পারিস তবে আর ভালোবাসা কিসের, ভাই। ও কথা ভুলিতে হইবে।’

বিনোদিনী। আচ্ছা ভাই, ভুলিব।

আশা। আমি তো ভাই, কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয় তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকার মতো পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না।

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “মাথা খা ভাই বালি, এই কথাটা আমাকে দিতেই হইবে।”

বিনোদিনী কহিল, “আচ্ছা।”

অধ্যায় - ২৬

এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায়, আর- এক দিকে সূর্য উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনো বিনোদিনীর দেখা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে- অসময়ে তাহার মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলই ফাঁকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের এইরূপ অত্যন্ত শূন্যভাব দেখিয়া ভাবিলেন, ‘বউ গিয়াছে, তাই এ বাড়িতে মহিনের কিছুই আর ভালো লাগিতেছে না।’ আজকাল মহেন্দ্রের সুখদুঃখের পক্ষে মাঝে বড়ের তুলনায় একান্ত অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাহাকে বিঁধিল- তবু মহেন্দ্রের এই লক্ষ্মীছাড়া বিমর্শ ভাব দেখিয়া তিনি বেদনা পাইলেন। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, “সেই ইন্দ্রজলেঞ্জের পর হইতে আমার হাঁপানির মতো হইয়াছে; আমি তো আজকাল সিঁড়ি ভাঙিয়া ঘন ঘন উপরে যাইতে পারি না। তোমাকে বাঢ়া, নিজে থাকিয়া মহিনের খাওয়াদাওয়া সমস্তই দেখিতে হইবে। বরাবরকার অভ্যাস, একজন কেহ যত্ন না করিলে মহিন থাকিতে পারে না। দেখো- না, বউ যাওয়ার পর হইতে ও কেমন একরকম হইয়া গেছে। বউকেও ধন্য বলি, কেমন করিয়া গেল?”

বিনোদিনী একটুখানি মুখ বাঁকাইয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘কী বউ, কী ভাবিতেছ। ইহাতে ভাবিবার কথা কিছু নাই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি আমাদের পর নও।’

বিনোদিনী কহিল, ‘কাজ নাই, মা।’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘আচ্ছা, তবে কাজ নাই। দেখি আমি নিজে যা পারি তাই করিব।’

বলিয়া তখনই তিনি মহেন্দ্রের তেতুলার ঘর ঠিক করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, ‘তোমার অসুখ- শরীর, তুমি যাইয়ো না, আমি যাইতেছি। আমাকে মাপ করো পিসিমা, তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব।’

রাজলক্ষ্মী লোকের কথা একেবারেই তুচ্ছ করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনী সমাজনিন্দার আভাস দেওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আজন্মকাল তিনি মহিনকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহার মতো এমন ভালো ছেলে আছে কোথায়। সেই মহিনের সম্বন্ধেও নিন্দা ! যদি কেহ করে, তবে তাহার জিহ্বা খসিয়া যাক। তাহার নিজের কাছে যেটা ভালো লাগে ও ভালো বোধ হয় সে- সম্বন্ধে বিশ্বের লোককে উপেক্ষা করিবার জন্য রাজলক্ষ্মীর একটা স্বাভাবিক জেদ ছিল।

আজ মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার শয়নঘর দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দ্বার খুলিয়াই দেখিল, চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া আছে। মশারিতে গোলাপি রেশমের ঝালর লাগানো। নীচের বিছানায় শুভ জাজিম তকতক করিতেছে এবং তাহার উপরে পূর্বেকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতি চোকা বালিশ সুসজ্জিত। তাহার কারুকার্য বিনোদিনীর বহুদিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, “এগুলি তুই কার জন্যে তৈরি করিতেছিস, ভাই।” বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, ‘আমার চিতাশয়ার জন্য। মরণ ছাড়া তো সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই।’

দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙিন ফিতার দ্বারা সুনিপুণভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা, এবং সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেন্দ্রের প্রতিমূর্তি কোনো অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। সবসুন্দর সমস্ত ঘরের চেহারা অন্যরকম। খাট যেখানে ছিল সেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে; খাটের সমুখে দুটি বড়ো আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া আড়ালের মতো প্রস্তুত হওয়ায় নীচে বসিবার বিছানা ও রাত্রে শুইবার খাট স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। যে আলমারিতে আশার সমস্ত শখের জিনিস চীনের খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারির কাঁচের দরজায় ভিতরের গায়ে লাল সালু কুঁঢ়িত করিয়া মারিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন আর তাহার ভিতরের কোনো জিনিস দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব- ইতিহাসের যে- কিছু চিহ্ন ছিল, তাহা নৃতন হস্তের নব সজ্জায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রান্ত মহেন্দ্র মেঝের উপরকার শুভ্র বিছানায় শুইয়া নৃতন বালিশগুলির উপর মাথা রাখিবামাত্র একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিল— বালিশের ভিতরকার তুলার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নাগকেশর ফুলের রেণু ও কিছু আতর মিশ্রিত ছিল।

মহেন্দ্রের চোখ বুজিয়া আসিল, মনে হইতে লাগিল, এই বালিশের উপর যাহার নিপুণ হস্তের শিল্প, তাহারই কোমল চম্পক- অঙ্গুলির যেন গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

এমন সময় দাসী রূপার রেকাবিতে ফল ও মিষ্ট এবং কাঁচের ফ্লাসে বরফ- দেওয়া আনারসের শরবত আনিয়া দিল। এ সমষ্টই পূর্বপ্রথা হইতে কিছু বিভিন্ন এবং বহু যত্ন ও পারিপাট্টের সহিত রচিত। সমস্ত স্বাদে গন্ধে দৃশ্যে নৃতনত্ব আসিয়া মহেন্দ্রের ইন্দ্রিয়- সকল আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

তৃষ্ণপূর্বক ভোজন সমাধা হইলে, রূপার বাটায় পান ও মসলা লইয়া বিনোদিনী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

হাসিতে

কহিল, “এ কয়দিন তোমার খাবার সময় হাজির হইতে পারি নাই, মাপ করিয়ো, ঠাকুরপো। আর যাই কর, আমার মাথার দিব্য রহিল, তোমার অযত্ন হইতেছে, এ খবরটা আমার চোখের বালিকে দিয়ো না। আমার যথাসাধ্য আমি করিতেছি— কিন্তু কী করিব ভাই, সংসারের সমস্ত কাজই আমার ঘাড়ে।”

এই বলিয়া বিনোদিনী পানের বাটা মহেন্দ্রের সমুখে অগ্রসর করিয়া দিল। আজিকার পানের মধ্যেও কেয়া খয়েরের একটু বিশেষ নৃতন গন্ধ পাওয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, “যত্নের মাঝে মাঝে এমন এক- একটা গ্রন্থি থাকাই ভালো।”

বিনোদিনী কহিল, “ভালো কেন, শুনি।”

মহেন্দ্র উত্তর করিল, “তার পরে খেঁটা দিয়া সুদসুন্দর আদায় করা যায়।”

“মহাজন- মহাশয়, সুন্দর কত জমিল?”

মহেন্দ্র কহিল, “খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজরি পোষাইয়া আরো পাওনা বাকি থাকিবে।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, ‘তোমার হিসাব যেরকম কড়াকড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্বার নাই দেখিতেছি।’

মহেন্দ্র কহিল, “হিসাবে যাই থাক, আদায় কী করিতে পারিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “আদায় করিবার মতো আছে কী। তবু তো বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।” বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গান্তীর্যে পরিণত করিয়া ঈষৎ একটু দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিল।

মহেন্দ্রও একটু গন্তীর হইয়া কহিল, “ভাই বালি, এটা কি তবে জেলখানা।”

এমন সময় বেহারা নিয়মমত আলো আনিয়া টিপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

হঠাৎ চোখে আলো লাগাতে মুখের সামনে একটু হাতের আড়াল করিয়া নতনেত্রে বিনোদিনী বলিল, ‘কী জানি ভাই। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে। এখন যাই, কাজ আছে।’

মহেন্দ্র হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, ‘বন্ধন যখন স্বীকার করিয়াছ তখন যাইবে কোথায়?’

বিনোদিনী কহিল, ‘ছি ছি, ছাড়ো— যাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাঁধিবার চেষ্টা কেন।’

বিনোদিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্তান করিল।

মহেন্দ্র সেই বিছানার সুগন্ধ বালিশের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর সন্ধ্যা, নির্জন ঘর, নববসন্তের বাতাস দিতেছে, বিনোদিনীর মন যে ধরা দিল- দিল- উন্মাদ মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এমনি বোধ হইল। তাড়াতাড়ি আলো নিবাইয়া ঘরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিল, তাহার উপরে শার্সি আঁটিয়া দিল, এবং সময় না হইতেই বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল।

এও তো সে পুরাতন বিছানা নহে। চার- পাঁচখানা তোশকে শয্যাতল পূর্বের চেয়ে অনেক নরম। আবার একটি গন্ধ- সে অগুরু কি খসখসের, কি কিসের ঠিক বুৰা গেল না। মহেন্দ্র অনেক বার এপাশ- ওপাশ করিতে লাগিল- কোথাও যেন পুরাতনের কোনো একটা নির্দশন খুঁজিয়া পাইয়া তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হাতে ঠেকিল না।

রাত্রি নটার সময় রূদ্ধ দ্বারে ঘা পড়িল। বিনোদিনী বাহির হইতে কহিল, ‘ঠাকুরপো, তোমার খাবার আসিয়াছে, দুয়ার খোলো।’

তখনই দ্বার খুলিবার জন্য মহেন্দ্র ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া শাসির অর্গলে হাত লাগাইল। কিন্তু খুলিল না- মেঝের উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া কহিল, ‘না না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না।’

বাহির হইতে উদ্বিগ্ন কঢ়ের প্রশ্ন শোনা গেল, ‘অসুখ করে নি তো? জল আনিয়া দিব? কিছু চাই কি।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আমার কিছুই চাই না- কোনো প্রয়োজন নাই।’

বিনোদনী কহিল, ‘মাথা খাও, আমার কাছে ভাঁড়াইয়ো না। আচ্ছা, অসুখ না থাকে তো একবার দরজা খোলো।’

মহেন্দ্র সবেগে বলিয়া উঠিল, ‘না খুলিব না, কিছুতেই না। তুমি যাও।’

বলিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুনর্বার বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং অন্তর্হিত আশার সূতিকে শূন্য শয্যা ও চথ্বল হৃদয়ের মধ্যে অঙ্ককারে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘুম যখন কিছুতেই আসিতে চায় না, তখন মহেন্দ্র বাতি জ্বালাইয়া দোয়াত কলম লইয়া আশাকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল, ‘আশা, আর অধিক দিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ো না। আমার জীবনের লক্ষ্মী তুমি। তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রত্নতি শিকল ছিঁড়িয়া আমাকে কোন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, বুবিতে পারি না। পথ দেখিয়া চলিব, তাহার আলো কোথায়— সে আলো তোমার বিশ্বাসপূর্ণ দুটি চোখের প্রেমন্ধিন্ধ দৃষ্টিপাতে। তুমি শীত্র এসো, আমার শুভ, আমার ধ্রুব, আমার এক। আমাকে স্থির করো, রক্ষা করো, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করো। তোমার প্রতি লেশমাত্র অন্যায়ের মহাপাপ হইতে, তোমাকে মুহূর্তকাল বিস্মরণের বিভীষিকা হইতে আমাকে উদ্ধার করো।’

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিজেকে আশার অভিমুখে সবেগে তাড়না করিবার জন্য অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথা লিখিল। দূর হইতে সুন্দরে অনেকগুলি গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে গাড়ির শব্দ আর প্রায় নাই, পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে নটীকঞ্চে বেহাগ- রাগিণীর যে গান উঠিতেছিল সেও বিশ্বব্যাপনী শান্তি ও নিদ্রার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র একান্তমনে আশাকে স্মরণ করিয়া এবং মনের উদ্বেগ দীর্ঘ পত্রে নানাকৃপে ব্যক্ত করিয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল, এবং বিছানায় শুইবামাত্র ঘুম আসিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকালে মহেন্দ্র যখন জাগিয়া উঠিল, তখন বেলা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; নিদ্রার পর গতরাত্রির সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হালকা হইয়া আসিয়াছে। বিছানার বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিল— গতরাত্রে আশাকে সে যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা টিপাইয়ের উপর দোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে। সেখানি পুনর্বার পড়িয়া মহেন্দ্র তাবিল, ‘করেছি কী। এ যে নভেলি ব্যাপার! ভাগ্যে পাঠাই নাই। আশা পড়িলে কী মনে করিত। সে তো এর অর্ধেক কথা বুবিতেই পারিত না।’ রাত্রে ক্ষণিক কারণে হৃদয়াবেগ যে অসংগত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে মহেন্দ্র লজ্জা পাইল; চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; সহজ ভাষায় আশাকে একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল—

‘তুমি আর কত দেরি করিবে। তোমার জেঠামহাশয়ের যদি শীত্র ফিরিবার কথা না থাকে, তবে আমাকে লিখিয়ো, আমি নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আসিব। এখানে একলা আমার ভালো লাগিতেছে না।’

অধ্যায় - ২৭

মহেন্দ্র চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আশা যখন কাশীতে আসিল, তখন অন্নপূর্ণার মনে বড়েই আশঙ্কা জন্মিল। আশাকে তিনি নানাপ্রকারে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ‘‘হঁ রে চুনি, তুই যে তোর সেই চোখের বালির কথা বলিতেছিলি, তোর মতে, তার মতন এমন গুণবত্তী মেয়ে আর জগতে নাই?’’

‘‘সত্যই মাসি, আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। তার যেমন বুদ্ধি তেমনি রূপ, কাজকর্মে তার তেমনি হাত।’’

‘‘তোর সখী, তুই তো তাহাকে সর্বগুণবত্তী দেখিবি, বাড়ির আর- সকলে তাহাকে কে কী বলে শুনি।’’

‘‘মার মুখে তো তার প্রশংসা ধরে না। চোখের বালি দেশে যাইবার কথা বলিতেই তিনি অস্ত্রির হইয়া ওঠেন। এমন সেবা করিতে কেহ জানে না। বাড়ির চাকর দাসীরও যদি কারো ব্যামো হয় তাকে বোনের মতো, মার মতো যত্ন করে।’’

‘‘মহেন্দ্রের মত কী।’’

‘‘তাঁকে তো জানই মাসি, নিতান্ত ঘরের লোক ছাড়া আর- কাউকে তাঁর পছন্দই হয় না। আমার বালিকে সকলেই ভালোবাসে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তার আজ পর্যন্ত ভালো বনে নাই।’’

‘‘কী রকম।’’

‘‘আমি যদি- বা অনেক করিয়া দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, তাঁর সঙ্গে তার কথাবার্তাই প্রায় বন্ধ। তুমি তো জান, তিনি কী রকম কুনো- লোকে মনে করে, তিনি অহংকারী, কিন্তু তা নয় মাসি, তিনি দুটি- একটি লোক ছাড়া কাহাকেও সহ্য করিতে পারেন না।’’

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আশার লজ্জাবোধ হইল, গাল- দুটি লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা খুশি হইয়া মনে মনে হাসিলেন- কহিলেন, ‘‘তাই বটে, সেদিন মহিন যখন আসিয়াছিল, তোর বালির কথা একবার মুখেও আনে নাই।’’

আশা দুঃখিত হইয়া কহিল, ‘‘ঐ তাঁর দোষ। যাকে ভালোবাসেন না, সে যেন একেবারেই নাই। তাকে যেন একদিনও দেখেন নাই, জানেন নাই, এমনি তাঁর ভাব।’’

অন্নপূর্ণা শান্ত স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, ‘‘আবার যাকে ভালোবাসেন মহিন যেন জন্মজন্মান্তর কেবল তাকেই দেখেন এবং জানেন, এ ভাবও তাঁর আছে। কী বলিস, চুনি।’’

আশা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চোখ নিচু করিয়া হাসিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘চুনি, বিহারীর কী খবর বল দেখি। সে কি বিবাহ করিবে না।’’

মুহূর্তের মধ্যেই আশার মুখ গন্তীর হইয়া গেল- সে কী উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিরগত ভাবে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, ‘‘সত্য বল চুনি, বিহারীর অসুখ- বিসুখ কিছু হয় নি তো?’’

বিহারী এই চিরপুত্রইনা রমণীর স্নেহ- সিংহাসনে পুত্রের মানস- আদর্শরূপে বিরাজ করিত। বিহারীকে তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আসিতে পারেন নাই, এ দুঃখ প্রবাসে আসিয়া প্রতিদিন তাঁহার মনে জাগিত। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের আর- সমস্তই একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল বিহারীর সেই গৃহহীন অবঙ্গ স্মরণ করিয়াই তাঁহার পরিপূর্ণ বৈরাগ্যচর্চার ব্যাঘাত ঘটে।

আশা কহিল, ‘মাসি, বিহারী- ঠাকুরপোর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না।’

অন্নপূর্ণা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেন বল দেখি।’

আশা কহিল, ‘সে আমি বলিতে পারিব না।’ বলিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘অমন সোনার ছেলে বিহারী, এরই মধ্যে তাহার কি এতই বদল হইয়াছে যে, চুনি আজ তাহার নাম শুনিয়া উঠিয়া যায়। অদ্বিতীয়েই খেলা। কেন তাহার সহিত চুনির বিবাহের কথা হইল, কেনই- বা মহেন্দ্র তাহার হাতের কাছ হইতে চুনিকে কাড়িয়া লইল।’

অনেক দিন পরে আজ আবার অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া জল পড়িল- মনে মনে তিনি কহিলেন, ‘আহা, আমার বিহারী যদি এমন- কিছু করিয়া থাকে যাহা আমার বিহারীর যোগ্য নহে, তবে সে তাহা অনেক দুঃখ পাইয়াই করিয়াছে, সহজে করে নাই।’ বিহারীর সেই দুঃখের পরিমাণ কল্পনা করিয়া অন্নপূর্ণার বক্ষ ব্যথিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় যখন অন্নপূর্ণা আহিকে বসিয়াছেন, তখন একটা গাঢ়ি আসিয়া দরজায় থামিল, এবং সহিস বাড়ির লোককে ডাকিয়া রূপ্ত্ব দ্বারে ঘা মারিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা পূজাগ্রহ হইতে বলিয়া উঠিলেন, “ঐ যা, আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ কুঞ্জের শাশুড়ির এবং তার দুই বোনবীর এলাহাবাদ হইতে আসিবার কথা ছিল। ঐ বুঝি তাহারা আসিল। চুনি, তুই একবার আলোটা লইয়া দরজা খুলিয়া দে।”

আশা লঞ্চন- হাতে দরজা খুলিয়া দিতেই দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া। বিহারী বলিয়া উঠিল, “এ কী বৌঠান, তবে যে শুনিলাম, তুমি কাশী আসিবে না।”

আশার হাত হইতে লঞ্চন পড়িয়া গেল। সে যেন প্রেতমূর্তি দেখিয়া এক নিশ্চাসে দোতলায় ছুটিয়া গিয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, ‘মাসিমা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উঁহাকে এখনই যাইতে বলো।’

অন্নপূর্ণা পূজার আসন হইতে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, ‘কাহাকে চুনি, কাহাকে।’

আশা কহিল, ‘বিহারী- ঠাকুরপো এখানেও আসিয়াছেন।’ বলিয়া সে পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিল।

বিহারী নীচে হইতে সকল কথাই শুনিতে পাইল। সে তখনই ছুটিয়া যাইতে উদ্যত- কিন্তু অন্নপূর্ণা পূজাহীক ফেলিয়া যখন নামিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, বিহারী দ্বারের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার শরীর হইতে সমস্ত শক্তি চলিয়া গেছে।

অন্নপূর্ণা আলো আনেন নাই। অন্ধকারে তিনি বিহারীর মুখের ভাব দেখিতে পাইলেন না, বিহারীও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘বেহারী !’

হায়, সেই চিরদিনের মেহসুধাসিঙ্ক কষ্টস্বর কোথায়। এ কঠের মধ্যে যে কঠিন বিচারের বজ্রধনি প্রচল্ল
হইয়া আছে। জননী অন্নপূর্ণা, সংহার- খড়গ তুলিলে কার ’পরে। ভাগ্যহীন বিহারী যে আজ অন্ধকারে
তোমার মঙ্গলচরণাশ্রয়ে মাথা রাখিতে আসিয়াছিল।

বিহারীর অবশ শরীর আপাদমস্তক বিদ্যুতের আঘাতে চকিত হইয়া উঠিল, কহিল, ‘কাকীমা, আর নয়,
আর একটি কথাও বলিয়ো না। আমি চলিলাম।’

বলিয়া বিহারী ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, অন্নপূর্ণার পাও স্পর্শ করিল না। জননী যেমন
গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করে, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া বিহারীকে সেই রাত্রের অন্ধকারে নীরবে বিসর্জন
করিলেন, একবার ফিরিয়া ডাকিলেন না। গাড়ি বিহারীকে লইয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই আশা মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিল—

‘বিহারী- ঠাকুরপো হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছিলেন। জেঠামশায়রা কবে কলিকাতায়
ফিরিবেন, ঠিক নাই— তুমি শীত্র আসিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও।’

অধ্যায় - ২৮

সেদিন রাত্রিজাগরণ ও প্রবল আবেগের পরে সকালবেলায় মহেন্দ্রের শরীর- মনে একটা অবসাদ উপস্থিত
হইয়াছিল। তখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি, গরম পড়িতে আরস্ত করিয়াছে। মহেন্দ্র অন্যদিন সকালে তাহার
শয়নগৃহের কোণে টেবিলে বই লইয়া বসিত। আজ নীচের বিছানায় তাকিয়ায় হেলান দিয়া পড়িল। বেলা
হইয়া যায়, স্নানে গেল না। রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। পথে আপিসের গাড়ির শব্দের
বিরাম নাই। প্রতিবেশীর নৃতন বাড়ি তৈরি হইতেছে, মিঞ্চি- কন্যারা তাহারই ছাদ পিটিবার তালে তালে

সমস্বরে একঘেয়ে গান ধরিল। ঈষৎ তপ্ত দক্ষিণের হাওয়ায় মহেন্দ্রের পীড়িত স্নায়ুজাল শিথিল হইয়া
আসিয়াছে; কোনো কঠিন পণ, দুরহ চেষ্টা, মানস- সংগ্রাম আজিকার এই হালচাড়া গা- ঢালা বসন্তের
দিনের উপযুক্ত নহে।

‘ঠাকুরপো, তোমার আজ হল কী? স্নান করিবে না? এ দিকে খাবার যে প্রস্তুত। ও কী ভাই, শুইয়া যে!
অসুখ করিয়াছে? মাথা ধরিয়াছে?’ বলিয়া বিনোদিনী কাছে আসিয়া মহেন্দ্রের কপালে হাত দিল।

মহেন্দ্র অর্ধেক চোখ বুজিয়া জড়িতকঠে বলিল, “আজ শরীরটা তেমন ভালো নাই— আজ আর স্নান করিব
না।”

বিনোদিনী কহিল, “স্নান না কর তো দুটিখানি খাইয়া লও।” বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া সে মহেন্দ্রকে
ভোজনস্থানে লইয়া গেল এবং উৎকঠিত যত্নের সহিত অনুরোধ করিয়া আহার করাইল।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নীচের বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী শিয়রে বসিয়া ধীরে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিমীলিতচক্ষে বলিল, “ভাই বালি, এখনো তো তোমার খাওয়া হয় নাই, তুমি খাইতে যাও।”

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না। অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেলগাছের অর্থহীন মর্মরশব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড ক্রমশই দ্রুততর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘন নিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারো কষ্ট দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘অসীম বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তরণী ক্ষণকালের জন্য কখন কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কী আসে যায় এবং কতদিনের জন্যই বা যায় আসে।’

শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহুল ঘৌবনের গুরুত্বারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আসিতেছিল, অবশ্যে তাহার কেশাগ্রভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃদু স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিশ্বাস তাহার বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, “নাঃ আমার কালেজ আছে, আমি যাই।” বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে না চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, “ব্যস্ত হইয়ো না, আমি তোমার কাপড় আনিয়া দিই।” বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজের কাপড় বাহির করিয়া আনিল।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কালেজে চলিয়া গেল, কিন্তু সেখানে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। পড়াশুনায় মন দিতে অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বিনোদিনী বুকের তলায় বালিশ টানিয়া লইয়া নীচের বিছানায় উপুড় হইয়া কী একটা বই পড়িতেছে— রাশীকৃত কালো চুল পিঠের উপর ছড়ানো। বোধ করি বা সে মহেন্দ্রের জুতার শব্দ শুনিতে পায় নাই। মহেন্দ্র আস্তে আস্তে পা টিপিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল, পড়িতে পড়িতে বিনোদিনী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্র কহিল, “ওগো করণাময়ী, কাল্পনিক লোকের জন্য হৃদয়ের বাজে খরচ করিয়ো না। কী পড়া হইতেছে।”

বিনোদিনী ত্রুটি হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র কাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাতাহাতি- কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অঞ্চল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল— বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের বক্ষঃস্থল তোলপাড় করিতেছিল। অনেক চেষ্টায় সে হাসিয়া কহিল, ‘ছি ছি, বড়ো ফঁকি দিলে। আমি ভাবিয়াছিলাম, খুব একটা গোপনীয় কিছু হইবে বা। এত কাড়াকাড়ি করিয়া শেষকালে কিনা বিষবৃক্ষ বাহির হইয়া পড়িল।’

বিনোদিনী কহিল, “আমার আবার গোপনীয় কী থাকিতে পারে, শুনি।”

মহেন্দ্র ফস্ক করিয়া বলিয়া ফেলিল, “এই মনে করো, যদি বিহারীর কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিত?”

নিমেষের মধ্যে বিনোদিনীর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। এতক্ষণ ফুলশর ঘরের কোণে খেলা করিতেছিল, সে যেন দ্বিতীয় বার ভস্মসাংহ হইয়া গেল। মুহূর্তে- প্রজ্ঞালিত অগ্নিশিখার মতো বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, ‘‘মাপ করো, আমার পরিহাস মাপ করো।’’

বিনোদিনী সবেগে হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল, “পরিহাস করিতেছ কাহাকে। যদি তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার যোগ্য হইতে, তবে তাহাকে পরিহাস করিলে সহ্য করিতাম। তোমার ছোটো মন, বন্ধুত্ব করিবার শক্তি নাই, অথচ ঠাট্টা।”

বিনোদিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইবামাত্র মহেন্দ্র দুই হাতে তাহার পা বেষ্টন করিয়া বাধা দিল। এমন সময়ে সমুখে এক ছায়া পড়িল, মহেন্দ্র বিনোদিনীর পা ছাড়িয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বিহারী।

বিহারী স্ত্রি দৃষ্টিপাতে উভয়কে দন্ধ করিয়া শান্ত ধীর স্বরে কহিল, ‘‘অত্যন্ত অসময়ে উপস্থিত হইয়াছি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিব না। একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। আমি কাশী গিয়াছিলাম, জানিতাম না, সেখানে বউঠাকরুন আছেন। না জানিয়া তাহার কাছে অপরাধী হইয়াছি; তাহার কাছে ক্ষমা চাহিবার অবসর নাই, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার মনে জ্ঞানে অজ্ঞানে যদি কখনো কোনো পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, সেজন্য তাহাকে যেন কখনো দুঃখ সহ্য করিতে না হয়, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।’’

বিহারীর কাছে দুর্বলতা হঠাৎ প্রকাশ পাইল বলিয়া মহেন্দ্রের মনটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। এখন তাহার ওদার্যের সময় নহে। সে একটু হাসিয়া কহিল, “ঠাকুরঘরে কলা খাইবার যে গল্প আছে, তোমার ঠিক তাই দেখিতেছি। তোমাকে দোষ স্বীকার করিতেও বলি নাই, অস্বীকার করিতেও বলি নাই; তবে ক্ষমা চাহিয়া সাধু হইতে আসিয়াছ কেন।”

বিনোদিনী কথা বিহারীর কানে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ— সে যেন স্বপ্নচালিতের মতো মহেন্দ্রের ঘরের সমুখ হইতে ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদিনী তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো, আমাকে কি তোমার কোনো কথা বলিবার নাই। যদি তিরক্ষারের কিছু থাকে, তবে তিরক্ষার করো।”

বিহারী যখন কোনো উত্তর না করিয়া চলিতে লাগিল, বিনোদিনী সমুখে আসিয়া দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হাত চাপিয়া ধরিল। বিহারী অপরিসীম ঘৃণার সহিত তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই আঘাতে বিনোদিনী যে পড়িয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পতনশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিল। দেখিল, বিনোদিনীর বাম হাতের কনুয়ের কাছে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

মহেন্দ্র কহিল, “ইস্, এ যে অনেকটা কাটিয়াছে” বলিয়া তৎক্ষণাত নিজের পাতলা জামা খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, ‘না না, কিছুই করিয়ো না, রক্ত পড়িতে দাও।’

মহেন্দ্র কহিল, “বাঁধিয়া একটা ঔষধ দিতেছি, তা হইলে আর ব্যথা হইবে না, শীত্র সারিয়া যাইবে।”

বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল, ‘আমি ব্যথা সারাইতে চাই না, এ কাটা আমার থাক।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আজ অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সামনে অপদস্থ করিয়াছি, আমাকে মাপ করিতে পারিবে কি।’

বিনোদিনী কহিল, ‘মাপ কিসের জন্য। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মানি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারাই কি আমার সব, আর যাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে?’

মহেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া গদংগদকষ্টে বলিয়া উঠিল, ‘বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না?’

বিনোদিনী কহিল, ‘মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, ‘চাই না’ বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।’

মহেন্দ্র তখন দুই হাতে বিনোদিনীর দুই হাত ধরিয়া কহিল, ‘তবে এসো আমার ঘরে। তোমাকে আজ আমি ব্যথা দিয়াছি, তুমিও আমাকে ব্যথা দিয়া চলিয়া আসিয়াছ— যতক্ষণ তাহা একেবারে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ আমার খাইয়া শুইয়া কিছুতেই সুখ নাই।’

বিনোদিনী কহিল, ‘আজ নয়, আজ আমাকে ছাড়িয়া দাও। যদি তোমাকে দুঃখ দিয়া থাকি, মাপ করো।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘তুমি আমাকে মাপ করো, নহিলে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারিব না।’

বিনোদিনী কহিল, ‘মাপ করিলাম।’

মহেন্দ্র তখনই অধীর হইয়া বিনোদিনীর কাছে হাতে- হাতে ক্ষমা ও ভালোবাসার একটা নির্দশন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল— মহেন্দ্রও ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ছাদে বেড়াইতে লাগিল। বিহারীর কাছে হঠাৎ আজ মহেন্দ্র ধরা পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার মনে একটা মুক্তির আনন্দ উপস্থিত হইল। লুকোচুরির যে- একটা ঘৃণ্যতা আছে, একজনের কাছে প্রকাশ হইয়াই যেন তাহা অনেটা দূর হইল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, ‘আমি নিজেকে ভালো বলিয়া মিথ্যা করিয়া আর চালাইতে চাহি না— কিন্তু আমি ভালোবাসি— আমি ভালোবাসি, সে কথা মিথ্যে নহে।’— নিজের ভালোবাসার গৌরবে তাহার স্পর্ধা

এতই বাড়িয়া উঠিল যে, নিজেকে মন্দ বলিয়া সে আপন মনে উদ্বিগ্নভাবে গর্ব করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর সম্প্রদায়কালে নীরব- জ্যোতিষ্মণ্ডলী- অধিরাজিত অনন্ত জগতের প্রতি একটা অবজ্ঞা নিষ্কেপ করিয়া মনে মনে কহিল, ‘যে আমাকে যত মন্দই মনে করুক, কিন্তু আমি ভালোবাসি।’ বলিয়া বিনোদিনীর মানসী মূর্তিকে দিয়া মহেন্দ্র সমস্ত আকাশ, সমস্ত সংসার, সমস্ত কর্তব্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি- আঁটা মসীপাত্র উলটাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল- বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্বেকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল।

অধ্যায় - ২৯

পরদিন দ্যুম ভাঙিয়া বিছানা হইতে উঠিবামাত্রই একটি মধুর আবেগে মহেন্দ্রের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাতের সূর্যালোক যেন তাহার সমস্ত ভাবনায় বাসনায় সোনা মাখাইয়া দিল। কী সুন্দর প্রথিবী, কী মধুময় আকাশ, বাতাস যেন পুষ্পরেণুর মতো সমস্ত মনকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

সকালবেলায় বৈষ্ণব ভিক্ষুক খোল- করতাল বাজাইয়া গান জুড়িয়া দিয়াছিল। দরোয়ান তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইলে মহেন্দ্র দরোয়ানকে ভরৎসনা করিয়া তখনই তাহাদিগকে একটা টাকা দিয়া ফেলিল। বেহারা কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া যাইবার সময় অসাবধানে ফেলিয়া দিয়া চুরমার করিল- মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। মহেন্দ্র তিরক্ষারমাত্র না করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল, “ওরে ওখানটা ভালো করিয়া ঝাঁট দিয়া ফেলিস- যেন কাহারো পায়ে কাঁচ না ফোটে।” আজ কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না।

প্রেম এতদিন নেপথ্যের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া ছিল- আজ সে সন্মুখে আসিয়া পর্দা উঠাইয়া দিয়াছে। জগৎসংসারের উপর হইতে আবরণ উঠিয়া গেছে। প্রতিদিনের প্রথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা আজ অভ্যন্তর হইল। গাছপালা, পশুপক্ষী, পথের জনতা, নগরের কোলাহল, সকলই আজ অপরূপ। এই বিশ্বব্যাপী নৃতনতা এতকাল ছিল কোথায়।

মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, আজ যেন বিনোদিনীর সঙ্গে অন্যদিনের মতো সামান্যভাবে মিলন হইবে না। আজ যেন কবিতায় কথা বলিলে এবং সংগীতে ভাব প্রকাশ করিলে, তবে ঠিক উপযুক্ত হয়। আজিকার দিনকে ঐশ্বর্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া মহেন্দ্র সৃষ্টিছাড়া সমাজছাড়া একটা আরব্য- উপন্যাসের অঙ্গুত দিনের মতো করিয়া তুলিতে চায়। তাহা সত্য হইবে, অথচ স্বপ্ন হইবে- তাহাতে সংসারের কোনো বিধিবিধান, কোনো দায়িত্ব, কোনো বাস্তবিকতা থাকিবে না।

আজ সকাল হইতে মহেন্দ্র চপ্পল হইয়া বেড়াইতে লাগিল, কালেজে যাইতে পারিল না; কারণ, মিলনের লঘুটি কখন অকস্যাত আবির্ভূত হইবে, তাহা তো কোনো পঞ্জিকায় লেখে না।

গৃহকার্যে রত বিনোদিনীর কঠস্বর মাঝে মাঝে ভাঁড়ার হইতে, রান্নাঘর হইতে মহেন্দ্রের কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। আজ তাহা মহেন্দ্রের ভালো লাগিল না- আজ সে বিনোদিনীকে মনে মনে সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপন করিয়াছে।

সময় কাটিতে চায় না। মহেন্দ্রের স্নানাহার হইয়া গেল— সমস্ত গৃহকর্মের বিরামে মধ্যাহ্ন নিষ্ঠক হইয়া আসিল। তবু বিনোদনীর দেখা নাই। দৃশ্যে এবং সুখে, অধৈর্যে এবং আশায় মহেন্দ্রের মনোযন্ত্রের সমস্ত তারণগুলা বাংকৃত হইতে লাগিল।

কালিকার কাড়াকাড়ি- করা সেই বিষবৃক্ষখনি নীচের বিছানায় পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র সেই কাড়াকাড়ির সূতিতে মহেন্দ্রের মনে পুলকাবেশ জাগিয়া উঠিল। বিনোদিনী যে- বালিশ চাপিয়া শুইয়াছিল, সেই বালিশটা টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র তাহাতে মাথা রাখিল; এবং বিষবৃক্ষখনি তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উলটাইতে লাগিল। ক্রমে কখন এক সময় পড়ায় মন লাগিয়া গেল, কখন পাঁচটা বাজিয়া গেল— হুঁশ হইল না।

এমন সময় একটি মোরাদাবাদি খুঁতের উপর থালায় ফল ও সন্দেশ এবং রেকাবে বরফচিনিসংযুক্ত সুগন্ধি দলিত খরমুজা লইয়া বিনোদনী ঘরে প্রবেশ করিল এবং মহেন্দ্রের সমুখে রাখিয়া কঠিল, ‘কী করিতেছ, ঠাকুরপো। তোমার হইল কী। পাঁচটা বাজিয়া গেছে, এখনো হাতমুখ-ধোয়া কাপড়-ছাড়া হইল না?’

ମହେନ୍ଦ୍ର ଖାଇତେ ବସିଲା । ବିନୋଦିନୀ ଛାଦେ- ବିଚାନୋ ରୌଡ଼େ- ଦେଓଯା ମହେନ୍ଦ୍ରେର କାପଡ଼ଗୁଲି ଦ୍ରୁତପଦେ ଘରେ ବହିଆ ଆନିଆ ନିପଣ ହଞ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗ କରିଯା କାପଡ଼େର ଆଲମାରିର ମଧ୍ୟେ ତଳିତେ ଲାଗିଲା ।

ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲ, “ଏକଟ୍ ରୋସୋ, ଆମି ଖାଇୟା ଉଠିୟା ତୋମାର ସାହାୟ କରିତେଛି ।”

বিনোদনী জোড়হাত করিয়া কহিল, ‘দোহাই তোমার, আর যা কর সাহায্য করিয়ো না।’

ମହେନ୍ଦ୍ର ଖାଇୟା ଉଠିୟା କହିଲ, ‘‘ବଟେ! ଆମାକେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଠାଓରାଇୟାଛ ! ଆଚ୍ଛା, ଆଜ ଆମାର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ !’’ ବଲିୟା କାପଡ ଭାଙ୍ଗ କରିବାର ବଥା ଚେଷ୍ଟା କରିତେ ଲାଗିଲ ।

বিনোদনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল, “ওগো মশায়, তুমি রাখো, আমার কাজ
বাড়াইয়ো না।”

মহেন্দ্র কহিল, ‘তবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিয়া শিক্ষালাভ করি।’ বলিয়া আলমারির সমুখে বিনোদনীর কাছে আসিয়া মাটিতে আসন করিয়া বসিল। বিনোদনী কাপড় ঝাড়িবার ছলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আচড়াইয়া কাপড়গুলি পরিপাটিপূর্বক ভাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

আজিকার মিলন এমনি করিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র প্রত্যুষ হইতে যেরূপ কল্পনা করিতেছিল, সেই অপূর্বতার কোনো লক্ষণই নাই। এরূপ ভাবে মিলন কাব্যে লিখিবার, সংগীতে গাহিবার, উপন্যাসে রচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তব মহেন্দ্র দণ্ডিত হইল না, বরঞ্চ একটু আরাম পাইল। তাহার কাল্পনিক

আদর্শকে কেমন করিয়া খাড়া করিয়া রাখিত, কিরূপ তাহার আয়োজন, কী কথা বলিত, কী ভাব প্রকাশ করিতে হইত, সকলপ্রকার সামান্যতাকে কী উপায়ে দূরে রাখিত, তাহা মহেন্দ্র ঠাওরাইতে পারিতেছিল না— এই কাপড় ঝাড়া ও ভাঁজ করার মধ্যে হসিতামাশা করিয়া সে যেন স্বরচিত একটা অসন্তুষ্ট দুর্ঘ আদর্শের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

এমন সময় রাজলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রকে কহিলেন, “মহিন, বউ কাপড় তুলিতেছে, তুই ওখানে বসিয়া কী করিতেছিস।”

বিনোদিনী কহিল, “দেখো তো পিসিমা মিছামিছি কেবল আমার কাজে দেরি করাইয়া দিতেছেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিলক্ষণ। আমি আরো ওঁর কাজে সাহায্য করিতেছিলাম।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার কপাল ! তুই আবার সাহায্য করিবি ! জান বউ, মহিনের বরাবর ঐরকম। চিরকাল মা- খুড়ির আদর পাইয়া ও যদি কোনো কাজ নিজের হাতে করিতে পারে।”

এই বলিয়া মাতা পরমশ্বেহে কর্মে- অপটু মহেন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। কেমন করিয়া এই অকর্মণ্য একান্ত মাত্রেহাপেক্ষী বয়স্ক সন্তানটিকে সর্বপ্রকার আরামে রাখিতে পারিবেন, বিনোদিনীর সহিত রাজলক্ষ্মীর সেই একমাত্র পরামর্শ। এই পুত্রসেবাব্যাপারে বিনোদিনীর প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি নিতান্ত নিশ্চিন্ত, পরম সুখী। সম্প্রতি বিনোদিনীর মর্যাদা যে মহেন্দ্র বুঝিয়াছে এবং বিনোদিনীকে রাখিবার জন্য তাহার যত্ন হইয়াছে, ইহাতেও রাজলক্ষ্মী আনন্দিত। মহেন্দ্রকে শুনাইয়া শুনাইয়া তিনি কহিলেন, ‘বউ, আজ তো তুমি মহিনের গরম কাপড় রোদে দিয়া তুলিলে, কাল মহিনের নৃতন রূমালগুলিতে উহার নামের অক্ষর সেলাই করিয়া দিতে হইবে। তোমাকে এখানে আনিয়া অবধি যত্ন- আদর করিতে পারিলাম না বাঢ়া, কেবল খাটাইয়া মারিলাম।’

বিনোদিনী কহিল, ‘পিসিমা, অমন করিয়া যদি বল তবে বুঝিব তুমি আমাকে পর ভাবিতেছ।’

রাজলক্ষ্মী আদর করিয়া কহিলেন, ‘আহা মা, তোমার মতো আপন আমি পাব কোথায়।’

বিনোদিনীর কাপড়- তোলা শেষ হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এখন কি তবে সেই চিনির রসটা চড়াইয়া দিব,
না,
এখন
তোমার অন্য কাজ আছে?”

বিনোদিনী কহিল, ‘না পিসিমা, অন্য কাজ আর কই। চলো, মিঠাইগুলি তৈরি করিয়া আসি গে।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘মা, এইমাত্র অনুত্তাপ করিতেছিলে উহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?’

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, ‘আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে যে কাজ করিতেই ভালোবাসে।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার হাতে কোনো কাজ নাই, ভাবিয়াছিলাম বালিকে লইয়া একটা বই পড়িব।’

বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, বেশ তো, আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনেই ঠাকুরপোর বই- পড়া শুনিতে আসিব— কী বল।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, ‘মহিন আমার নিতান্ত একলা পড়িয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা আবশ্যক।’ কহিলেন, ‘তা বেশ তো, মহিনের খাবার তৈরি শেষ করিয়া আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা পড়া শুনিতে আসিব। কী বলিস, মহিন।’

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া একবার দেখিয়া লইল। মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা।” কিন্তু তাহার আর উৎসাহ রহিল না। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে- সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র রাগ করিয়া ভাবিল, ‘আমিও আজ বাহির হইয়া যাইব— দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিব।’ বলিয়া তখনই বাহিরে যাইবার কাপড় পরিল। কিন্তু সংকল্প কাজে পরিণত হইল না। মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইল, সিঁড়ির দিকে অনেক বার চাহিল, শেষে ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল, ‘আমি আজ মিঠাই স্পর্শ না করিয়া মাকে জানাইয়া দিব, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চিনির রস জ্বাল দিলে তাহাতে মিষ্টত্ব থাকে না।’

আজ আহারের সময় বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানির ভয়ে প্রায় উপরে উঠিতে চান না, বিনোদিনী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছে। মহেন্দ্র অত্যন্ত গন্তব্য মুখে খাইতে বসিল।

বিনোদিনী কহিল, “ও কী ঠাকুরপো, আজ তুমি কিছুই খাইতেছ না যে !”

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া জিজাসা করিলেন, “কিছু অসুখ করে নাই তো?”

বিনোদিনী কহিল, “এত করিয়া মিঠাই করিলাম, কিছু মুখে দিতেই হইবে। ভালো হয় নি বুঝি? তবে থাক। না না, অনুরোধে পড়িয়া জোর করিয়া খাওয়া কিছু নয়। না না, কাজ নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, ‘ভালো মুশকিলেই ফেলিলে। মিঠাইটাই সব চেয়ে খাইবার ইচ্ছা, লাগিতেছেও ভালো, তুমি বাধা দিলে শুনিব কেন।’

দুইটি মিঠাই মহেন্দ্র নিঃশেষপূর্বক খাইল— তাহার একটি দানা, একটু গুঁড়া পর্যন্ত ফেলিল না। আহারান্তে তিন জনে মহেন্দ্রের শোবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। পড়িবার প্রস্তাবটা মহেন্দ্র আর তুলিল না।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘তুই যে কী বই পড়িবি বলিয়াছিলি, আরস্ত কর্- না।’

মহেন্দ্র কহিল, “কিন্তু তাহাতে ঠাকুর- দেবতার কথা কিছুই নাই, তোমার শুনিতে ভালো লাগিবে না।”

ভালো লাগিবে না ! যেমন করিয়া হোক, ভালো লাগিবার জন্য রাজলক্ষ্মী কৃতসংকল্প। মহেন্দ্র যদি তুর্কি ভাষাও পড়ে, তাঁহার ভালো লাগিতেই হইবে। আহা বেচারা মহিন, বউ কাশী গেছে, একলা পড়িয়া আছে— তাহার যা ভালো লাগিবে মাতার তাহার ভালো না লাগিলে চলিবে কেন।

বিনোদিনী কহিল, “এক কাজ করো- না ঠাকুরপো, পিসিমার ঘরে বাংলা শাস্তি- শতক আছে, অন্য বই রাখিয়া আজ সেইটে পড়িয়া শোনাও- না। পিসিমারও ভালো লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভালো।”

মহেন্দ্র নিতান্ত কর্ণভাবে একবার বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় বি আসিয়া খবর দিল, “মা, কায়েত- ঠাকুরণ আসিয়া তোমার ঘরে বসিয়া আছেন।”

কায়েত- ঠাকুরণ রাজলক্ষ্মীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পর তাহার সঙ্গে গল্প করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু বিকে বলিলেন, “কায়েত- ঠাকুরণকে বল, আজ মহিনের ঘরে আমার একটু কাজ আছে, কাল তিনি যেন অবশ্য- অবশ্য করিয়া আসেন।”

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, “কেন মা, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াই এসো- না।”

বিনোদিনী কহিল, “কাজ কী পিসিমা, তুমি এখানে থাকো, আমি বরঞ্চ কায়েত- ঠাকুরণের কাছে গিয়া বসি গে।”

রাজলক্ষ্মী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, “বউ, তুমি ততক্ষণ এখানে বোসো- দেখি, যদি কায়েত- ঠাকুরণকে বিদায় করিয়া আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিয়া দাও- আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো না।”

রাজলক্ষ্মী ঘরের বাহির হইবামাত্র মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না- বলিয়া উঠিল, “কেন তুমি আমাকে ইচ্ছা করিয়া এমন করিয়া মিহামিছি পীড়ন কর।”

বিনোদিনী যেন আশ্চর্য হইয়া কহিল, “সে কী, ভাই ! আমি তোমাকে পীড়ন কী করিলাম। তবে কি তোমার ঘরে আসা আমার দোষ হইয়াছে। কাজ নাই, আমি যাই।” বলিয়া বিমর্শমুখে উঠিবার উপক্রম করিল।

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, “আমনি করিয়াই তো তুমি আমাকে দন্ধ কর।”

বিনোদিনী কহিল, “ইস, আমার যে এত তেজ, তাহা তো আমি জানিতাম না। তোমারও তো প্রাণ কঠিন কম নয়, অনেক সহ্য করিতে পার। খুব যে ঝলসিয়া- পুড়িয়া গেছ, চেহারা দেখিয়া তাহা কিছু বুঝিবার জো নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “চেহারায় কী বুঝিবে।” বলিয়া বিনোদিনীর হাত বলপূর্বক লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিনোদিনী “উঃ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, “লাগিল কি।”

দেখিল, কাল বিনোদিনীর হাতের যেখানটা কাটিয়া গিয়াছিল, সেইখান দিয়া আবার রক্ত পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র অনুতঙ্গ হইয়া কহিল, “আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম- ভারি অন্যায় করিয়াছি। আজ কিন্ত এখনই তোমার ও- জায়গাটা বাঁধিয়া ওষুধ লাগাইয়া দিব- কিছুতেই ছাড়িব না।”

বিনোদিনী কহিল, “না, ও কিছুই না। আমি ওষুধ দিব না।”

মহেন্দ্র কহিল, “কেন দিবে না।”

বিনোদিনী কহিল, “কেন আবার কী। তোমার আর ডাঙ্গারি করিতে হইবে না, ও যেমন আছে থাক্।”

মহেন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে গন্তীর হইয়া গেল— মনে মনে কহিল, “কিছুই বুঝিবার জো নাই। স্ত্রীগোকের মন !”

বিনোদিনী উঠিল। অভিমানী মহেন্দ্র বাধা না দিয়া কহিল, ‘কোথায় যাইতেছ।’

বিনোদিনী কহিল, ‘কাজ আছে।’ বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক বসিয়াই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্রুত উঠিয়া পড়িল; সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া একলা ছাদে বেড়াইতে লাগিল।

বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণও করে, অথচ বিনোদিনী এক মুহূর্ত কাছে আসিতেও দেয় না। অন্যে তাহাকে জিনিতে পারে না, এ গর্ব মহেন্দ্রের ছিল, তাহা সে সম্প্রতি বিসর্জন দিয়াচ্ছে— কিন্তু চেষ্টা করিলেই অন্যকে সে জানিতে পারে, এ গর্বটুকুও কি রাখিতে পারিবে না। আজ সে হার মানিল, অথচ হার মানাইতে পারিল না। হৃদয়ক্ষেত্রে মহেন্দ্রের মাথা বড়ো উচ্চেই ছিল— সে কাহাকেও আপনার সমকক্ষ বলিয়া জানিত না— আজ সেইখানেই তাহাকে ধুলায় মাথা লুটাইতে হইল। যে শ্রেষ্ঠতা হারাইল তাহার বদলে কিছু পাইলও না। ভিক্ষুকের মতো রূদ্ধ দ্বারের সমূখে সন্ধ্যার সময় রিঞ্চহন্তে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

ফাল্গুন- চৈত্রমাসে বিহারীদের জমিদারি হইতে সরষে- ফুলের মধু আসিত, প্রতি বৎসরই সে তাহা রাজলক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিত— এবারও পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী মধুভাণ্ড লইয়া স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল, ‘পিসিমা, বিহারী- ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াচ্ছেন।’

রাজলক্ষ্মী তাহা ভাঁড়ারে তুলিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। বিনোদিনী মধু তুলিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে বসিল। কহিল, ‘বিহারী- ঠাকুরপো কখনো তোমাদের তত্ত্ব লইতে ভোলেন না। বেচারার নিজের মা নাই নাকি, তাই তোমাকেই মার মতো দেখেন।’

বিহারীকে রাজলক্ষ্মী এমনি মহেন্দ্রের ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেষ- কিছু ভাবিতেন না— সে তাঁহাদের বিনা- মূল্যের বিনা- যত্নের বিনা- চিন্তার অনুগত লোক ছিল। বিনোদিনী যখন রাজলক্ষ্মীকে মাতৃহীন বিহারীর মাতৃস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় অকস্মাত স্পর্শ করিল। হঠাৎ মনে হইল, ‘তা বটে, বিহারীর মা নাই এবং আমাকেই সে মার মতো দেখে।’ মনে পড়িল, রোগে তাপে সংকটে বিহারী বরাবর বিনা আহ্বানে, বিনা আড়ম্বরে তাঁহাকে নিঃশব্দ নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াচ্ছে; রাজলক্ষ্মী তাহা নিশ্চাসপ্রশ্বাসের মতো সহজে গ্রহণ করিয়াচ্ছেন এবং সেজন্য কাহারো কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু বিহারীর খোঁজখবর কে রাখিয়াচ্ছে। যখন অন্নপূর্ণা ছিলেন তিনি রাখিতেন বটে— রোজলক্ষ্মী ভাবিতেন, ‘বিহারীকে বশে রাখিবার জন্য অন্নপূর্ণা স্নেহের আড়ম্বর করিতেছেন।’

রাজলক্ষ্মী আজ নিশ্চাস ফেলিয়া কহিলেন, “বিহারী আমার আপন ছেলের মতোই বটে।”

বলিয়াই মনে উদয় হইল, বিহারী তাঁহার আপন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি করে— এবং কখনো বিশেষ কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি সে ভক্তি স্থির রাখিয়াছে। ইহা তাবিয়া তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্চাস পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো তোমার হাতের রান্না খাইতে বড়ো ভালোবাসেন।”

রাজলক্ষ্মী সন্নেহগর্বে কহিলেন, “আর- কারোও মাছের বোল তাহার মুখে রোচে না।”

বলিতে বলিতে মনে পড়িল, অনেক দিন বিহারী আসে নাই। কহিলেন, “আচ্ছা বউ, বিহারীকে আজকাল দেখিতে পাই না কেন।”

বিনোদিনী কহিল, “আমিও তো তাই ভাবিতেছিলাম, পিসিমা। তা, তোমার ছেলেটি বিবাহের পর হইতে নিজের বউকে লইয়াই এমনি মাতিয়া রহিয়াছে— বন্ধুবন্ধুবরা আসিয়া আর কী করিবে বলো।”

কথাটা রাজলক্ষ্মীর অত্যন্ত সংগত বোধ হইল। স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দূর করিয়াছে। বিহারীর তো অভিমান হইতেই পারে— কেন সে আসিবে। বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজলক্ষ্মীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা হইতে একান্ত নিঃস্বার্থভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার জন্য কতবার কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন— ছেলের উপর তাঁহার নিজের যা নালিশ তা বিহারীর বিবরণ দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। দুদিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে ন্যায়ধর্ম আর রাখিল কোথায়।

বিনোদিনী কহিল, “কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারী- ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও, তিনি খুশি হইবেন।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিনকে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।”

বিনোদিনী। না পিসিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ করো।

রাজলক্ষ্মী। আমি কি তোমাদের মতো লিখিতে পড়িতে জানি।

বিনোদিনী। তা হোক, তোমার হইয়া নাহয় আমিই লিখিয়া পাঠাইল।

রবিবার দিন মহেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্বরাত্রি হইতেই তাহার কল্পনা উদ্বাম হইয়া থাকে, যদিও এ পর্যন্ত তাহার কল্পনার অনুরূপ কিছুই হয় নাই— তবু রবিবারের ভোরের আলো তাহার চক্ষে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। জাগ্রত নগরীর সমস্ত কোলাহল তাহার কানে অপরূপ সংগীতের মতো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্তু ব্যাপারখনা কী। মার আজ কোনো ভ্রত আছে নাকি! অন্যদিনের মতো বিনোদিনীর প্রতি গৃহকর্মের ভার দিয়া তিনি তো বিশ্রাম করিতেছেন না। আজ তিনি নিজেই ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই হাঙ্গামে দশটা বাজিয়া গেল— ইতিমধ্যে মহেন্দ্র কোনো ছুতায় বিনোদিনীর সঙ্গে এক মুহূর্ত বিরলে দেখা করিতে পারিল না। বই পড়িতে চেষ্টা করিল, পড়ায় কিছুতেই মন বসিল না— খবরের কাগজের একটা অনাবশ্যক বিজ্ঞাপনে পনেরো মিনিট দৃষ্টি আবন্ধ হইয়া রাখিল। আর থাকিতে পারিল না। নীচে গিয়া দেখিল, মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটা তোলা উনানে রাঁধিতেছেন এবং বিনোদিনী কাটিদেশে দৃঢ় করিয়া আঁচল জড়াইয়া জোগান দিতে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ‘আজ তোমাদের ব্যাপারটা কী। এত ধূমধাম যে!’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘বউ তোমাকে বলে নাই? আজ যে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।’

বিহারীকে নিমন্ত্রণ! মহেন্দ্রের সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, ‘কিন্তু মা, আমি তো থাকিতে পারিব না।’

রাজলক্ষ্মী। কেন।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী। খাওয়াদাওয়া করিয়া যাস, বেশি দেরি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে।

বিনোদিনী মুহূর্তের জন্য মহেন্দ্রের মুখে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, “যদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হইলে উনি যান- না, পিসিমা। নাহয় আজ বিহারী- ঠাকুরপো একলাই থাইবেন।”

কিন্তু নিজের হাতের যত্নের রান্না মহিনকে খাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলক্ষ্মীর সহিতে কেন। তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন ততই বাঁকিয়া দাঁড়াইল। ‘অত্যন্ত জরুরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবার জো নাই— বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল’ ইত্যাদি।

রাগ করিয়া মহেন্দ্র এইরপে মাকে শান্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষ্মীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রান্না ফেলিয়া তিনি চলিয়া যান। বিনোদিনী কহিল, ‘পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিয়ো না— ঠাকুরপো মুখে আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু আজ উহার বাহিরে নিমন্ত্রণে যাওয়া হইতেছে না।’

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ‘না বাছা, তুমি মহিনকে জান না, ও যা একবার ধরে তা কিছুতেই ছাড়ে না।’

কিন্তু বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল। মহেন্দ্র বুঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইয়াছে। ইহাতে তাহার হন্দয় দৰ্শায় যতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে দূরে যাওয়া কঠিন হইল। বিহারী কী করে, বিনোদিনী কী করে, তাহা না দেখিয়া সে বাঁচিবে কী করিয়া। দেখিয়া জ্বলিতে হইবে, কিন্তু দেখাও চাই।

বিহারী আজ অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত- আত্মীয়ভাবে মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে যে ঘর তাহার পরিচিত এবং যেখানে সে ঘরের ছেলের মতো অবারিতভাবে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া মুহূর্তের জন্য সে থমকিয়া দাঁড়াইল- একটা অশ্রুতরঙ্গ পলকের মধ্যে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিবার জন্য তাহার বক্ষকবাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংবরণ করিয়া লইয়া সে সিতাহাস্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া সদ্যঃশ্নাতা রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইল। বিহারী যখন সর্বদা যাতায়াত করিত তখন এরূপ অভিবাদন তাহাদের প্রথা ছিল না। আজ যেন সে বহুর প্রবাস হইতে পুনর্বার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিহারী প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় রাজলক্ষ্মী সন্মেহে তাহার মাথায় হস্তস্পর্শ করিলেন।

রাজলক্ষ্মী আজ নিগৃঢ় সহানুভূতিবশত বিহারীর প্রতি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি আদর ও সন্মেহ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, “ও বেহারি, তুই এতদিন আসিস নাই কেন। আমি রোজ মনে করিতাম, আজ নিশ্চয় বেহারি আসিবে, কিন্তু তোর আর দেখা নাই।”

বিহারী হাসিয়া কহিল, “রোজ আসিলে তো তোমার বিহারীকে রোজ মনে করিতে না, মা। মহিনদা কোথায়।”

রাজলক্ষ্মী বিমর্শ হইয়া কহিলেন, “মহিনের আজ কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, সে আজ কিছুতেই থাকিতে পারিল না।”

শুনিবামাত্র বিহারীর মনটা বিকল হইয়া গেল। আশৈশব প্রণয়ের শেষ এই পরিণাম? একটা দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া মন হইতে সমস্ত বিষাদবাস্প উপস্থিতমত তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “আজ কী রান্না হইয়াছে শুনি।” বলিয়া তাহার নিজের প্রিয় ব্যঙ্গনগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর রঞ্জনের দিন বিহারী কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বর করিয়া নিজেকে লুক্ষ বলিয়া পরিচয় দিত- আহারলোলুপতা দেখাইয়া বিহারী মাত্তহৃদয়শালিনী রাজলক্ষ্মীর সন্মেহ কাড়িয়া লইত। আজও তাহার স্বরচিত ব্যঙ্গন সম্বন্ধে বিহারীর অতিমাত্রায় কৌতুহল দেখিয়া, রাজলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে তাহার লোভাতুর অতিথিকে আশ্বাস দিলেন।

এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া বিহারীকে শুক্ষম্বরে দস্তরমত জিজ্ঞাসা করিল, “কী বিহারী, কেমন আছ।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কই মহিন, তুই তোর নিমন্ত্রণে গেলি না?”

মহেন্দ্র লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, “না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে।”

স্নান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী যখন দেখা দিল, তখন বিহারী প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল না। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের যে- দৃশ্য সে দেখিয়াছিল, তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদূরে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “কী ঠাকুরপো, একেবারে চিনিতেই পার না নাকি।”

বিহারী কহিল, “সকলকেই কি চেনা যায়।”

বিনোদিনী কহিল, “একটু বিবেচনা থাকিলেই যায়।” বলিয়া খবর দিল, “পিসিমা, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে।”

মহেন্দ্র- বিহারী খাইতে বসিল; রাজলক্ষ্মী অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বিনোদিনী পরিবেশন করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের খাওয়ার মনোযোগ ছিল না, সে কেবল পরিবেশনে পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মনে হইল, বিহারীকে পরিবেশন করিয়া বিনোদিনী যেন একটা বিশেষ সুখ পাইতেছে। বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মুড়া ও দধির সর পড়িল, তাহার উভয় কৈফিয়ত ছিল— মহেন্দ্র ঘরের ছেলে, বিহারী নিমন্ত্রিত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া নালিশ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরো বেশি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সন্ধানে তপসিমাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল, ‘‘না না, মহিন্দাকে দাও, মহিন্দা ভালোবাসে।’’ মহেন্দ্র তীব্র অভিমানে বলিয়া উঠিল, ‘‘না না, আমি চাই না।’’ শুনিয়া বিনোদিনী দ্বিতীয় বার অনুরোধ মাত্র না করিয়া সে- মাছ বিহারীর পাতে ফেলিয়া দিল।

আহারান্তে দুই বঙ্গ উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিলে বিনোদিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, ‘‘বিহারী ঠাকুরপো, এখনই যাইয়ো না, উপরের ঘরে একটু বসিবে চলো।’’

বিহারী কহিল, ‘‘তুমি খাইতে যাইবে না?’’

বিনোদিনী কহিল, ‘‘না, আজ একাদশী।’’

নিষ্ঠুর বিন্দুপের একটি সূক্ষ্ম হাস্যরেখা বিহারীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল— তাহার অর্থ এই যে, একাদশী- করাও আছে। অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই।

সেই হাস্যের আভাসটুকু বিনোদিনীর দ্রষ্টি এড়ায় নাই— তবু সে যেমন তাহার হাতের কাটা ঘা সহ্য করিয়াছিল; তেমনি করিয়া ইহাও সহ্য করিল। নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল, ‘‘আমার মাথা খাও, একবার বসিবে চলো।’’

মহেন্দ্র হঠাৎ অসংগতভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ‘‘তোমাদের কিছুই তো বিবেচনা নাই— কাজ থাক কর্ম থাক, ইচ্ছা থাক বা না থাক, তবু বসিতেই হইবে। এত অধিক আদরের আমি তো কোনো মানে বুঝিতে পারি না।’’

বিনোদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, ‘‘বিহারী- ঠাকুরপো, শোনো একবার, তোমার মহিন্দার কথা শোনো। আদরের মানে আদর, অভিধানে তাহার আর কোনো দ্বিতীয় মানে লেখে না।’’ (মহেন্দ্রের প্রতি) ‘‘যাই বল ঠাকুরপো, অধিক আদরের মানে শিশুকাল হইতে তুমি যত পরিষ্কার বোঝ, এমন আর কেহ বোঝে না।’’

বিহারী কহিল, ‘‘মহিন্দা, একটা কথা আছে, একবার শুনিয়া যাও।’’ বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে কোনো বিদ্যায়সন্তানণ না করিয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে গেল। বিনোদিনী বারান্দার রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শূন্য উঠানের শূন্যতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিহারী বাহিরে আসিয়া কহিল, ‘‘মহিন্দা, আমি জানিতে চাই, এইখানে কি আমাদের বন্ধুত্ব শেষ হইল।’’

মহেন্দ্রের বুকের ভিতর তখন জুলিতেছিল, বিনোদিনীর পরিহাস- হাস্য বিদ্যৃৎশিখার মতো তাহার মন্তিকের এক প্রান্ত হইতে আর- এক প্রান্ত বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া বিধিতেছিল- সে কহিল, “মিটমাট হইলে তোমার তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তাহা প্রার্থনীয় বোধ হয় না। আমার সংসারের মধ্যে আমি বাহিরের লোক চুকাইতে চাই না- অন্তঃপুরকে আমি অন্তঃপুর রাখিতে চাই।”

বিহারী কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ঈর্ষাজর্জর মহেন্দ্র একবার প্রতিজ্ঞা করিল, ‘বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিব না’- তাহার পরে বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় ঘরে- বাহিরে, উপরে- নীচে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অধ্যায় - ৩০

আশা একদিন অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা মাসিমা, মেসোমশায়কে তোমার মনে পড়ে?’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘আমি এগারো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছি, স্বামীর মূর্তি ছায়ার মতো মনে হয়।’

আশা জিজ্ঞাসা করিল, ‘মাসি, তবে তুমি কাহার কথা ভাব’।

অন্নপূর্ণা দুষৎ হাসিয়া কহিলেন, ‘আমার স্বামী এখন যাঁহার মধ্যে আছেন, সেই ভগবানের কথা ভাবি।’

আশা কহিল, ‘তাহাতে তুমি সুখ পাও?’

অন্নপূর্ণা সন্নেহে আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, ‘আমার সে মনের কথা তুই কি বুঝবি বাচ্চা। সে আমার মন জানে, আর যাঁর কথা ভাবি তিনিই জানেন।’

আশা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘আমি যাঁর কথা রাত্রিদিন ভাবি, তিনি কি আমার মনের কথা জানেন না। আমি ভালো করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া তিনি কেন আমাকে চিঠি লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন।’

আশা কয়দিন মহেন্দ্রের চিঠি পায় নাই। নিশাস ফেলিয়া মনে মনে সে ভাবিল, ‘চোখের বালি যদি হাতের কাছে থাকিত, সে আমার মনের কথা ঠিকমতো করিয়া লিখিয়া দিতে পারিত।’

কুলিখিত তুচ্ছপত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে কিছুতে আশার হাত সরিত না। যতই যত্ন করিয়া লিখিতে চাহিত, ততই তাহার অক্ষর খারাপ হইয়া যাইত। মনের কথা যতই ভালো করিয়া গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিত ততই তাহার পদ কোনোমতেই সম্পূর্ণ হইত না। যদি একটিমাত্র ‘শ্রীচরণেন্দ্ৰ’ লিখিয়া নাম সহি করিলেই মহেন্দ্র অস্তর্যামী দেবতার মতো সকল কথা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলেই আশা চিঠিলেখা সার্থক হইত। বিধাতা এতখানি ভালোবাসা দিয়াছিলেন, একটুখানি ভাষা দেন নাই কেন।

মন্দিরে সন্ধ্যারতির পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আশা অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দের পর বলিল, ‘মাসি, তুমি যে বল, স্বামীকে দেবতার মতো করিয়া সেবা করা স্তুর ধর্ম, কিন্তু যে স্তুর মূর্খ, যাহার বুদ্ধি নাই, কেমন করিয়া স্বামীর সেবা করিতে হয় যে জানে না, সে কী করিবে।’

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ আশার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন— একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “বাছা আমিও তো মূর্খ, তবুও তো ভগবানের সেবা করিয়া থাকি।”

আশা কহিল, “তিনি যে তোমার মন জানেন, তাই খুশি হন। কিন্তু মনে করো, স্বামী যদি মুখের সেবায় খুশি না হন?”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সকলকে খুশি করিবার শক্তি সকলের থাকে না, বাছা। স্বীয় যদি আত্মিক শ্রদ্ধাভক্তিযত্ত্বের সঙ্গে স্বামীর সেবা ও সংসারের কাজ করে, তবে স্বামী তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেও স্বয়ং জগদীশ্বর তাহা কুড়াইয়া লন।”

আশা নিরূপেরে চুপ করিয়া রহিল। মাসির এই কথা হইতে সান্ত্বনা গ্রহণের অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামী যাহাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিবেন, জগদীশ্বরও যে তাহাকে সার্থকতা দিতে পারিবেন, এ কথা কিছুতেই তাহার মনে হইল না। সে নতমুখে বসিয়া তাহার মাসির পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা তখন আশার হাত ধরিয়া তাহাকে আরো কাছে টানিয়া লইলেন; তাহার মস্তক চুম্বন করিলেন; রংন্দরকষ্ঠকে দৃঢ়চেষ্টায় বাধামুক্ত করিয়া কহিলেন, “চুনি, দুঃখে কষ্টে যে শিক্ষালাভ হয় শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর এই মাসিও একদিন তোর বয়সে তোরই মতো সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনাপাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জনিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেষ্টা করিব, সে আমার চেষ্টাকে ভালো বলিয়া না বুঝিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম, সেরূপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ্য হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে— সেইদিনই সংসার ত্যগ করিয়া আসিলাম। আজ দেখিতেছি, আমার কিছুই নিষ্কল হয় নাই। ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনাপাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার- হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে কথা স্মীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম বলিয়া সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত।”

আশা বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত অনেক কথা ভাবিল, তবু ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পুণ্যবতী মাসির প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল, সেই মাসির কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও একপ্রকার শিরোধার্য করিয়া লইল। মাসি সকল সংসারের উপরে যাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্ধকারে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল, ‘আমি বালিকা, তোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্বামীকে জানি, সেজন্য অপরাধ লইয়ো না। আমার স্বামীকে আমি যে পূজা দিই, ভগবান, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো। তিনি যদি তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেন, তবে আর বাঁচিব না। আমি আমার মাসিমার মতো পুণ্যবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।’ এই বলিয়া আশা বার বার বিছানার উপর গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আশার জেঠামশায়ের ফিরিবার সময় হইল। বিদায়ের পূর্বসন্ধ্যায় অন্নপূর্ণা আশাকে আপনার কোলে বসাইয়া কহিলেন, “চুনি, মা আমার, সংসারের শোক- দুঃখ- অঙ্গস্ত হইতে তোকে সর্বদা রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই উপদেশ, যেখান থেকে যত কষ্টই পাস, তোর বিশ্বাস তোর ভক্তি স্থির রাখিস, তোর ধর্ম যেন অটল থাকে।”

আশা তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, “আশীর্বাদ করো মাসিমা, তাই হইবে।”

অধ্যায় - ৩১

আশা ফিরিয়া আসিল। বিনোদিনী তাহার 'পরে খুব অভিমান করিল—'বালি, এতদিন বিদেশে রহিলে, একখনাচি লিখিতে নাই?"

আশা কহিল, 'তুমই কোন্তে লিখিলে ভাই, বালি।'

বিনোদিনী। আমি কেন প্রথমে লিখিব। তোমারই তো লিখিবার কথা।

আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। কহিল, 'জান তো ভাই, আমি ভালো লিখিতে জানি না। বিশেষ, তোমার মতো পণ্ডিতের কাছে লিখিতে আমার লজ্জা করে।'

দেখিতে দেখিতে দুই জনের বিবাদ মিটিয়া গিয়া প্রণয় উদ্বেগিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, 'দিনরাত্রি সঙ্গ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে খারাপ করিয়া দিয়াছ। একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না।'

আশা। সেইজন্যই তো তোমার উপরে ভার দিয়া গিয়াছিলাম। কেমন করিয়া সঙ্গ দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভালো জান।

বিনোদিনী। দিনটা তো একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনোমতেই ছাড়াচুড়ি নাই— গল্প করিতে হইবে, বই পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই।

আশা। কেমন জর্দ ! লোকের মন ভুলাইতে যখন পার তখন লোকেই বা ছাড়িবে কেন।

বিনোদিনী। সাবধান থাকিস, ভাই। ঠাকুরপো যেরকম বাড়াবাড়ি করেন, এক- একবার সন্দেহ হয়, বুঝি বশ করিবার বিদ্যা জানি বা।

আশা হাসিয়া কহিল, 'তুমি জান না তো কে জানে। তোমার বিদ্যা আমি একটুখানি পাইলে বাঁচিয়া যাইতাম।'

বিনোদিনী। কেন, কার সর্বনাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ঘরে যেটি আছে, সেইটিকে রক্ষা কর, পরকে ভোলাইবার চেষ্টা করিস নে ভাই বালি। বড়ো ল্যাঠা।

আশা বিনোদিনীকে হস্তদ্বারা তর্জন করিয়া বলিল, 'আঃ, কী বকিস, তার ঠিক নেই।'

কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই মহেন্দ্র কহিল, 'তোমার শরীর বেশ ভালো ছিল দেখিতেছি, দিব্য মোটা হইয়া আসিয়াছ।'

আশা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল। কোনোমতেই তাহার শরীর ভালো থাকা উচিত ছিল না— কিন্তু মৃঢ় আশাৰ কিছুই ঠিকমত চলে না; তাহার মন যখন এত খারাপ ছিল, তখনো তাহার পোড়া শরীর মোটা হইয়া

উঠিয়াছিল, একে তো মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কথা জোটে না, তাহাতে আবার শরীরটা ও উলটা বলিতে থাকে।

আশা মনুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কেমন ছিলে ।”

আগে হইলে মহেন্দ্র কতক ঠাট্টা, কতক মনের সঙ্গে বলিত, “মরিয়া ছিলাম ।” এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিল না, গলার কাছে আসিয়া বাধিয়া গেল। কহিল, “বেশ ছিলাম, মন্দ ছিলাম না ।”

আশা চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র পূর্বের চেয়ে যেন রোগাই হইয়াছে— তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চোখে একপ্রকার তীব্র দীপ্তি। একটা যেন আভ্যন্তরিক ক্ষুধায় তাহাকে অগ্নিজিহ্বা দিয়া লেহন করিয়া খাইতেছে। আশা মনে মনে ব্যথা অনুভব করিয়া ভাবিল, ‘আহা, আমার স্বামী ভালো ছিলেন না, কেন আমি উঁহাকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গেলাম ।’ স্বামী রোগা হইলেন, অথচ নিজে মোটা হইল, ইহাতেও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আশার অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র আর কী কথা তুলিবে ভাবিতে খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কাকীমা ভালো আছেন তো?’

সে প্রশ্নের উত্তরে কৃশ্ণ-সংবাদ পাইয়া তাহার আর দ্বিতীয় কথা মনে আনা দুঃসাধ্য হইল। কাছে একটা ছিন্ন পুরাতন খবরের কাগজ ছিল, সেইটে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে পড়িতে লাগিল। আশা মুখ নিচু করিয়া ভাবিতে লাগিল, ‘এতদিন পরে দেখা হইল, কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কেন ভালো করিয়া কথা কহিলেন না, এমন- কি, আমার মুখের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন- চার দিন চিঠি লিখিতে পারি নাই বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন, আমি মাসির অনুরোধে বেশি দিন কাশীতে ছিলাম বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন।’ অপরাধ কোন্ ছিদ্র দিয়া কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাই সে নিতান্ত ক্লিষ্টহৃদয়ে সন্দান করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিল। অপরাহ্নে জলপানের সময় রাজলক্ষ্মী ছিলেন, আশা ও ঘোমটা দিয়া অদূরে দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেহই ছিল না।

রাজলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কি তোর অসুখ করিয়াছে মহিন ।”

মহেন্দ্র বিরক্তভাবে কহিল, ‘না মা, অসুখ কেন করবে ।’

রাজলক্ষ্মী। তবে তুই যে কিছু খাইতেছিস না!

মহেন্দ্র পুনর্বার উত্ত্বক্ষেত্রে কহিল, “এই তো, খাচ্ছ না তো কী ।”

মহেন্দ্র গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একখানা পাতলা চাদর গায়ে ছাদের এধারে ওধারে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড়ো আশা ছিল, তাহাদের নিয়মিত পড়াটা আজ ক্ষান্ত থাকিবে না। আনন্দমঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর গুটি দুই- তিন অধ্যায় বাকি আছে মাত্র। বিনোদিনী যত নিষ্ঠুর হোক সে- কয়টা অধ্যায় আজ তাহাকে নিশ্চয় শুনাইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গুরুভার নৈরাশ্য বহিয়া মহেন্দ্রকে শুইতে যাইতে হইল।

সজ্জিত লজ্জান্বিত আশা ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিছানায় মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়াছে। তখন, কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। বিছেদের পর কিছুক্ষণ একটা নৃতন লজ্জা আসে— যেখানটিতে ছাড়িয়া যাওয়া যায় ঠিক সেইখানটিতে মিলিবার পূর্বে পরম্পর পরম্পরের নিকট হইতে নৃতন সন্তোষগের প্রত্যাশা করে। আশা তাহার সেই চিরপরিচিত আনন্দশয্যাটিতে আজ অনাহুত কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে। দ্বারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল— মহেন্দ্রের কোনো সাড়া পাইল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যদি অস্তর্কে দৈবাং কোনো গহনা বাজিয়া উঠে তো সে লজ্জায় মরিয়া যায়। কম্পিতহৃদয়ে আশা মশারির কাছে আসিয়া অনুভব করিল, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছে। তখন তাহার নিজের সাজসজ্জা তাহাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিদ্যুদ্বেগে এ ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য কোথাও গিয়া শোয়।

আশা যথাসাধ্য নিঃশব্দে সংকুচিত হইয়া খাটের উপর গিয়া উঠিল। তবু তাহাতে এতটুকু শব্দ ও নড়াচড়া হইল যে, মহেন্দ্র যদি সত্যই ঘুমাইত, তাহা হইলে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার চক্ষু খুলিল না, কেননা, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছিল না। মহেন্দ্র খাটের অপর প্রান্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, সুতরাং আশা তাহার পশ্চাতে শুইয়া রহিল। আশা যে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছিল, তাহা পিছন ফিরিয়াও মহেন্দ্র স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল। নিজের নিষ্ঠুরতায় তাহার হৎপিণ্ডটাকে যেন জাঁতার মতো পেষণ করিয়া ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু কী কথা বলিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে, মহেন্দ্র তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না; মনে মনে নিজেকে সৃতীত্ব কশাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে আঘাত পাইল, কিন্তু উপায় পাইল না। ভাবিল, ‘প্রাতঃকালে তো ঘুমের ভান করা যাইবে না, তখন মুখোমুখি হইলে আশাকে কী কথা বলিব।’

আশা নিজেই মহেন্দ্রের সে সংকট দূর করিয়া দিল। সে অতি প্রত্যমেই অপমানিত সাজসজ্জা লইয়া বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে- ও মহেন্দ্রকে মুখ দেখাইতে পারিল না।

অধ্যায় - ৩২

আশা ভাবিতে লাগিল, ‘এমন কেন হইল। আমি কী করিয়াছি।’ যে জায়গায় যথার্থ বিপদ, সে জায়গায় তাহার চোখ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালোবাসিতে পারে, এ সন্তানাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তা ছাড়া বিবাহের অন্তিকালে পর হইতে সে মহেন্দ্রকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেন্দ্র যে তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতেও আসে নাই।

মহেন্দ্র আজ সকাল সকাল কালেজে গেল। কালেজযাত্রাকালে আশা বরাবর জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং মহেন্দ্র গাড়ি হইতেই একবার মুখ তুলিয়া দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্য প্রথা ছিল। সেই অভ্যাস অনুসারে গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র যন্ত্রচালিতের মতো আশা জানলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রও অভ্যাসের খাতিরে একবার চকিতের মতো উপরে চোখ তুলিল; দেখিল, আশা দাঁড়াইয়া আছে— তখনে তাহার জ্ঞান হয় নাই, মলিন বস্ত্র, অসংযত কেশ, শুক্ষ মুখ— দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই মহেন্দ্র চোখ নামাইয়া কোলের বই দেখিতে লাগিল। কোথায় চোখে চোখে সেই নীরব সন্দৰ্ভ, সেই ভাষাপূর্ণ হাসি!

গাড়ি চলিয়া গেল; আশা সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। প্রথিবী সংসার সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল। কলিকাতার কর্মপ্রবাহে তখন জোয়ার আসিবার সময়। সাড়ে দশটা বাজিয়াছে— আপিসের গাড়ির বিরাম নাই, ট্রামের পশ্চাতে ট্রাম চুটিতেছে— সেই ব্যস্ততাবেগবান কর্মকল্লোলের অদূরে এই একটি বেদনাস্তিত মুহূর্মান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

হঠাতে এক সময় আশার মনে হইল, ‘বুবিয়াছি। ঠাকুরপো কাশী গিয়াছিলেন, সেই খবর পাইয়া উনি রাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে আর তো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু আমার তাহাতে কী দোষ ছিল।’

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাত এক মুহূর্তের জন্য যেন আশার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। হঠাতে তাহার আশঙ্কা হইল, মহেন্দ্র বুঝি সন্দেহ করিয়াছেন, বিহারীর কাশী যাওয়ার সঙ্গে আশারও কোনো যোগ আছে। দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই কাজ। ছি ছি ছি। এমন সন্দেহ! কী লজ্জা! একে তো বিহারীর সঙ্গে তাহার নাম জড়িত হইয়া ধিক্কারের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার উপরে মহেন্দ্র যদি এমন সন্দেহ করে, তবে তো আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোনো সন্দেহের কারণ হয়, যদি কোনো অপরাধ ঘটিয়া থাকে, মহেন্দ্র কেন স্পষ্ট করিয়া বলে না— বিচার করিয়া তাহার উপযুক্ত দণ্ড কেন না দেয়। মহেন্দ্র খোলসা কোনো কথা না বলিয়া কেবলই আশাকে যেন এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাই আশার বার বার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের মনে এমন কোনো সন্দেহ আসিয়াছে, যাহা নিজেই সে অন্যায় বলিয়া জানে, যাহা সে আশার কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছে। নহিলে এমন অপরাধীর মতো তাহার চেহারা হইবে কেন। ক্রুদ্ধ বিচারকের তো এমন কৃষ্ণিত ভাব হইবার কথা নহে।

মহেন্দ্র গাড়ি হইতে চকিতের মতো সেই- যে আশার ম্লান করণ মুখ দেখিয়া গেল, তাহা সমস্ত দিনে সে মন হইতে মুছিতে পারিল না। কালেজের লেকচারের মধ্যে, শ্রেণীবন্ধ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে, সেই বাতায়ন, আশার সেই অশ্বাত রূক্ষ কেশ, সেই মলিন বস্ত্র, সেই ব্যাঘিত- ব্যাকুল দৃষ্টিপাত সুস্পষ্টরেখায় বারংবার অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কালেজের কাজ সারিয়া সে গোলদিঘির ধারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আশার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না— সদয় ছলনা, না অকপট নিষ্ঠুরতা, কোন্টা উচিত। বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে- তর্ক আর মনে উদয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেন্দ্র উভয়ের দাবি কেমন করিয়া রাখিবে।

মহেন্দ্র তখন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আশার প্রতি এখনো তাহার যে ভালোবাসা আছে, তাহা অল্প স্তৰের ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ সেই ভালোবাসা পাইলে আশা কেন না সন্তুষ্ট থাকিবে। বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মতো প্রশংস্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্যনীতির কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

এইরূপ বুঝাইয়া মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আশা, কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুইচন্দ্রসেবিত গ্রহের মতো এইভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আজ রাত্রে সে সকাল সকাল বিছানায় প্রবেশ করিয়া আদরে যত্নে স্নিফ্ফ আলাপে আশার মন হইতে সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রুতপদে বাড়ি চলিয়া আসিল।

আহারের সময় আশা উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সে এক সময় শুইতে আসিবে তো, এই মনে করিয়া মহেন্দ্র বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিষ্ঠুর ঘরে সেই শূন্য শয়ার মধ্যে কোন্ সূতি মহেন্দ্রের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। আশার সহিত নবপরিণয়ের নিত্যনৃতন লীলাখেলা? না। সূর্যালোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, সে- সকল সূতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে— একটি তীব্র- উজ্জ্বল তরঙ্গীমূর্তি, সরলা বালিকার সলজ শিঙ্খচ্ছবিকে কোথায় আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে বিষবৃক্ষ লইয়া সেই কাড়াকাড়ি মনে পড়িতে লাগিল; সন্ধ্যার পর বিনোদিনী কপালকুণ্ডলা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিত, বাড়ির লোক ঘুমাইয়া পড়িত, রাত্রে নিভৃত কক্ষের সেই স্তৰ্ক নির্জনতায় বিনোদিনীর কর্ষস্বর যেন আবেশে মৃদুতর ও রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিত, হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িত, মহেন্দ্র বলিত, ‘তোমাকে সিঁড়ির নীচে পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসি।’ সেই- সকল কথা বারংবার মনে পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল— মহেন্দ্রের মনে মনে ঈষৎ আশঙ্কা হইতে লাগিল, এখনই আশা আসিয়া পড়িবে— কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, ‘আমি তো কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আশা যদি অন্যায় রাগ করিয়া না আসে তো আমি কী করিব।’ এই বলিয়া নিশ্চীথরাত্রে বিনোদিনীর ধ্যানকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, তখন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, মশারি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে আসিয়া দেখিল, গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাত্রি বড়ো রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রকাণ্ড নিঃশব্দতা এবং সুপ্তি যেন স্তৰ্ক সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় স্পর্শগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে— অসংখ্য হর্ম্যশ্রেণীর উপর দিয়া মহানগরীর নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়া বাতাস মৃদুগমনে পদচারণ করিয়া আসিতেছে।

মহেন্দ্রের বহুদিনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আশা কাশী হইতে ফিরিয়া অবধি বিনোদিনী তাহাকে দেখা দেয় নাই। জ্যোৎস্নামদবিহুল নির্জন রাত্রি মহেন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করিয়া বিনোদিনীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিনোদিনীর ঘরের সমুখের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, ঘর বন্ধ হয় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিছানা তৈরি রহিয়াছে,

কেহ শোয় নাই। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঘরের দক্ষিণদিকের খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, “কে ও।”

মহেন্দ্র অভিভূত আর্দ্ধ কঢ়ে উত্তর করিল, ‘বিনোদ, আমি।’

বলিয়া সে একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রীষ্মরাত্রিতে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী শুইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘মহিন, এত রাত্রে তুই এখানে যে!’

বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ ঝয়গের নীচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোনো উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অধ্যায় - ৩৩

পরদিন প্রত্যুষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ্য উত্তাপের পর স্নিগ্ধশ্যামল মেঘে দক্ষ আকাশ জুড়াইয়া গেল। আজ মহেন্দ্র সময় হইবার পূর্বেই কালেজে গেছে। তাহার ছাড়া- কাপড়গুলা মেঝের উপর পড়িয়া। আশা মহেন্দ্রের ময়লা কাপড় গনিয়া গনিয়া, তাহার হিসাব রাখিয়া ধোবাকে বুঝাইয়া দিতেছে।

মহেন্দ্র স্বভাবত ভোলামন অসাবধান লোক; এইজন্য আশাৰ প্রতি তাহার অনুরোধ ছিল ধোবার বাড়ি দিবার পূর্বে তাহার ছাড়া- কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মহেন্দ্রের একটা ছাড়া- জামার পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশাৰ হাতে ঠেকিল।

সেই চিঠি যদি বিষধৰ সাপের মূর্তি ধরিয়া তখনই আশাৰ অঙ্গুলি দংশন কৰিত তবে ভালো হইত; কাৰণ, উগ্ৰ বিষ শৰীৰে প্ৰবেশ কৰিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চৱম ফল ফলিয়া শেষ হইতে পাৱে, কিন্তু বিষ মনে প্ৰবেশ কৰিলে মৃত্যুযন্ত্ৰণা আনে— মৃত্যু আনে না।

খোলা চিঠি বাহিৰ কৰিবামাত্ৰ দেখিল, বিনোদিনীৰ হস্তাক্ষৰ। চকিতেৰ মধ্যে আশাৰ মুখ পাংশুবৰ্ণ হইয়া গেল। চিঠি হাতে লইয়া সে পাশেৰ ঘৱে গিয়া পড়িল—

‘কাল রাত্রে তুমি যে- কাণ্টা কৰিলে, তাহাতেও কি তোমার তৃষ্ণি হইল না। আজ আবাৰ কেন খেমিৰ হাত দিয়া আমাকে গোপনে চিঠি পাঠাইলে। ছি ছি, সে কী মনে কৰিল। আমাকে তুমি কি জগতে কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না।

‘আমাৰ কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাসা? তোমাৰ এ ভিক্ষাবৃত্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমাৰ লোভেৰ অন্ত নাই।

‘জগতে আমাৰ ভালোবাসিবাৰ এবং ভালোবাসা পাইবাৰ কোনো স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালোবাসাৰ খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমাৰ অবসৱ ছিল, তখন সেই মিথ্যা খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলাৰ ছুটি কি ফুৱায় না। ঘৱেৰ মধ্যে তোমাৰ ডাক পড়িয়াছে, এখন আবাৰ খেলাৰ

ঘরে উঁকিরুঁকি কেন। এখন ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার তো ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

‘তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালোবাস। খেলার বেলায় সে কথা শোনা যাইতে পারে— কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও কথা বিশ্বাস করি না। এক সময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ, সেও মিথ্যা; এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ, এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাসো।’

‘ভালোবাসার ত্রুট্য আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছে— সে ত্রুট্য পূরণ করিবার সম্ভল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়াছি। আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্জন হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার শখও মিটিয়াছে; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না। চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ— সে কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে— তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম। এ চিঠির যদি উত্তর দাও, তবে বুবিব, না পলাইলে তোমার হাত হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই।’

চিঠিখানি পড়িবামাত্র মুহূর্তের মধ্যে চারি দিক হইতে আশার সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ুপেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল— নিশ্চাস লইবার জন্য যেন বাতাসটুকু পর্যন্ত রাহিল না, সূর্য তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল। আশা প্রথমে দেয়াল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চৌকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল, ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া চিঠিখানা আর- একবার পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উদ্ভ্রান্তিতে কিছুতেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না— কালো- কালো অঙ্করগুলা তাহার চোখের উপর নাচিতে লাগিল। এ কী। এ কী হইল। এ কেমন করিয়া হইল। এ কী সম্পূর্ণ সর্বনাশ। সে কী করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ডাঙ্গার উপরে উঠিয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাহার বুকের ভিতরটা তেমনি করিতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোনো একটা আশ্রয় পাইবার জন্য জলের উপরে হস্ত প্রসারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা মনের মধ্যে একটা যা- হয় কিছু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিল, অবশ্যে বুক চাপিয়া উর্ধ্বর্শাসে বলিয়া উঠিল, “মাসিমা !”

সেই স্নেহের সন্তান উচ্ছ্঵সিত হইবামাত্র তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া কান্নার উপর কান্না— কান্নার উপর কান্না যখন ফিরিয়া ফিরিয়া শেষ হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, ‘এ চিঠি লইয়া আমি কী করিব।’ স্বামী যদি জানিতে পারেন, এ চিঠি আশার হাতে পড়িয়াছে, তবে সেই উপলক্ষে তাহার নিদারণ লজ্জা সূরণ করিয়া আশা অত্যন্ত কুর্ণিত হইতে লাগিল। স্ত্রি করিল, চিঠিখানি সেই ছাড়া- জামার পকেটে পুনরায় রাখিয়া জামাটি আলনায় ঝুলাইয়া রাখিবে, ধোবার বাড়ি দিবে না।

এই ভাবিয়া চিঠি- হাতে সে শয়নগৃহে আসিল। ধোবাটা ইতিমধ্যে ময়লা কাপড়ের গাঁঠরির উপর ঠেস দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের ছাড়া জামাটা তুলিয়া লইয়া আশা তাহার পকেটে চিঠি পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাড়া পাইল, ‘ভাই বালি।’

তাড়াতাড়ি চিঠি ও জামাটা খাটের উপর ফেলিয়া সে তাহা চাপিয়া বসিল। বিনোদনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, ‘ধোবা বড়ে কাপড় বদল করিতেছে। যে কাপড়গুলায় মার্কা দেওয়া হয় নাই, সেগুলা আমি লইয়া যাই।’

আশা বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মুখের ভাবে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পায়, এইজন্য সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, মনে মনে কহিল, ‘ও, বুঝিয়াছি। কাল রাত্রের বিবরণ তবে জানিতে পারিয়াছ। আমার উপরেই সমস্ত রাগ! যেন অপরাধ আমারই।’

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার কোনো চেষ্টাই করিল না। খানকয়েক কাপড় বাছিয়া লইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর সঙ্গে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বন্ধুত্ব করিয়া আসিতেছে, সেই লজ্জা নিরাকৃণ দুঃখের মধ্যেও তাহার হৃদয়ে পুঁজীকৃত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে সখীর যে আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠুর চিঠিখানা আর একবার মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কী মনে করিয়া কালেজের একটা লেকচারের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যগ্রদৃষ্টিতে ঘরের এদিক- ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আশা বুঝিয়াছিল, মহেন্দ্র কী খুঁজিতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া সে হাতের চিঠিখানা অলঙ্কিতে যথাস্থানে রাখিয়া পালাইয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্র তখন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রের সেই নিষ্কল্প প্রয়াস দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও জামাটা মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া ডান হাতে খাটের থামটা ধরিয়া সেই হাতে মুখ লুকাইল। মহেন্দ্র বিদ্যুদ্বেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের জন্য শুরু হইয়া আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা সিঁড়ি দিয়া মহেন্দ্রের দ্রুতধাবনের শব্দ শুনিতে পাইল। তখন ধোবা ডাকিতেছে, “মাঠাকরুণ, কাপড় দিতে আর কত দেরি করিবে। বেলা অনেক হইল, আমার বাড়ি তো এখানে নয়।”

অধ্যায় - ৩৪

রাজলক্ষ্মী আজ সকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাই। বিনোদিনী নিয়মমত ভাঁড়ারে গেল, দেখিয়া, রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

সে তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল, “পিসিমা, তোমার অসুখ করিয়াছে বুবি? করিবারই কথা। কাল রাত্রে ঠাকুরপো যে কীর্তি করিলেন। একেবারে পাগলের মতো আসিয়া উপস্থিত। আমার তো তার পরে ঘুম হইল না।”

রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া রহিলেন, হঁ- না কোনো উত্তরই করিলেন না।

বিনোদিনী বলিল, ‘হয়তো চোখের বালির সঙ্গে সামান্য কিছু খিটিমিটি হইয়া থাকিবে, আর দেখে কে। তখনই নালিশ কিংবা নিষ্পত্তির জন্যে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তর সয় না। যাই বল পিসিমা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার ছেলের সহস্র গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্যের লেশমাত্র নাই। ঐজন্যেই আমার সঙ্গে কেবলই ঝগড়া হয়।’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘বউ, তুমি মিথ্যা বকিতেছ— আমার আজ আর কোনো কথা ভালো লাগিতেছে না।’

বিনোদিনী কহিল, ‘আমারও কিছু ভালো লাগিতেছে না, পিসিমা। তোমার মনে আঘাত লাগিবে, এই ভয়ে মিথ্যা কথা দিয়া তোমার ছেলের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এমন হইয়াছে যে আর ঢাকা পড়ে না।’

রাজলক্ষ্মী। আমার ছেলের দোষ- গুণ আমি জানি— কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।

বিনোদিনী কী একটা বলিবার জন্য উদ্যত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল— কহিল, ‘সে কথা ঠিক পিসিমা, কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।’

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মতো উদ্বৃষ্ট হইয়া উঠিলেন— কহিলেন, ‘তত্ত্বাগণিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস? তোর জিব খসিয়া পড়িবে না! ’

বিনোদিনী অবিচলিতভাবে কহিল, ‘পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ— তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল, তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটিত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ— আমরা মায়াবিনী।’

রোষে রাজলক্ষ্মীর যেন কষ্টরোধ হইয়া গেল— তিনি ঘর ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী একলা ঘরে ক্ষণকালের জন্য স্ত্রি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তাহার দুই চক্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সকালবেলাকার গৃহকার্য হইয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহেন্দ্র বুঝিল, কাল রাত্রিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে। তখন বিনোদিনীর কাছ হইতে পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আঘাতের প্রতিঘাত স্বরূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবেগে ধাবমান হইতেছিল। ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর- প্রত্যুত্তর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। মহেন্দ্র জানিত, মা তাহাকে বিনোদিনী সম্বন্ধে ভরৎসনা করিলেই বিদ্রোহীভাবে সে যথার্থ মনের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিরাকৃণ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। অতএব এ সময়ে বাড়ি হইতে দূরে গিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। মহেন্দ্র চাকরকে বলিল, ‘মাকে বলিস, আজ কালেজে আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনই যাইতে হইবে, ফিরিয়া আসিয়া দেখা হইবে।’ বলিয়া পলাতক বালকের মতো তখনই তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া না খাইয়া ছুটিয়া বাহির হইতে গেল। বিনোদিনীর যে দারুণ চিঠিখানা আজ সকাল হইতে বার বার করিয়া সে পড়িয়াছে এবং পকেটে লইয়া ফিরিয়াছে, আজ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে সেই চিঠিসুন্দর জামা ছাড়িয়াই সে চলিয়া গেল।

এক পশলা ঘন বৃষ্টি হইয়া তাহার পরে বাদলার মতো করিয়া রহিল। বিনোদিনীর মন আজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। মনের কোনো অসুখ হইলে বিনোদিনী কাজের মাত্রা বাড়ায়। তাই সে আজ যত রাজ্যের কাপড় জড়ে করিয়া চিহ্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার নিকট হইতে কাপড় চাহিতে গিয়া আশার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মন আরো বিগড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধীই হইতে হয় তবে অপরাধের যত লাঞ্ছনা তাহাই কেন ভোগ করিবে, অপরাধের যত সুখ তাহা হইতে কেন বধিত হইবে।

ঝুপ ঝুপ শব্দে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল। বিনোদিনী তাহার ঘরে মেঝের উপর বসিয়া। সমুখে কাপড় স্তুপাকার। খেমি দাসী এক- একখানি কাপড় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর বিনোদিনী মার্কা দিবার কালি দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত করিতেছে। মহেন্দ্র কোনো সাড়া না দিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। খেমি দাসি কাজ ফেলিয়া মাথায় কাপড় দিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুট দিল।

বিনোদিনী কোলের কাপড় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ‘যাও, আমার এ ঘর হইতে চলিয়া যাও।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘কেন, কী করিয়াছি।’

বিনোদিনী। কী করিয়াছি। ভীরু কাপুরুষ ! কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না জান ভালোবাসিতে, না জান কর্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ !

মহেন্দ্র। তোমাকে আমি ভালোবাসি নাই, এমন কথা বলিলে?

বিনোদিনী। আমি সেই কথাই বলিতেছি। লুকাচুরি ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক— তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জনিয়া গেছে। আর ভালো লাগে না। তুমি যাও।

মহেন্দ্র একেবারে মুহ্যমান হইয়া কহিল, ‘তুমি আমাকে ঘৃণা কর, বিনোদ !’

বিনোদিনী। হঁ, ঘৃণা করি।

মহেন্দ্র। এখনো প্রায়শিত্ব করিবার সময় আছে, বিনোদ। আমি যদি আর দ্বিধা না করি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছ?

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর দুই হাত সবলে ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। বিনোদিনী কহিল, “ছাড়ো, আমার লাগিতেছে।”

মহেন্দ্র। তা লাগুক। বলো, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?

বিনোদিনী। না, যাইব না। কোনোমতেই না।

মহেন্দ্র। কেন যাইবে না। তুমই আমাকে সর্বনাশের মুখে টানিয়া আনিয়াছ, আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

বলিয়া মহেন্দ্র সুদৃঢ়বলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, “তোমার ঘৃণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাসিবেই।”

বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

মহেন্দ্র কহিল, “চারি দিকে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও পারিবে না, পালাইতেও পারিবে না।”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চেঃস্থরে সে কহিল, “এমন খেলা কেন খেলিলে, বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবে না। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু।”

রাজলক্ষ্মী ঘরে চুকিয়া কহিলেন, “মহিন, কী করছিস।”

মহেন্দ্রের উন্মত্ত দৃষ্টি এক নিমেষমাত্র মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া আসিল; তাহার পরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল, “আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, বলো, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?”

বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, ‘যাইব।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘তবে আজকের মতো অপেক্ষা করো, আমি চলিলাম, কাল হইতে তুমি ছাড়া আর আমার কেহই রহিবে না।’

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল।

এমন সময় ধোবা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, ‘মাঠাকরুন, আর তো বসিতে পারি না। আজ যদি তোমাদের ফুরসত না থাকে তো আমি কাল আসিয়া কাপড় লইয়া যাইব।’

খেমি আসিয়া কহিল, ‘‘বউঠাকরুন, সহিস বলিতেছে দানা ফুরাইয়া গেছে।’’

বিনোদিনী সাত দিনের দানা ওজন করিয়া আস্তাবলে পাঠাইয়া দিত, এবং নিজে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোড়ার খাওয়া দেখিত।

গোপাল- চাকর আসিয়া কহিল, “বউঠাকরুন, বাড়ু- বেহারা আজ দাদামশায়ের (সাধুচরণের) সঙ্গে বাগড়া করিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার কেরোসিনের হিসাব বুঝিয়া লইলেই সে সরকারবাবুর কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।”

সংসারের সমস্ত কর্মই পূর্ববৎ চলিতেছে।

অধ্যায় - ৩৫

বিহারী এতদিন মেডিকাল কালেজে পড়িতেছিল। ঠিক পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে ছাড়িয়া দিল। কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিত, ‘‘পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।’’

আসল কথা, বিহারীর উদ্যম অশেষ; একটা- কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার জো নাই, অথচ যশের তৃষ্ণা, টাকার লোভ এবং জীবিকার জন্য উপার্জনের প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কালেজে ডিগ্রী লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিল। যতটুকু জানিতে তাহার কৌতুহল ছিল, এবং হাতের কাজে যতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কালেজে প্রবেশ করে। মহেন্দ্র এক বৎসর পূর্বে ডিগ্রী লইয়া মেডিকাল কালেজে ভর্তি হয়। কালেজের বাঙালি ছাত্রদের নিকট তাহাদের দুইজনের বন্ধুত্ব বিখ্যাত ছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া ইহাদের দুজনকে শ্যামদেশীয় জোড়া- যমজ বলিয়া ডাকিত। গত বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করাতে দুই বন্ধু এক শ্রেণীতে আসিয়া মিলিল। এমন সময়ে হঠাৎ জোড় কেন যে ভাঙ্গিল, তাহা ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল না। রোজ যেখানে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইবেই, অথচ তেমন করিয়া দেখা হইবে না, সেখানে বিহারী কিছুতেই যাইতে পারিল না। সকলেই জানিত, বিহারী ভালোরকম পাস করিয়া নিশ্চয় সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তাহাদের বাড়ির পার্শ্বে এক কুটিরে রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়া এক গরিব আক্ষণ বাস করিত, ছাপাখানায় বারো টাকা বেতনে কম্পোজিটারি করিয়া সে জীবিকা চালাইত। বিহারী তাহাকে বলিল, ‘‘তোমার ছেলেকে আমার কাছে রাখো, আমি উহাকে নিজে লেখাপড়া শিখাইব।’’

আক্ষণ বাঁচিয়া গেল। খুশি হইয়া তাহার আট বছরের ছেলে বসন্তকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিল।

বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে লাগিল। বলিল, “দশ বৎসর বয়সের পূর্বে আমি ইহাকে বই পড়াইব না, সব মুখে মুখে শিখাইব।” তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া, তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে, আলিপুর- পশুশালায়, শিবপুরের বাগানে ঘুরিয়া বিহারী দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাকে মুখে মুখে ইংরাজি শেখানো, ইতিহাস গল্প করিয়া শোনানো, নানাপ্রকারে বালকের চিন্তাগুলি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতিসাধন, বিহারীর সমস্ত দিনের কাজ এই ছিল— সে নিজেকে মুহূর্তমাত্র অবসর দিত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইবার জো ছিল না। দুপুরবেলায় বৃষ্টি থামিয়া আবার বিকাল হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বিহারী তাহার দোতলার বড়ো ঘরে আলো জ্বালিয়া বসিয়া বসন্তকে লইয়া নিজের নৃতন প্রণালীর খেলা করিতেছিল।

“বসন্ত, এ ঘরে ক’টা কড়ি আছে, চট করিয়া বলো। না, শুনিতে পাইবে না।”

বসন্ত। কুড়িটা।

বিহারী। হার হইল— আঠারোটা।

ফস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ খড়খড়িতে ক’টা পান্না আছে?” বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

বসন্ত বলিল, “চ্যাটা।”

“জিত।” — “এই বেঞ্চিটা লম্বায় কত হইবে? এই বইটার কত ওজন?” এমনি করিয়া বিহারী বসন্তের ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করিতেছিল, এমন সময় বেহারা আসিয়া কহিল, “বাবুজি, একঠো ঔরৎ—”

কথা শেষ করিতে না করিতে বিনোদিনী ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া কহিল, “এ কী কাণ্ড, বৌঠান!”

বিনোদিনী কহিল, “তোমার এখানে তোমার আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ নাই?”

বিহারী। আত্মীয়ও নাই, পরও নাই। পিসি আছেন দেশের বাড়িতে।

বিনোদিনী। তবে তোমার দেশের বাড়িতে আমাকে লইয়া চলো।

বিহারী। কী বলিয়া লইয়া যাইব।

বিনোদিনী। দাসী বলিয়া। আমি সেখানে ঘরের কাজ করিব।

বিহারী। পিসি কিছু আশ্চর্য হইবেন, তিনি আমাকে দাসীর অভাব তো জানান নাই। আগে শুনি, এ সংকল্প কেন মনে উদয় হইল। বসন্ত, যাও, শুইতে যাও।

বসন্ত চলিয়া গেল। বিনোদিনী কহিল, “বাহিরের ঘটনা শুনিয়া তুমি ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।”

বিহারী। না- ই বুঝিলাম, নাহয় ভুলই বুঝিব, ক্ষতি কী।

বিনোদিনী। আচ্ছা, নাহয় ভুলই বুঝিয়ো। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাসে।

বিহারী। সে খবর তো নূতন নয়, এবং এমন খবর নয় যাহা দ্বিতীয় বার শুনিতে ইচ্ছা করে।

বিনোদিনী। বার বার শুনাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। সেইজন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দাও।

বিহারী। ইচ্ছা তোমার নাই? এ বিপত্তি কে ঘটাইল। মহেন্দ্র যে পথে চলিয়াছিল সে পথ হইতে তাহাকে কে ভষ্ট করিয়াছে।

বিনোদিনী। আমি করিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ- সমস্তই আমারই কাজ। আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করো। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।

বিহারী। ভালোবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে।

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, এ তোমার শাস্ত্রের কথা। এখনো ও- সব কথা শুনিবার মতো মতি আমার হয় নাই। ঠাকুরপো, তোমার পুঁথি রাখিয়া একবার অন্তর্যামীর মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করো। আমার ভালোমন্দ সব আজ আমি তোমার কাছে বলিতে চাই।

বিহারী। পুঁথি সাথে খুলিয়া রাখি, বৌঠান। হৃদয়কে হৃদয়েরই নিয়মে বুঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাক, আমরা পুঁথির বিধান মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে যে ঠেকাইতে পারি না।

বিনোদিনী। শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অঙ্গ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন বুঝিয়াছ— একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে— সত্য করিয়া বলো, সে কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়ো না।

বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন। আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল। আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্জ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি— তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে না কেন। আমার পোড়াকপাল। তুমিও কিনা আশার ভালোবাসায় মজিলে। না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না। বোসো ঠাকুরপো, আমি কোনো কথা ঢাকিয়া বলিব না। তুমি যে আশাকে ভালোবাস, সে কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনো আমি জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ ! অঙ্গ !

বিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ‘আজ তুমি আমাকে যাহা শুনাইবে সমস্তই আমি শুনিব— কিন্তু যে কথা বলিবার নহে, সে কথা বলিয়ো না, তোমার কাছে আমার এই একান্ত মিনতি।’

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে তাহা আমি জানি— কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়-

লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কতবড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন সর্বনাশ হইত না।

বিহারী বিবর্ণ হইয়া কহিল, “আশার কী হইয়াছে। তুমি তাহার কী করিয়াছ।”

বিনোদিনী। মহেন্দ্র তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাল আমাকে লইয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, “এ কিছুতেই হইতে পারে না। কোনোমতেই না।”

বিনোদিনী। কোনোমতেই না? মহেন্দ্রকে আজ কে ঠেকাইতে পারে।

বিহারী। তুমি পার।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল— তাহার পরে বিহারীর মুখের দিকে দুই চক্ষু স্থির রাখিয়া কহিল, “ঠেকাইব কাহার জন্য। তোমার আশার জন্য? আমার নিজের সুখদুঃখ কিছুই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই— ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব।”

বিহারীর মুখের ভাব ক্রমশ অত্যন্ত কঠিন হইয়া আসিল— কহিল, ‘তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাঙ্টা করিলে, এবং যে কথাগুলো বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে- সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো- আনাই নাটক এবং নভেল।’

বিনোদিনী। নাটক! নভেল!

বিহারী। হাঁ নাটক, নভেল! তাও খুব উঁচুদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ- সমস্ত তোমার নিজের— তাহা নহে। এ সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বাধিত হইতে না— কিন্তু নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।

কোথায় বিনোদিনীর সেই তীব্র তেজ, দুঃসহ দর্প। মন্ত্রাহত ফণিনীর মতো সে স্তুক হইয়া নত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে, বিহারীর মুখের দিকে না চাহিয়া শান্তনৃত্বে কহিল, “তুমি আমাকে কী করিতে বল।”

বিহারী কহিল, “অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়ো না। সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যাহা বলে, তাই করো। দেশে চলিয়া যাও।”

বিনোদিনী। কেমন করিয়া যাইব।

বিহারী। মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিব।

বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার নিজের 'পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাত বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “ঐটুকু দুর্বলতা রাখো ঠাকুরপো! একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।”

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগল বার বার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর- মনের সমস্ত প্রষ্টি যেন শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তুক বিহুল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজেই দুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, ‘জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তার পরে আমি আমাদের সেই বনে- জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারো কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা- কিছু দাও।’ বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্তকালের জন্য দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিষ্কুল হইয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য চৌকিতে গিয়া বসিল এবং রুদ্ধপ্রায় কঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, ‘আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে।’

বিনোদিনী একটুখানি স্তুক হইয়া রহিল, তাহার পরে অস্ফুটকঠে কহিল, ‘সেই ট্রেনেই যাইব।’

এমন সময়, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, বসন্ত তাহার পরিস্ফুট গৌরসুন্দর দেহ লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গন্তীরমুখে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল।

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘গুতে যাস নি যে?’’ বসন্ত কোনো উত্তর না দিয়া গন্তীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া, ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অধ্যায় - ৩৬

যাহা অসন্তুষ্ট তাহাও সন্তুষ্ট হয়, যাহা অসহ্য তাহাও সহ্য হয়, নহিলে মহেন্দ্রের সংসারে সে রাত্রি সে দিন কাটিত না। বিনোদিনীকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া মহেন্দ্র রাত্রেই একটা পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্র ডাকযোগে সকালে মহেন্দ্রের বাড়িতে পৌঁছিল।

আশা তখন শয্যাগত। বেহারা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, “মাজি, চিঠি।”

আশার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ধক্ক করিয়া ঘা দিল। এক পলকের মধ্যে সহস্র আশ্বাস ও আশঙ্কা একসঙ্গে তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চিঠিখানা লইয়া দেখিল, মহেন্দ্রের হাতের অক্ষরে বিনোদিনীর নাম। তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা বালিশের উপরে পড়িয়া গেল—কোনো কথা না বলিয়া আশা সে চিঠি বেহারার হাতে ফিরাইয়া দিল। বেহারা জিজ্ঞাসা করিল, “চিঠি কাহাকে দিতে হইবে।”

আশা কহিল, “জানি না।”

রাত্রি তখন আটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঝড়ের মতো বিনোদিনীর ঘরের সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল—ঘরে আলো নাই, সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা দেশালাইয়ের বাল্ল বাহির করিয়া দেশালাই ধরাইল—দেখিল, ঘর শূন্য। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিসপত্রও নাই। দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া দেখিল, বারান্দা নির্জন। ডাকিল, “বিনোদ।” কোনো উত্তর আসিল না।

‘নির্বোধ। আমি নির্বোধ। তখনই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই মা বিনোদিনীকে এমন গঞ্জনা দিয়াছেন যে, সে ঘরে ঢিকিতে পারে নাই।’

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে- ঘরেও আলো নাই—কিন্তু রাজলক্ষ্মী বিছানায় শুইয়া আছেন, তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারেই রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিল, “মা, তোমরা বিনোদিনীকে কী বলিয়াছ।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কিছুই বলি নাই।”

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে।

রাজলক্ষ্মী। আমি কী জানি।

মহেন্দ্র অবিশ্বাসের স্বরে কহিল, “তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম—সে যেখানেই থাক, আমি তাহাকে বাহির করিবই।”

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাত পশ্চাত চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, “মহিন, যাস নে মহিন, ফিরিয়া আয়, আমার একটা কথা শুনিয়া যা।”

মহেন্দ্র এক নিশাসে ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। মূহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, “বৃষ্টাকুরানী কোথায় গিয়াছেন।”

দরোয়ান কহিল, “আমাদের বলিয়া যান নাই, আমরা কিছুই জানি না।”

মহেন্দ্র গর্জিত ভৃৎসনার স্বরে কহিল, “জান না !”

দরোয়ান করজোড়ে কহিল, ‘না মহারাজ, জানি না।’

মহেন্দ্র মনে মনে স্থির করিল, ‘মা ইহাদের শিখাইয়া দিয়াছেন।’ কহিল, ‘আচ্ছা, তা হউক।’

মহানগরীর রাজপথে গ্যাসালোকবিন্দি সন্ধ্যাকারে বরফওয়ালা তখন বরফ ও তপসিমাছওয়ালা তপসিমাছ হাঁকিতেছিল। কলরবক্ষুদ্র জনতার মধ্যে মহেন্দ্র প্রবেশ করিল এবং অদৃশ্য হইয়া গেল।

অধ্যায় - ৩৭

বিহারী একলা নিজেকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কখনো ধ্যান করিতে বসে না। কোনোকালেই বিহারী নিজের কাছে নিজেকে আলোচ্য বিষয় করে নাই। সে পড়াশুনা কাজকর্ম বন্ধুবন্ধুর লোকজন লইয়াই থাকিত। চারি দিকের সংসারকেই সে নিজের চেয়ে প্রাধান্য দিয়া আনন্দে ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রবল আঘাতে তাহার চারি দিক যেন বিশ্বিষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল; প্রলয়ের অন্ধকারে অভ্যন্তরীণ বেদনার গিরিশ্চন্দে নিজেকে একলা লইয়া দাঁড়াইতে হইল। সেই হইতে নিজের নির্জন সঙ্গকে সে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; জোর করিয়া নিজের ঘাড়ে কাজ চাপাইয়া এই সঙ্গীটিকে সে কোনোমতেই অবকাশ দিতে চায় না।

কিন্তু আজ নিজের সেই অন্তরবাসীকে বিহারী কোনোমতেই ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না। কাল বিনোদনীকে বিহারী দেশে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহার পর হইতে সে যে- কোনো কাজে যে- কোনো লোকের সঙ্গেই আছে, তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয় তাহাকে নিজের নিগৃত নির্জনতার দিকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রান্তি ও অবসাদে আজ বিহারীকে পরান্ত করিল। রাত্রি তখন নয়টা হইবে; বিহারীর গৃহের সমুখবর্তী দক্ষিণের ছাদের উপর দিনান্তরম্য গ্রীষ্মের বাতাস উতলা হইয়া উঠিয়াছে। বিহারী চন্দ্ৰদয়হীন অন্ধকারে ছাদে একখানি কেদারা লইয়া বসিয়া আছে।

বালক বসন্তকে আজ সন্ধ্যাবেলায় সে পড়ায় নাই— সকাল সকাল তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আজ সান্ত্বনার জন্য, সঙ্গের জন্য, তাহার চিরাভ্যন্ত গ্রীতিসুধামিন্দ্র পূর্বজীবনের জন্য তাহার হৃদয় যেন মাত্রপরিত্যক্ত শিশুর মতো বিশ্বের অন্ধকারের মধ্যে দুই বাহু তুলিয়া কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আজ তাহার দৃঢ়তা, তাহার কঠোর সংযমের বাঁধ কোথায় ভাঙিয়া গেছে। যাহাদের কথা ভাবিবে না পণ করিয়াছিল, সমস্ত হৃদয় তাহাদের দিকে ছুটিয়াছে, আজ আর পথরোধ করিবার লেশমাত্র বল নাই।

মহেন্দ্রের সহিত বাল্যকালের প্রণয় হইতে সেই প্রণয়ের অবসান পর্যন্ত সমস্ত কথা— যে সুদীর্ঘ কাহিনী নানাবর্ণে চিত্রিত, জলে- স্থলে পর্বতে নদীতে বিভক্ত মানচিত্রের মতো তাহার মনের মধ্যে গুটানো ছিল— বিহারী প্রসারিত করিয়া ধরিল। যে ক্ষুদ্র জগৎকুর উপর সে তাহার জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা কোনখানে কোন দুর্গহের সহিত সংঘাত পাইল, তাহাই সে মনে করিয়া দেখিতে লাগিল। প্রথমে বাহির হইতে কে আসিল। সূর্যাস্তকালের করণ রক্তিমচ্ছটায় আভাসিত আশার লজ্জামণ্ডিত তরণ মুখখানি অঙ্ককারে অঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে- সঙ্গে মঙ্গল- উৎসবের পৃণ্যশঙ্খধর্মি তাহার কানে বাজিতে লাগিল। এই শুভগ্রহ অদৃষ্টাকাশের অঙ্গাত প্রান্ত হইতে আসিয়া দুই বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়াইল— একটু যেন বিচ্ছেদ আনিল, কোথা হইতে এমন একটি গৃঢ় বেদনা আনিয়া উপস্থিত করিল, যাহা মুখে বলিবার নহে, যাহা মনেও লালন করিতে নাই। কিন্তু তবু এই বিচ্ছেদ, এই বেদনা অপূর্ব মেহরাঞ্জিত মাধুর্যরশ্মি দ্বারা আচ্ছন্ন পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

তাহার পরে যে শনিগ্রহের উদয় হইল— বন্ধুর প্রণয়, দম্পতির প্রেম, গৃহের শান্তি ও পবিত্রতা একেবারে ছারখার করিয়া দিল, বিহারী প্রবল ঘৃণায় সেই বিনোদনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সুন্দরে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য। আঘাত যেন অত্যন্ত মন্দু হইয়া গেল, তাহাকে যেন স্পর্শ করিল না। সেই পরমাসুন্দরী প্রহেলিকা তাহার দুর্ভেদ্যরহস্যপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ অনিমেষ দৃষ্টি লইয়া কৃষ্ণপক্ষের অঙ্ককারে বিহারীর সমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মরাত্রির উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ বাতাস তারই ঘন নিশ্চাসের মতো বিহারীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই পলকহীন চক্ষুর জ্বালাময়ী দীপ্তি ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল; সেই ত্যাগক্ষণ খরদৃষ্টি অশ্রুজলে সিক্ত শিংহ হইয়া গভীর ভাবরসে দেখিতে দেখিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; মুহূর্তের মধ্যে সেই মূর্তি বিহারীর পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার দুই জানু প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিল— তাহার পরে সে একটি অপরাপ মায়ালতার মতো নিমেষের মধ্যেই বিহারীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া সদ্যোবিকশিত সুগন্ধি পুষ্পমঞ্জরিতুল্য একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখ বিহারীর ওষ্ঠের নিকট আনিয়া উপনীত করিল। বিহারী চক্ষু বুজিয়া সেই কল্পমূর্তিকে স্মৃতিলোক হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোনোমতেই তাহাকে আঘাত করিতে যেন তাহার হাত উঠিল না— একটি অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল, পুলকে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

বিহারী ছাদের নির্জন অঙ্ককারে আর থাকিতে পারিল না। আর- কোনো দিকে মন দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি দীপালোকিত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কোণে টিপাইয়ের উপর রেশমের- ঢাকা- দেওয়া একখানি বাঁধানো ফোটোগ্রাফ ছিল। বিহারী ঢাকা খুলিয়া সেই ছবিটি ঘরের মাঝখানে আলোর নীচে লইয়া বসিল— কোলের উপর রাখিয়া দেখিতে লাগিল।

ছবিটি মহেন্দ্র ও আশার বিবাহের অন্তিকাল পরের যুগলমূর্তি। ছবির পশ্চাতে মহেন্দ্র নিজের অক্ষরে ‘মহিনদা’ এবং আশা স্বহস্তে ‘আশা’ এই নামটুকু লিখিয়া দিয়াছিল। ছবির মধ্যে সেই নবপরিণয়ের মধ্যে দিনটি আর ঘুচিল না। মহেন্দ্র চৌকিতে বসিয়া আছে, তাহার মুখে নৃতন বিবাহের একটি নবীন সরস ভাবাবেশ; পাশে আশা দাঁড়াইয়া— ছবিওয়ালা তাহাকে মাথায় ঘোমটা দিতে দেয় নাই, কিন্তু তাহার মুখ হইতে লজ্জাটুকু খসাইতে পারে নাই। আজ মহেন্দ্র তাহার পার্শ্বচরী আশাকে কাঁদাইয়া কতদূরে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু জড় ছবি মহেন্দ্রের মুখ হইতে নবীন প্রেমের একটি রেখাও বদল হইতে দেয় নাই, কিছু না বুঝিয়া মৃঢ়ভাবে অদৃষ্টের পরিহাসকে হ্রাস করিয়া রাখিয়াছে।

এই ছবিখানি কোলে লইয়া বিহারী বিনোদিনীকে ধিক্কারের দ্বারা সুন্দরে নির্বাসিত করিতে চাহিল। কিন্তু বিনোদিনীর সেই প্রেমে- কাতর ঘোবনে- কোমল বাহুটি বিহারীর জানু চাপিয়া রহিল। বিহারী মনে মনে কহিল, ‘এমন সুন্দর প্রেমের সংসার ছারখার করিয়া দিলি !’ কিন্তু বিনোদিনীর সেই উর্ধ্বোৎক্ষিণ ব্যাকুল মুখের চুম্বন- নিবেদন তাহাকে নীরবে কহিতে লাগিল, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি। সমস্ত জগতের মধ্যে আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি।’

কিন্তু এই কি জবাব হইল। এই কথাই কি একটি ভগ্ন সংসারের নিরারঞ্জন আর্তস্বরকে ঢাকিতে পারে। পিশাচী !

পিশাচী ! বিহারী এটা কি পুরা ভরৎসনা করিয়া বলিল, না, ইহার সঙ্গে একটুখানি আদরের সুর আসিয়াও মিশিল। যে মুহূর্তে বিহারী তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত প্রেমের দাবি হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব ভিত্তিহারীর মতো পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই মুহূর্তে বিহারী কি এমন অ্যাচিত অজস্র প্রেমের উপহার সমস্ত হৃদয়ের সহিত উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। ইহার তুলনায় বিহারী কী পাইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া সে কেবল প্রেম- ভাঙ্গারের খুদকুঁড়া ভিক্ষা করিতেছিল। প্রেমের অন্নপূর্ণা সোনার থালা ভরিয়া আজ একা তাহারই জন্য যে ভোজ পাঠাইয়াছেন, হতভাগ্য কিসের দ্বিধায় তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে।

ছবি কোলে লইয়া এইরকম নানা কথা যখন সে একমনে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় পার্শ্বে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দেখিল মহেন্দ্র আসিয়াছে। চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই কোল হইতে ছবিখানি নীচে কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল— বিহারী তাহা লক্ষ্য করিল না।

মহেন্দ্র একেবারেই বলিয়া উঠিল, “বিনোদিনী কোথায়।”

বিহারী মহেন্দ্রের কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, ‘মহিন্দা, একটু বোসো ভাই, সকল কথার আলোচনা করা যাইতেছে।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আমার বসিবার এবং আলোচনা করিবার সময় নাই। বলো, বিনোদিনী কোথায়।’

বিহারী কহিল, ‘তুমি যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এক কথায় তাহার উত্তর দেওয়া চলে না। একটু তোমাকে স্থির হইয়া বসিতে হইবে।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘উপদেশ দিবে? সে- সব উপদেশের কথা আমি শিশুকালেই পড়িয়াছি।’

বিহারী। না, উপদেশ দিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নাই।

মহেন্দ্র। ভরৎসনা করিবে? আমি জানি আমি পাষণ্ড, আমি নরাধম এবং তুমি যাহা বলিতে চাও তাহা সবই। কিন্তু কথা এই, তুমি জান কি না, বিনোদিনী কোথায়।

বিহারী। জানি।

মহেন্দ্র। আমাকে বলিবে কি না।

বিহারী। না।

মহেন্দ্র। বলিতেই হইবে। তুমি তাহাকে চুরি করিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ। সে আমার, তাহাকে ফিরাইয়া দাও।

বিহারী ক্ষণকাল স্তন্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিল, “সে তোমার নহে। আমি তাহাকে চুরি করিয়া আনি নাই, সে নিজে আমার কাছে আসিয়া ধরা দিয়াছে।”

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, ‘‘মিথ্যা কথা !’’ এই বলিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরের রংদ্ব দ্বারে আঘাত দিতে দিতে উচ্চস্বরে ডাকিল, ‘‘বিনোদ, বিনোদ !’’

ঘরের ভিতর হইতে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘‘ভয় নাই বিনোদ ! আমি মহেন্দ্র, আমি তোমাকে উদ্বার করিয়া লইয়া যাইব—কেহ তোমাকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।’’

বলিয়া মহেন্দ্র সবলে দ্বারে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, ঘরে অন্দকার। অস্ফুট ছায়ার মতো দেখিতে পাইল, বিছানায় কে যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিয়া বালিশ চাপিয়া ধরিল। বিহারী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসন্তকে বিছানা হইতে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিল, ‘‘ভয় নাই বসন্ত, ভয় নাই, কোনো ভয় নাই।’’

মহেন্দ্র তখন দ্রুতপদে বাহির হইয়া বাড়ির সমস্ত ঘর দেখিয়া আসিল। যখন ফিরিয়া আসিল, তখনো বসন্ত ভয়ের আবেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, বিহারী তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল।

মহেন্দ্র আসিয়া কহিল, ‘‘বিনোদিনীকে কোথায় রাখিয়াছ।’’

বিহারী কহিল, ‘‘মহিন্দা, গোল করিয়ো না, তুমি অকারণে এই বালককে যেরূপ ভয় পাওয়াইয়া দিয়াছ, ইহার অসুখ করিতে পারে। আমি বলিতেছি, বিনোদিনীর খবরে তোমার কোনো প্রয়োজন নাই।’’

মহেন্দ্র কহিল, ‘‘সাধু ! মহাত্মা ! ধর্মের আদর্শ খাড়া করিয়ো না। আমার স্ত্রীর এই ছবি কোলে করিয়া রাত্রে কোন্ দেবতার ধ্যানে কোন্ পুণ্যমন্ত্র জপ করিতেছিলে? ভণ !’’

বলিয়া, ছবিখানি মহেন্দ্র ভূমিতে ফেলিয়া জুতাসুন্দ পা দিয়া তাহার কাচ চূর্ণ চূর্ণ করিল এবং প্রতিমূর্তিটি লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বিহারীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।

তাহার মততা দেখিয়া বসন্ত আবার ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। বিহারীর কণ্ঠ রংদ্বপ্রায় হইয়া আসিল— দ্বারের দিকে হস্তনির্দেশ করিয়া কহিল, ‘‘যাও।’’

মহেন্দ্র ঝাড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

অধ্যায় - ৩৮

বিনোদিনী যখন যাত্রিশূন্য মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বাতায়ন হইতে চষামাঠ ও ছায়াবেষ্টিত এক-একখানি গ্রাম দেখিতে পাইল, তখন তাহার মনে স্লিঞ্চনিভৃত পল্লীর জীবনযাত্রা জাগিয়া উঠিল। সেই তরঙ্গছায়াবেষ্টনের মধ্যে তাহার স্বরচিত কল্পনা- নীড়ে নিজের প্রিয় বইগুলি লইয়া কিছুকাল নগরবাসের সমস্ত ক্ষেত্র, দাহ ও ক্ষতবেদনা হইতে সে শাস্তিলাভ করিতে পারিবে, এই কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের শস্যশূন্য দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মাঠের মধ্যে সূর্যাস্তদৃশ্য দেখিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল, আর যেন কিছুর দরকার নাই- মন যেন এইরপ সুবর্ণরঞ্জিত স্তুরবিস্তীর্ণ শাস্তির মধ্যে সমস্ত ভুলিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিতে চায়, তরঙ্গবিক্ষুল সুখদুঃখসাগর হইতে জীবনতরীটি তীরে ভিড়াইয়া নিঃশব্দ সন্ধ্যায় একটি নিষ্কম্পা বটবৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাখিতে চায়, আর কিছুতেই কোনো প্রয়োজন নাই। গাড়ি চলিতে চলিতে এক- এক জায়গায় আত্মরঞ্জ হইতে মুকুলের গন্ধ আসিতেই পল্লীর স্লিঞ্চশাস্তি তাহাকে নিবড়ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। মনে মনে সে কহিল, ‘বেশ হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে, নিজেকে লইয়া আর টানাছেঁড়া করিতে পারি না- এবারে সমস্ত ভুলিব, ঘুমাইব- পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইয়া ঘরের ও পল্লীর কাজেকর্মে সন্তোষের সঙ্গে, আরামের সঙ্গে জীবন কাটাইয়া দিব।’

তৃষিত বক্ষে এই শাস্তির আশা বহন করিয়া বিনোদিনী আপনার কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়, শাস্তি কোথায়। কেবল শূন্যতা এবং দারিদ্র্য। চারি দিকেই সমস্ত জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, অনাদৃত, মলিন। বহুদিনের রুক্ষ স্যাতসেঁতে ঘরের বাস্পে তাহার যেন নিশাস বন্ধ হইয়া আসিল। ঘরে অল্পস্বল্প যে- সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, তাহা কীটের দংশনে, ইঁদুরের উৎপাতে ও ধুলার আক্রমণে ছারখার হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বিনোদিনী ঘরে গিয়া পৌছিল- ঘর নিরানন্দ অন্ধকার। কোনোমতে সরমের তেলে প্রদীপ জ্বালাইতেই তাহার ধোঁয়ায় ও ক্ষীণ আলোতে ঘরের দীনতা আরো পরিষ্ফুট হইল। আগে যাহা তাহাকে পীড়ন করিত না, এখন তাহা অসহ বোধ হইতে লাগিল- তাহার সমস্ত বিদ্রোহী অন্তঃকরণ সবলে বলিয়া উঠিল, ‘এখানে তো এক মুহূর্তও কাটিবে না।’ কুলুঙ্গিতে পূর্বেকার দুই- একটা ধুলায়- আচ্ছন্ন বই ও মাসিক পত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহা ছুঁতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরের বায়ুসম্পর্কশূন্য আমবাগানে বিঞ্চি ও মশার গুঁজনস্বর অন্ধকারে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিনোদিনীর যে বৃন্দা অভিভাবিকা ছিলেন, তিনি ঘরে তালা লাগাইয়া মেয়েকে দেখিতে সুদূরে জামাইবাড়িতে গিয়াছেন। বিনোদিনী প্রতিবেশিনীদের বাড়িতে গেল। তাহারা তাহাকে দেখিয়া যেন চকিত হইয়া উঠিল। ও মা, বিনোদিনীর দিব্য রঙ সাফ হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়চোপড় ফিটফাট, যেন মেমসাহেবের মতো। তাহারা পরস্পরে কী যেন ইশারায় কহিয়া বিনোদিনীর প্রতি লক্ষ করিয়া মুখ চাওয়া- চাওয়ি করিল। যেন কী একটা জনরব শোনা গিয়াছিল, তাহার সহিত লক্ষণ মিলিল।

বিনোদিনী তাহার পল্লী হইতে সর্বতোভাবে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা পদে- পদে অনুভব করিতে লাগিল। স্বগ্রহে তাহার নির্বাসন। কোথাও তাহার এক মুহূর্তের আরামের স্থান নাই।

ডাকঘরের বুড়ো পেয়াদা বিনোদিনীর আবাল্যপরিচিত। পরদিন বিনোদিনী যখন পুক্ষরিণীর ঘাটে স্থান করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় চিঠির ব্যাগ লইয়া পেয়াদাকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া বিনোদিনী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। গামছা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “পাঁচুদাদা, আমার চিঠি আছে?”

বুড়া কহিল, ‘না।’

বিনোদিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, “থাকিতেও পারে। একবার দেখি।”

বলিয়া পাড়ার অল্প খান- পাঁচ- ছয় চিঠি লইয়া উলটাইয়া- পালটাইয়া দেখিল, কোনোটাই তাহার নহে। বিষর্ঘমুখে যখন ঘাটে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার কোনো সংশ্লিষ্ট সকৌতুক কটাক্ষে কহিল, “কী লো বিন্দি, চিঠির জন্যে এত ব্যস্ত কেন।”

আর- এক জন প্রগল্ভা কহিল, “ভালো ভালো, ডাকের চিঠি আসে এত ভাগ্য কয়জনের। আমাদের তো স্বামী, দেবর, ভাই বিদেশে কাজ করে কিন্তু ডাকের পেয়াদার দয়া হয় না।”

এইরপে কথায় কথায় পরিহাস স্ফুটতর ও কটাক্ষ তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদিনী বিহারীকে অনুনয় করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ যদি নিতান্ত না ঘটে, তবে অন্তত সপ্তাহে দুইবার তাহাকে কিছু নাহয় তো দুই ছত্রও যেন চিঠি লেখে। আজই বিহারীর চিঠি পাইবার সন্তান অত্যন্ত বিরল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা এত অধিক হইয়া উঠিল যে, দূর সন্তানবার আশাও বিনোদিনী ছাড়িতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন কতকাল কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

মহেন্দ্রের সহিত জড়িত করিয়া বিনোদিনীর নামে নিন্দা গ্রামের ঘরে ঘরে কিরুপব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শক্র- মিত্রের কৃপায় বিনোদিনীর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। শান্তি কোথায়।

গ্রামবাসী সকলের কাছ হইতে বিনোদিনী নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। পল্লীর লোকেরা তাহাতে আরো রাগ করিল। পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিবার বিলাসসুখ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে চায় না।

ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে নিজেকে সকলের কাছ হইতে গোপন রাখিবার চেষ্টা বৃথা। এখানে আহত হৃদয়টিকে কোণের অঙ্ককারে লইয়া নির্জনে শুশ্রায় করিবার অবকাশ নাই— যেখান- সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতুহলদৃষ্টি আসিয়া ক্ষতঙ্গনে পতিত হয়— বিনোদিনীর অন্তঃপ্রকৃতি চুপড়ির ভিতরকার সজীব মাছের মতো যতই আছড়াইতে লাগিল, ততই চারি দিকের সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে বারংবার আহত করিতে লাগিল। এখানে স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণরূপে বেদনাভোগ করিবারও স্থান নাই।

দ্বিতীয় দিনে চিঠি পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইতেই বিনোদিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিল—

‘ঠাকুরপো, ভয় করিয়ো না, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখিতে বসি নাই। তুমি আমার বিচারক, আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি যে পাপ করিয়াছি, তুমি তাহার কঠিন দণ্ড দিয়াছ; তোমার আদেশমাত্র সে দণ্ড আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছি। দুঃখ এই, দণ্ডটি যে কত কঠিন, তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না। যদি দেখিতে, যদি জানিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমার মনে যে- দয়া হইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। তোমাকে স্মরণ করিয়া, মনে মনে তোমার দুইখানি পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া, আমি ইহাও সহ্য করিব। কিন্তু প্রভু, জেলখানার কয়েদি কি আহারও পায় না। শৌখিন আহার নহে— যতটুকু না হইলে তাহার প্রাণ বাঁচে না, সেটুকুও তো বরাদ্দ আছে। তোমার দুই ছত্র চিঠি আমার এই নির্বাসনের আহার— তাহা যদি না পাই, তবে আমার কেবল নির্বাসনদণ্ড নহে, প্রাণদণ্ড। আমাকে এত অধিক পরীক্ষা করিয়ো না, দণ্ডদাতা। আমার পাপমনে অহংকারের সীমা ছিল না— কাহারো কাছে আমাকে এমন করিয়া মাথা নোয়াইতে হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমার জয় হইয়াছে, প্রভু; আমি বিদ্রোহ করিব না। কিন্তু আমাকে দয়া করো— আমাকে বাঁচিতে দাও। এই অরণ্যবাসের সম্বল আমাকে অল্প- একটু করিয়া

দিয়ো। তাহা হইলে তোমার শাসন হইতে আমাকে কেহই কিছুতেই টলাইতে পারিবে না। এইটুকু দুঃখের কথাই জানাইলাম।

আর যে- সব কথা মনে আছে, বলিবার জন্য বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা তোমাকে জানাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি— সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলাম।

তোমার
বিনোদ- বৌঠান।'

বিনোদিনী চিঠি ডাকে দিল— পাড়ার লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। ঘরে দ্বার রংধা করিয়া থাকে, চিঠি লেখে, চিঠি পাইবার জন্য পেয়াদাকে গিয়া আক্রমণ করে— কলিকাতায় দুদিন থাকিলেই লজ্জাধর্ম খোয়াইয়া কি এমনই মাটি হইতে হয়।

পরদিনেও চিঠি পাইল না। বিনোদিনী সমস্ত দিন স্তৰ্ক হইয়া রহিল, তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অন্তরে- বাহিরে চারি দিকের আঘাত ও অপমানের মন্ত্রে তাহার হন্দয়ের অন্ধকার তলদেশ হইতে নিষ্ঠুর সংহারশক্তি মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। সেই নিদারণ নিষ্ঠুরতার আবির্ভাব বিনোদিনী সভয়ে উপলব্ধি করিয়া ঘরে দ্বার দিল।

তাহার কাছে বিহারীর কিছুই ছিল না, ছবি না, একচত্র চিঠি না, কিছুই না। সে শূন্যের মধ্যে কিছু যেন একটা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বিহারীর একটা- কিছু চিহ্নকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া শুক্ষ চক্ষে জল আনিতে চায়। অশ্রুজলে অন্তরের সমস্ত কঠিনতাকে গলাইয়া বিদ্রোহবহিকে নির্বাপিত করিয়া বিহারীর কঠোর আদেশকে হন্দয়ের কোমলতম প্রেমের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির মধ্যাহ্ন- আকাশের মতো তাহার হন্দয় কেবল জ্বলিতেই লাগিল, দিগ্নিগন্তে কোথাও সে এক ফোঁটাও

অশ্রু লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

বিনোদিনী শুনিয়াছিল, একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে যাহাকে ডাকা যায়, সে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জোড়হাত করিয়া চোখ বুজিয়া সে বিহারীকে ডাকিতে লাগিল, “আমার জীবন শূন্য, আমার হন্দয় শূন্য, আমার চতুর্দিক শূন্য— এই শূন্যতার মাঝখানে একবার তুমি এসো, এক মুহূর্তের জন্য এসো, তোমাকে আসিতেই হইবে, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না।”

এই কথা প্রাণপণ বলে বলিতে বলিতে বিনোদিনী যেন যথার্থ বল পাইল। মনে হইল, যেন এই প্রেমের বল, এই আহ্বানের বল, বৃথা হইবে না। কেবল স্মরণমাত্র করিয়া, দুরাশার গোড়ায় হন্দয়ের রক্ত সেচন করিয়া হন্দয় কেবল অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ একমনে ধ্যান করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে কামনা করিতে থাকিলে নিজেকে যেন সহায়বান মনে হয়। মনে হয়, যেন প্রবল ইচ্ছা জগতের আর- সমস্ত ছাড়িয়া কেবল বাণ্ডিতকে আকর্ষণ করিতে থাকাতে প্রতিমুহূর্তে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে নিকটবর্তী হইতেছে।

বিহারীর ধ্যানে যখন সন্ধ্যার দীপশূন্য অন্ধকার ঘর নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে— যখন সমাজ- সংসার, গ্রাম- পল্লী, সমস্ত বিশ্বভূবন প্রলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে— তখন বিনোদিনী হঠাৎ দ্বারে আঘাত

শুনিয়া ভূমিতল হইতে দ্রুতবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল, অসংশয় বিশ্বাসে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল, “প্রভু, আসিয়াছ?” তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল, এই মুহূর্তে জগতের আর কেহই তাহার দ্বারে আসিতে পারে না।

মহেন্দ্র কহিল, “আসিয়াছি, বিনোদ।”

বিনোদিনী অপরিসীম বিরাগ ও প্রচণ্ড ধিক্কারের সহিত বলিয়া উঠিল, “যাও যাও, যাও এখান হইতে। এখনই যাও।”

মহেন্দ্র অকস্মাত স্তম্ভিত হইয়া গেল।

“হ্যালা বিন্দি, তোর দিদিশাশুড়ি যদি কাল”— এই কথা বলিতে কোনো প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী বিনোদিনীর দ্বারের কাছে আসিয়া “ও মা” বলিয়া মস্ত ঘোমটা টানিয়া সবেগে পলায়ন করিল।

অধ্যায় - ৩৯

পাড়ায় ভারি একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। পল্লীবৃক্ষেরা চম্পীমণ্ডপে বসিয়া কহিল, “এ কখনোই সহ্য করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় কী ঘটিতেছিল, তাহা কানে না তুলিলেও চলিত, কিন্তু এমন সাহস যে মহেন্দ্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া পাড়ায় আনিয়া এমন প্রকাশ্য নির্লজ্জতা ! এরূপ ভষ্টাকে গ্রামে রাখিলে তো চলিবে না।”

বিনোদিনী আজ নিশ্চয় আশা করিয়াছিল, বিহারীর পত্রের উত্তর পাইবে, কিন্তু উত্তর আসিল না। বিনোদিনী মনে মনে বলিতে লাগিল, ‘আমার উপরে বিহারীর কিসের অধিকার। আমি কেন তাহার হৃকুম শুনিতে গেলাম। আমি কেন তাহাকে বুঝিতে দিলাম যে, সে আমার প্রতি যেমন বিধান করিবে আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব। তাহার ভালোবাসার আশাকে বাঁচাইবার জন্য যেটুকু দরকার, আমার সঙ্গে কেবলমাত্র তাহার সেইটুকু সম্পর্ক? আমার নিজের কোনো প্রাপ্য নাই, দাবি নাই, সামান্য দুই ছত্র চিঠি ও না— আমি এত তুচ্ছ, এত স্থগার সামগ্ৰী?’ তখন ঈর্ষার বিষে বিনোদিনীর সমস্ত বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল— সে কহিল, ‘আর- কাহারোও জন্য এত দুঃখ সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আশার জন্য নয়। এই দৈন্য, এই বনবাস, এই লোকনিন্দা, এই অবজ্ঞা, এই জীবনের সকলপ্রকার অপরিতৃপ্তি, কেবল আশারই জন্য আমাকে বহন করিতে হইবে— এতবড়ো ফাঁকি কেন আমি মাথায় করিয়া লইলাম। কেন আমার সর্বনাশের ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া আসিলাম না। নির্বোধ, আমি নির্বোধ। আমি কেন বিহারীকে ভালোবাসিলাম।’

বিনোদিনী যখন কাঠের মূর্তির মতো ঘরের মধ্যে কঠিন হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় তাহার দিদিশাশুড়ি জামাইবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহাকে কহিল, ‘পোড়ারমুখী, কী সব কথা শুনিতেছি।’

বিনোদিনী কহিল, “যাহা শুনিতেছ সবই সত্য কথা।”

দিদিশাশুড়ি। তবে এ কলঙ্ক পাড়ায় বহিয়া আনিবার কী দরকার ছিল— এখানে কেন আসিলি।

ରୁକ୍ଷ କ୍ଷୋଭେ ବିନୋଦିନୀ ଚୂପ କରିଯା ବସିଯା ରହିଲ । ଦିଦିଶାଶୁଣ୍ଡି କହିଲ, “ବାହା, ଏଥାନେ ତୋମାର ଥାକା ହିଁବେ ନା, ତାହା ବଲିତେଛି । ପୋଡ଼ା ଅନ୍ତେ ଆମାର ସବାଇ ମରିଯା- ବରିଯା ଗେଲ, ଇହାଓ ସହ୍ୟ କରିଯା ବାଁଚିଯା ଆଛି, କିନ୍ତୁ ତାଇ ବଲିଯା ଏ- ସକଳ ବ୍ୟାପାର ଆମି ସହିତେ ପାରିବ ନା । ଛି ଛି, ଆମାଦେର ମାଥା ହେଁଟ କରିଲେ । ତୁମି ଏଖନଇ ଯାଓ ।”

ବିନୋଦିନୀ କହିଲ, “ଆମି ଏଖନଇ ଯାଇବ ।”

ଏମନ ସମୟ ମହେନ୍ଦ୍ର, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆହାର ନାହିଁ, ଉକ୍ତଖୁକ୍ଷ ଚୁଲ କରିଯା ହଠାତ୍ ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହିଁଲ । ସମସ୍ତ ରାତ୍ରିର ଅନିଦ୍ରାଯ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ ଶୁକ୍ଷ । ଅନ୍ଧକାର ଥାକିତେଇ ତୋରେ ଆସିଯା ସେ ବିନୋଦିନୀକେ ଲାଇୟା ଯାଇବାର ଜନ୍ୟ ଦିତୀୟ ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏଇରୂପ ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଦିନେ ବିନୋଦିନୀର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘ୍ୟାଗାର ଅଭିଘାତ ପାଇୟା ତାହାର ମନେ ନାନାପ୍ରକାର ଦ୍ଵିଧାର ଉଦୟ ହିଁତେ ଲାଗିଲ । କ୍ରମେ ଯଥନ ବେଳା ହିଁଯା ଗେଲ, ରେଲଗାଡ଼ିର ସମୟ ଆସନ୍ତ ହିଁଯା ଆସିଲ, ତଥନ ସ୍ଟେଶନ୍ରେ ଯାତ୍ରିଶାଳା ହିଁତେ ବାହିର ହିଁଯା, ମନ ହିଁତେ ସର୍ବପ୍ରକାର ବିଚାର- ବିତର୍କ ସବଲେ ଦୂର କରିଯା, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯା ମହେନ୍ଦ୍ର ଏକେବାରେ ବିନୋଦିନୀର ଦ୍ୱାରେ ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହିଁଯାଛେ । ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କରିଯା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦୁଃସାହସର କାଜ କରିତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହିଁଲେ ଯେ ଏକଟା ସ୍ପର୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲ ଜନ୍ୟେ, ସେଇ ବଲେର ଆବେଗେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏକଟା ଉଦ୍ଭରାତ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କରିଲ- ତାହାର ସମସ୍ତ ଅବସାଦ ଓ ଦ୍ଵିଧା ଚର୍ଣ୍ଣ ହିଁଯା ଗେଲ । ଗ୍ରାମେର କୌତୁଳୀ ଲୋକଗୁଲି ତାହାର ଉନ୍ୟନ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଧୂଲିର ନିଜୀବ ପୁତ୍ରଲିକାର ମତୋ ବୋଧ ଲାଇଲ । ମହେନ୍ଦ୍ର କୋନୋଦିକେ ଦ୍ରକ୍ଷପାତମାତ୍ର ନା କରିଯା ଏକେବାରେ ବିନୋଦିନୀର କାଛେ ଆସିଯା କହିଲ, ‘‘ବିନୋଦ, ଲୋକନିନ୍ଦାର ମୁଖେ ତୋମାକେ ଏକଳା ଫେଲିଯା ଯାଇବ, ଏମନ କାପୁରୁଷ ଆମି ନାହିଁ । ତୋମାକେ ଯେମନ କରିଯା ହଟୁକ, ଏଥାନେ ହିଁତେ ଲାଇୟା ଯାଇତେଇ ହିଁବେ । ତାହାର ପରେ ତୁମ ଆମାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେ ଚାଓ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯୋ, ଆମି ତୋମାକେ କିଛୁମାତ୍ର ବାଧା ଦିବ ନା । ଆମି ତୋମାକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯା ଆଜ ଶପଥ କରିଯା ବଲିତେଛି, ତୁମ ଯଥନ ଯେମନ ଇଚ୍ଛା କର ତାହାଇ ହିଁବେ- ଦୟା ଯଦି କର ତବେ ବାଁଚିବ; ନା ଯଦି କର ତବେ ତୋମାର ପଥ ହିଁତେ ଦୂରେ ଚଲିଯା ଯାଇବ । ଆମି ସଂସାରେ ନାନା ଅବିଶ୍ଵାସେର କାଜ କରିଯାଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଆମାକେ ଅବିଶ୍ଵାସ କରିଯୋ ନା । ଆମରା ପ୍ରଲୟେର ମୁଖେ ଦାଁଡ଼ାଇୟାଛି, ଏଥନ ଛଲନା କରିବାର ସମୟ ନହେ ।’’

ବିନୋଦିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜଭାବେ ଅବିଚଲିତ- ମୁଖେ କହିଲ, ‘‘ଆମାକେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇୟା ଚଲୋ । ତୋମାର ଗାଡ଼ି ଆଛେ?’’

ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲ, ‘‘ଆଛେ ।’’

ବିନୋଦିନୀର ଦିଦିଶାଶୁଣ୍ଡି ଘର ହିଁତେ ବାହିର ହିଁଯା ଆସିଯା କହିଲ, ‘‘ମହେନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ଆମାକେ ଚେନ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମି ଆମାର ପର ନାହିଁ । ତୋମାର ମା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମାଦେର ଗ୍ରାମେରଇ ମେଯେ, ଗ୍ରାମମ୍ପର୍କେ ଆମି ତାହାର ମାମୀ । ଜିଜ୍ଞାସା କରି, ଏ ତୋମାର କୀ ରକମ ବ୍ୟବହାର । ଘରେ ତୋମାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଛେ, ମା ଆଛେ, ଆର ତୁମି ଏମନ ବେହାୟା ହିଁଯା, ଉନ୍ୟନ ହିଁଯା ଫିରିତେଛ ! ଭଦ୍ରସମାଜେ ତୁମି ମୁଖ ଦେଖାଇବେ କୀ ବଲିଯା ।’’

ମହେନ୍ଦ୍ର ଯେ ଭାବୋନ୍ମାଦେର ରାଜ୍ୟେ ଛିଲ, ସେଥାନେ ଏହି ଏକଟା ଆଘାତ ଲାଗିଲ । ତାହାର ମା ଆଛେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଛେ, ଭଦ୍ରସମାଜ ବଲିଯା ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ଆଛେ । ଏହି ସହଜ କଥାଟା ନୂତନ କରିଯା ଯେନ ମନେ ଉଠିଲ । ଏହି ଅଜାତ ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀର ଅପରିଚିତ ଗୃହଦାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରକେ ଯେ ଏମନ କଥା ଶୁଣିତେ ହିଁବେ, ଇହା ତାହାର ଏକ ସମୟ ସ୍ଵପ୍ନେରେ ଅତୀତ ଛିଲ, ଦିନେର ବେଳାଯ ଗ୍ରାମେର ମାରଖାନେ ଦାଁଡ଼ାଇୟା ସେ ଏକଟି ଭଦ୍ରଦାରେ ବିଧବା ରମଣୀକେ ଘର ହିଁତେ ପଥେ ବାହିର କରିତେଛେ, ମହେନ୍ଦ୍ରର ଜୀବନଚାରିତେ ଏମନ୍ତ ଏକଟା ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଲିଖିତ ହିଁଲ । ତବୁ ତାହାର ମା ଆଛେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଛେ ଏବଂ ଭଦ୍ରସମାଜ ଆଛେ ।

মহেন্দ্র যখন নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন বৃদ্ধা কহিল, “যাইতে হয় তো এখনই যাও, এখনই যাও। আমার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না— আর এক মুহূর্তও দেরি করিয়ো না।”

বলিয়া বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রংব করিয়া দিল। অন্নাত অভুক্ত মলিনবস্ত্র বিনোদিনী শূন্য হস্তে গাড়িতে গিয়া উঠিল। মহেন্দ্র যখন গাড়িতে উঠিতে গেল, বিনোদিনী কহিল, ‘না, স্টেশন দূরে নয়, তুমি হাঁটিয়া যাও।’

মহেন্দ্র কহিল, “তাহা হইলে গ্রামের সকল লোক আমাকে দেখিতে পাইবে।”

বিনোদিনী কহিল, “এখনো তোমার লজ্জার বাকি আছে?” বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া বিনোদিনী গাড়োয়ানকে বলিল, “স্টেশনে চলো।”

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু যাইবে না?”

মহেন্দ্র একটু ইতস্তত করিয়া আর যাইতে সাহস করিল না। গাড়ি চলিয়া গেল। মহেন্দ্র গ্রামের পথ পরিত্যাগ করিয়া মাঠের পথ দিয়া ঘুরিয়া নতশিরে স্টেশনের অভিমুখে চলিল।

তখন গ্রামবধূদের স্নানাহার হইয়া গেছে। কেবল যে- সকল কর্মনিষ্ঠা প্রৌঢ়া গৃহিণী বিলম্বে অবকাশ পাইয়াছে, তাহারাই গামছা ও তেলের বাটি লইয়া আত্মমুকুলে আমোদিত ছায়াশিঙ্খ পুক্ষরিণীর নিভৃত ঘাটে চলিয়াছে।

অধ্যায় - ৪০

মহেন্দ্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, সেই আশক্ষায় রাজলক্ষ্মীর আহারনিদ্বা বন্ধ। সাধুচরণ সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট সকল স্থানেই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে— এমন সময় মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। পটলভাঙার বাসায় তাহাকে রাখিয়া রাত্রে মহেন্দ্র তাহার বাড়িতে আসিয়া পৌছিল।

মাতার ঘরে মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকারপ্রায়, কেরোসিনের লঞ্চন আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী রোগীর ন্যায় বিছানায় শুইয়া আছেন এবং আশা পদতলে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এতকাল পরে গৃহের বধূ শাশুড়ির পদতলের অধিকার পাইয়াছে।

মহেন্দ্র আসিতেই আশা চকিত হইয়া উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বলপূর্বক সর্বপ্রকার দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া কহিল, “মা, এখানে আমার পড়ার সুবিধা হয় না; আমি কালেজের কাছে একটা বাসা লইয়াছি; সেইখানেই থাকিব।”

রাজলক্ষ্মী বিছানার প্রান্তে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মহেন্দ্রকে কহিলেন, “মহিন, একটু বোস।”

মহেন্দ্র সংকোচের সহিত বিছানায় বসিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘মহিন, তোর যেখানে ইচ্ছা তুই থাকিস, কিন্তু আমার বউমাকে তুই কষ্ট দিস নে।’

মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার মন্দ কপাল, তাই আমি আমার এমন লক্ষ্মী বউকে চিনিতে পারি নাই”– বলিতে বলিতে রাজলক্ষ্মীর গলা ভাঙিয়া আসিল– “কিন্তু তুই তাহাকে এতদিন জানিয়া, এত ভালোবাসিয়া, শেষকালে এত দুঃখের মধ্যে ফেলিলি কী করিয়া।” রাজলক্ষ্মী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র সেখান হইতে কোনোমতে উঠিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু হঠাৎ উঠিতে পারিল না। মার বিছানার প্রান্তে অঙ্ককারে নিষ্ঠন্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আজ রাত্রে তো এখানেই আছিস?”

মহেন্দ্র কহিল, “না।”

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন যাবি।”

মহেন্দ্র কহিল, “এখনই।”

রাজলক্ষ্মী কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, “এখনই? একবার বউমার সঙ্গে ভালো করিয়া দেখাও করিয়া যাবি না?”

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এ- কয়টা দিন বউমার কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা কি তুই একটু বুঝিতেও পারিলি না। ওরে নির্জন, তোর নিষ্ঠুরতায় আমার বুক ফাটিয়া গেল।” বলিয়া রাজলক্ষ্মী ছিন্ন শাখার মতো শুইয়া পড়িলেন।

মহেন্দ্র মার বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অতি মন্দুপদে নিঃশব্দগমনে সে সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরের শয়নঘরে চলিল। আশার সহিত দেখা হয়, এ তাহার ইচ্ছা ছিল না।

মহেন্দ্র উপরে উঠিয়াই দেখিল, তাহার শয়নঘরের সমুখে যে ঢাকা ছাদ আছে, সেইখানে আশা মাটিতে পড়িয়া। সে মহেন্দ্রের পায়ের শব্দ পায় নাই, হঠাৎ তাহাকে সমুখে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া লইয়া উঠিয়া বসিল। এই সময়ে মহেন্দ্র যদি একটিবার ডাকিত ‘চুনি’– তবে তখনই সে মহেন্দ্রের সমস্ত অপরাধ যেন নিজেরই মাথায় তুলিয়া লইয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধিনীর মতো মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার জীবনের সমস্ত কানাটা কাঁদিয়া লইত। কিন্তু মহেন্দ্র সে প্রিয় নাম ডাকিতে পারিল না। যতই সে চেষ্টা করিল, ইচ্ছা করিল, যতই সে বেদনা পাইল, এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, আজ আশাকে আদর করা শূন্যগর্ভ পরিহাসমাত্র। তাহাকে মুখে সান্ত্বনা দিয়া কী হইবে, যখন বিনোদনীকে পরিত্যাগ করিবার পথ মহেন্দ্র নিজের হাতে একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আশা সংকোচে মরিয়া গিয়া বসিয়া রহিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে, চলিয়া যাইতে, কোনোপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইল। মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পায়চারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তখনো চাঁদ ওঠে নাই– ছাদের কোণে একটা ছোটো গামলায় রজনীগন্ধার গাছে দুইটি ডাঁটায় ফুল ফুটিয়াছে। ছাদের উপরকার অঙ্ককার আকাশে ঐ নক্ষত্রগুলি– ঐ সপ্তর্ষি, ঐ কালপুরূষ, তাহাদের অনেক সন্ধ্যার অনেক নিভৃত প্রেমাভিনয়ের নীরব সান্কী ছিল, আজও তাহারা নিষ্ঠন্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, মাঝখানের কঠিমাত্র দিনের বিপ্লবকাহিনী এই আকাশভরা অঙ্ককার দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া যদি আগেকার ঠিক সেই দিনের মতো এই খোলা ছাদে মাদুর পাতিয়া আশার পাশে আমার সেই চিরস্তন স্থানটিতে অতি অনায়াসে গিয়া বসিতে পারি। কোনো প্রশ্ন নাই, জবাবদিহি নাই, সেই বিশ্বাস, সেই প্রেম, সেই সহজ আনন্দ ! কিন্তু হায়, জগৎসংসারে সেইটুকুমাত্র জায়গায় ফিরিবার পথ আর নাই। এই ছাদে আশার পাশে মাদুরের একটুখানি ভাগ মহেন্দ্র একেবারে হারাইয়াছে। এতদিন বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল। ভালোবাসিবার উন্মত্ত সুখ ছিল, কিন্তু তাহার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল না। এখন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে সমাজ হইতে স্বত্ত্বে ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, এখন আর বিনোদিনীকে কোথাও রাখিবার, কোথাও ফিরাইয়া দিবার জায়গা নাই— মহেন্দ্রই তাহার একমাত্র নির্ভর। এখন ইচ্ছা থাক বা না থাক, বিনোদিনীর সমস্ত ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে। এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল। তাহাদের ছাদের উপরকার এই ঘরকল্পা, এই শান্তি, এই বাধাবিহীন দাম্পত্যমিলনের নিভৃত রাত্রি, হঠাৎ মহেন্দ্রের কাছে বড়ো আরামের বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই সহজসূলভ আরাম, যাহাতে একমাত্র তাহারই অধিকার, তাহাই আজ মহেন্দ্রের পক্ষে দুরাশার সামগ্রী। চিরজীবনের মতো যে- বোৰা সে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহা নামাইয়া মহেন্দ্র এক মুহূর্তও হাঁপ ছাড়িতে পারিবে না।

দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া মহেন্দ্র একবার আশার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিষ্ঠুর রোদনে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আশা তখনো নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে— রাত্রির অঙ্ককার জননীর অঞ্চলের ন্যায় তাহার লজ্জা ও বেদনা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র পায়চারি ভঙ্গ করিয়া কী বলিবার জন্য হঠাৎ আশার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরের রক্ত আশার কানের মধ্যে গিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মহেন্দ্র কী বলিতে আসিয়াছিল, তাবিয়া পাইল না, তাহার কীই বা বলিবার আছে। কিন্তু কিছু- একটা না বলিয়া আর ফিরিতে পারিল না। বলিল, ‘চাবির গোছাটা কোথায়।’

চাবির গোছা ছিল বিছানার গদিটার নীচে। আশা উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল— মহেন্দ্র তাহার অনুসরণ করিল। গদির নীচে হইতে চাবি বাহির করিয়া আশা গদির উপরে রাখিয়া দিল। মহেন্দ্র চাবির গোছা লইয়া নিজের কাপড়ের আলমারিতে এক- একটি চাবি লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। আশা আর থাকিতে পারিল না, মৃদুস্বরে কহিল, “ও- আলমারির চাবি আমার কাছে ছিল না।”

কাহার কাছে চাবি ছিল সে কথা আশার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কিন্তু মহেন্দ্র তাহা বুঝিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ভয় হইল, পাছে মহেন্দ্রের কাছে আর তাহার কাঙ্গা চাপা না থাকে। অঙ্ককারে ছাদের প্রাচীরের এক কোণে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত রোদনকে প্রাণপণে রুক্ষ করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু অধিকক্ষণ কাঁদিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহেন্দ্রের আহারের সময় হইয়াছে। দ্রুতপদে আশা নীচে চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহিন কোথায়, বউমা।”

আশা কহিল, ‘তিনি উপরে।’

রাজলক্ষ্মী। তুমি নামিয়া আসিলে যে।

আশা নতমুখে কহিল, “তাঁহার খাবার—”

রাজলক্ষ্মী। খাবারের আমি ব্যবস্থা করিতেছি, বউমা, তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও। তোমার সেই নৃতন ঢাকাই শাড়িখানা শীত্র পরিয়া আমার কাছে এসো, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।

শাশুড়ির আদর উপেক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এই সাজসজ্জার প্রস্তাবে আশা মরমে মরিয়া গেল। মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীত্তি যেরূপ সন্ধি হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আশা ও সেরূপ রাজলক্ষ্মীর কৃত সমস্ত প্রসাধন পরমধৈর্যে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিল।

সাজ করিয়া আশা অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। উকি দিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ছাদে নাই। আন্তে আন্তে দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ঘরেও নাই, তাহার খাবার অভুক্ত পড়িয়া আছে।

চাবির অভাবে কাপড়ের আলমারি জোর করিয়া খুলিয়া আবশ্যক কয়েকখান কাপড় ও ডাঙ্ডারি বই লইয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেছে।

পরদিন একাদশী ছিল। অসুস্থ ক্লিষ্টদেহ রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে ঘন মেঘে ঝড়ের উপক্রম করিয়াছে। আশা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আন্তে আন্তে রাজলক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, “তোমার দুধ ও ফল আনিয়াছি, খাবে এসো।”

করুণমূর্তি বধূর এই অনভ্যস্ত সেবার চেষ্টা দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর শুক্র চক্র প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া আশাকে কোলে লইয়া তাহার অশ্রজলসিক্ত কপোল চুম্বন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহিন এখন কী করিতেছে বউমা।’

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইল— মৃদুস্বরে কহিল, “তিনি চলিয়া গেছেন।”

রাজলক্ষ্মী। কখন চলিয়া গেল, আমি তো জানিতেও পারি নাই।

আশা নতশিরে কহিল, “তিনি কাল রাত্রেই গেছেন।”

শুনিবামাত্র রাজলক্ষ্মীর সমস্ত কোমলতা যেন দূর হইয়া গেল— বধূর প্রতি তাঁহার আদরস্পর্শের মধ্যে আর রসলেশমাত্র রহিল না। আশা একটা নীরব লাঞ্ছনা অনুভব করিয়া নতমুখে আন্তে আন্তে চলিয়া গেল।

অধ্যায় - ৪১

প্রথম রাতে বিনোদিনীকে পটলডাঙ্গার বাসায় রাখিয়া মহেন্দ্র যখন তাহার কাপড় ও বই আনিতে বাড়ি গেল, বিনোদিনী তখন কলিকাতার বিশ্রামবিহীন জনতরঙ্গের কোলাহলে একলা বসিয়া নিজের কথা ভাবিতেছিল। প্রথমীতে তাহার আশ্রয়স্থান কোনোকালেই যথেষ্ট বিস্তীর্ণ ছিল না, তবু তাহার এক পাশ তাতিয়া উঠিলে আর- একপাশে ফিরিয়া শুইবার একটুখানি জায়গা ছিল- আজ তাহার নির্ভরস্থল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যে নৌকায় চড়িয়া প্রোতে ভাসিয়াছে, তাহা দক্ষিণে বামে একটু কাত হইলেই একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে। অতএব বড়োই স্থির হইয়া হাল ধরা চাই, একটু ভুল, একটু নাড়াচাড়া সহিবে না। এ অবস্থায় কোন্ রমণীর হৃদয় না কম্পিত হয়। পরের মন সম্পূর্ণ বশে রাখিতে যেটু লীলাখেলা চাই, যেটুকু অন্তরালের প্রয়োজন, এই সংকীর্ণতার মধ্যে তাহার অবকাশ কোথায়। একেবারে মহেন্দ্রের সহিত মুখোমুখি করিয়া তাহাকে সমস্ত জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রভেদ এই যে মহেন্দ্রের কূলে উঠিবার উপায় আছে, কিন্তু বিনোদিনীর তাহা নাই।

বিনোদিনী নিজের এই অসহায় অবস্থা যতই সুস্পষ্ট বুবিল ততই সে মনের মধ্যে বলসঞ্চয় করিতে লাগিল। একটা উপায় তাহাকে করিতেই হইবে, এ ভাবে তাহার চলিবে না।

যেদিন বিহারীর কাছে বিনোদিনী নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছে, সেদিন হইতে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে। যে উদ্যত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ হইতে সে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে, জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় দেবতার উদ্দেশে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে। বিনোদিনীর হৃদয় কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না—নৈরাশ্যকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, ‘আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।’

বিনোদিনীর এই দুর্দান্ত প্রেমের উপরে তাহার আত্মরক্ষার একান্ত আকাঙ্ক্ষা যোগ দিল। বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব ভালো করিয়াই জানিয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিতে গেলে সে ভর সয় না— তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিন্ত বিশ্বস্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যক, বিহারীই তাহা দিতে পারে। আজ আর বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিবে না।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার দিন তাহার নামের সমস্ত চিঠিপত্র নৃতন ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য মহেন্দ্রকে দিয়া বিনোদিনী স্টেশনের সংলগ্ন পোস্ট- আপিসে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছিল। বিহারী যে একেবারেই তাহার চিঠির কোনো উত্তর দিবে না, এ কথা বিনোদিনী কোনোমতেই স্বীকার করিল না— সে বলিল, ‘আমি সাতটা দিন ধৈর্য ধরিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিব, তাহার পরে দেখা যাইবে।’

এই বলিয়া বিনোদিনী অঙ্ককারে জানালা খুলিয়া গ্যাসালোকদীপ্তি কলিকাতার দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিল। এই সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এই শহরের মধ্যেই আছে— ইহারই গোটাকতক রাস্তা ও গলি পার হইয়া গেলেই এখনই তাহার দরজার কাছে পৌছানো যাইতে পারে— তাহার পরে সেই জলের কলওয়ালা ছোটো আঙিনা, সেই সিঁড়ি, সেই সুসজ্জিত পরিপাটি আলোকিত নিভৃত ঘরটি— সেখানে নিষ্ঠক শান্তির মধ্যে বিহারী একলা কেদারায় বসিয়া আছে— হয়তো কাছে সেই ব্রাক্ষণ- বালক, সেই সুগোল সুন্দর গৌরবণ্ণ আয়তনের সরলমূর্তি ছেলেটি নিজের মনে ছবির বই লইয়া পাতা উলটাইতেছে— একে একে সমস্ত চিত্রটা

মনে করিয়া ন্মেহে প্রেমে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিলে এখনই যাওয়া যায়, ইহাই মনে করিয়া বিনোদিনী ইচ্ছাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল। আগে হইলে হয়তো সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে অগ্রসর হইত; কিন্তু এখন অনেক কথা ভাবিতে হয়। এখন শুধু বাসনা চরিতার্থ করা নয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বিনোদিনী কহিল, ‘আগে দেখি বিহারী কিরণ উত্তর দেয় তাহার পরে কোনু পথে চলা আবশ্যক, স্থির করা যাইবে।’ কিছু না বুঝিয়া বিহারীকে বিরক্ত করিতে যাইতে তাহার আর সাহস হইল না।

এইরূপ ভাবিতে যখন রাত্রি নয়টা- দশটা বাজিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত। কয়দিন অনিদ্রায় অনিয়মে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় সে কাটাইয়াছে; আজ কৃতকার্য হইয়া বিনোদিনীকে বাসায় আনিয়া একেবারে অবসাদ ও শ্রান্তিতে তাহাকে যেন অভিভূত করিয়া দিয়াছে। আজ আর সংসারের সঙ্গে নিজের অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিবার বল যেন তাহার নাই। তাহার সমস্ত ভারাক্রান্ত ভাবী জীবনের ক্লান্তি যেন তাহাকে আজ আগে হইতে আক্রমণ করিল।

রূপ্ত্ব দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ঘা দিতে মহেন্দ্রের অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে উন্মত্তায় সমস্ত প্রথিবীকে সে লক্ষ্য করে নাই, সে মন্ততা কোথায়। পথের অপরিচিত লোকদের দৃষ্টির সমুখ্যেও তাহার সর্বাঙ্গ সংকুচিত হইতেছে কেন।

ভিতরে নৃতন চাকরটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে— দরজা খোলাইতে অনেক হাঙ্গাম করিতে হইল। অপরিচিত নৃতন বাসার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্রের মন দমিয়া গেল। মাতার আদরের ধন মহেন্দ্রের চিরদিন যে বিলাস- উপকরণে, যে- সকল টানাপাখা ও মূল্যবান চৌকি- সোফায় অভ্যন্ত, বাসার নৃতন আয়োজনে তাহার অভাব সেই সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। এই- সমস্ত আয়োজন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে, বাসার সমস্ত ব্যবস্থার ভার তাহারই উপরে। মহেন্দ্র কখনো নিজের বা পরের আরামের জন্য চিন্তা করে নাই— আজ হইতে একটি নৃতন গঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। সিঁড়িতে একটা কেরোসিনের ডিবা অপর্যাপ্ত ধূমোদগার করিয়া মিটামিট করিতেছিল— তাহার পরিবর্তে একটা ভালো ল্যাম্প কিনিতে হইবে। বারান্দা বাহিয়া সিঁড়িতে উঠিবার রাস্তাটা কলের জলের প্রবাহে স্যাতস্যাত করিতেছে— মিন্তি ডাকাইয়া বিলাতি মাটির দ্বারা সে জ্যায়গা মেরামত করা আবশ্যক। রাস্তার দিকের দুটো ঘর যে জুতার দোকানদারদের হাতে ছিল, তাহারা সে দুটো ঘর এখনো ছাড়ে নাই, তাহা লইয়া বাড়িওয়ালার সহিত লড়াই করিতে হইবে। এই- সমস্ত কাজ তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই চকিতের মধ্যে মনে উদয় হইয়া তাহার শ্রান্তির বোঝায় আরো বোঝা চাপিল।

মহেন্দ্র সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল— বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে প্রেম ছিল, তাহাকে উত্তেজিত করিল। নিজেকে বুঝাইল যে, এতদিন সমস্ত প্রথিবীকে ভুলিয়া সে যাহাকে চাহিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই— আজ মহেন্দ্রের আনন্দের দিন। কিন্তু কোনো বাধা যে নাই, তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়ে বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাধা।

বিনোদিনী রাস্তা হইতে মহেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিল, এবং একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল— এই সেলাই বিনোদিনীর আবরণ, ইহার অন্তরালে তাহার যেন একটা আশ্রয় আছে।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, “বিনোদ, এখানে নিশ্চয় তোমার অনেক অসুবিধা ঘটিতেছে।”

বিনোদিনী সেলাই করিতে বলিল, ‘কিছুমাত্র না।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আমি আর দুই- তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত আসবাব আনিয়া উপস্থিত করিব, এই কয়দিন তোমাকে একটু কষ্ট পাইতে হইবে।’

বিনোদিনী কহিল, ‘না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না— তুমি আর একটিও আসবাব আনিয়ো না, এখানে যাহা আছে তাহা আমার আবশ্যকের চেয়ে চের বেশি।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আমি- হতভাগ্যও কি সেই চের বেশির মধ্যে।’

বিনোদিনী। নিজেকে অত ‘বেশি’ মনে করিতে নাই— একটু বিনয় থাকা ভালো। সেই নির্জন দীপালোকে কর্মরত নতশির বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি দেখিয়া মুহূর্তের মধ্যে মহেন্দ্রের মনে আবার সেই মোহের সংগ্রাম হইল।

বাড়িতে হইলে ছুটিয়া সে বিনোদিনীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়িত— কিন্তু এ তো বাড়ি নহে, সেইজন্য মহেন্দ্র তাহা পারিল না। আজ বিনোদিনী অসহায়, একান্তই সে মহেন্দ্রের আয়ত্তের মধ্যে, আজ নিজেকে সংযত না রাখিলে বড়োই কাপুরূষতা হয়।

বিনোদিনী কহিল, “এখানে তুমি তোমার বই- কাপড়গুলা আনিলে কেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “ওগুলাকে যে আমি আমার আবশ্যকের মধ্যেই গণ্য করি। ওগুলা ‘চের বেশির দলে নয়।’”

বিনোদিনী। জানি, কিন্তু এখানে ও- সব কেন।

মহেন্দ্র। সে ঠিক কথা, এখানে কোনো আবশ্যক জিনিস শোভা পায় না— বিনোদ, বইটাইগুলো তুমি রাস্তায় টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়ো, আমি আপনিমাত্র করিব না, কেবল সেইসঙ্গে আমাকেও ফেলিয়ো না।

বলিয়া এই উপলক্ষে মহেন্দ্র একটুখানি সরিয়া আসিয়া কাপড়ে- বাঁধা বইয়ের পুঁটুলি বিনোদিনীর পায়ের কাছে আনিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী গন্তীরমুখে সেলাই করিতে করিতে মাথা না তুলিয়া কহিল, ‘ঠাকুরপো, এখানে তোমার থাকা হইবে না।’

মহেন্দ্র তাহার সদ্যোজাগ্রত আগ্রহের মুখে প্রতিঘাত পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল— গদ্গদকঢে কহিল, “কেন বিনোদ, কেন তুমি আমাকে দূরে রাখিতে চাও। তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কি এই পাইলাম।”

বিনোদিনী। আমার জন্য তোমাকে সমস্ত ত্যাগ করিতে দিব না।

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, “এখন সে আর তোমার হাতে নাই— সমস্ত সংসার আমার চারি দিক হইতে স্থলিত হইয়া পড়িয়াছে— কেবল তুমি একলা আছ, বিনোদ! বিনোদ- বিনোদ— ”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়া বিহুলভাবে বিনোদিনীর পা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার পদপল্লব বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল।

বিনোদিনী পা ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “মহেন্দ্র, তুমি কী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে মনে নাই?”

সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্র আত্মসংবরণ করিয়া লইল—কহিল, “মনে আছে। শপথ করিয়াছিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি কখনো তাহার কোনো অন্যথা করিব না। সেই শপথই রক্ষা করিব। কী করিতে হইবে, বলো।”

বিনোদিনী। তুমি তোমার বাড়িতে গিয়া থাকিবে।

মহেন্দ্র। আমিই কি তোমার একমাত্র অনিচ্ছার সামগ্ৰী, বিনোদ ! তাই যদি হইবে, তবে তুমি আমাকে টানিয়া আনিলে কেন। যে তোমার ভোগের সামগ্ৰী নয়, তাহাকে শিকার করিবার কী প্ৰয়োজন ছিল। সত্য করিয়া বলো, আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমার কাছে ধৰা দিয়াছি, না তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাকে ধৰিয়াছ। আমাকে লইয়া তুমি এইরূপ খেলা করিবে, ইহাও কি আমি সহ্য করিব। তবু আমি আমার শপথ পালন করিব—যে বাড়িতে আমি নিজের স্থান পদাঘাতে চূৰ্ণ করিয়া ফেলিয়াছি সেই বাড়িতে গিয়াই আমি থাকিব।

বিনোদিনী ভূমিতে বসিয়া পুনৱায় নিরৃত্বে সেলাই করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, “নিষ্ঠুর, বিনোদ, তুমি নিষ্ঠুর ! আমি অত্যন্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছি।”

বিনোদিনী সেলাইয়ে একটা ভুল করিয়া আলোর কাছে ধৰিয়া তাহা বহুযত্নে পুনৰ্বার খুলিতে লাগিল। মহেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বিনোদিনীর ঐ পাষাণ হৃদয়টাকে নিজের কঠিন মুষ্টিৰ মধ্যে সবলে চাপিয়া তাঙ্গিয়া ফেলে। এই নীৱৰ নির্দয়তা ও অবিচলিত উপেক্ষাকে প্ৰবল আঘাত করিয়া যেন বাহুবলের দ্বারা পৰাস্ত করিতে ইচ্ছা করে।

মহেন্দ্র ঘৰ হইতে বাহির হইয়া পুনৱায় ফিরিয়া আসিল— কহিল, “আমি না থাকিলে এখানে একাকিনী তোমাকে কে রক্ষা করিবে।”

বিনোদিনী কহিল, ‘‘সেজন্য তুমি কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না। পিসিমা খেমিকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, সে আজ আমার এখানে আসিয়া কাজ লইয়াছে। দ্বাৰে তালা দিয়া আমৰা দুই স্ত্ৰীলোকে এখানে বেশ থাকিব।”

মনে মনে যতই রাগ হইতে লাগিল, বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকৰ্ষণ ততই একান্ত প্ৰবল হইয়া উঠিল। ঐ অটল মূর্তিকে বজ্রবলে বক্ষে চাপিয়া ধৰিয়া ক্লিষ্ট পিষ্ট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সেই দারুণ ইচ্ছার হাত এড়াইবার জন্য মহেন্দ্র ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় ঘুৱিতে ঘুৱিতে মহেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, বিনোদিনীকে সে উপেক্ষার পৰিবৰ্তে উপেক্ষা দেখাইবে। যে- অবস্থায় বিশ্বজগতে বিনোদিনীর একমাত্র নিৰ্ভৰ মহেন্দ্র সে অবস্থাতেও মহেন্দ্রকে এমন নীৱৰে নিৰ্ভয়ে, এমন সুদৃঢ় সুস্পষ্টভাবে প্ৰত্যাখ্যান— এতবড়ো অপমান কি কোনো পুৰুষের ভাগ্যে কখনো ঘটিয়াছে। মহেন্দ্রের গৰ্ব চূৰ্ণ হইয়াও কিছুতেই মৰিতে চাহিল না, সে কেবলই পীড়িত দলিত হইতে

লাগিল। মহেন্দ্র কহিল, ‘আমি কি এতই অপদার্থ। আমার সম্বন্ধে এতবড়ো স্পর্ধা কী করিয়া তাহার মনে হইল। আমি ছাড়া এখন তাহার আর কে আছে।’

ভাবিতে ভাবিতে হঠাত মনে পড়িল— বিহারী। হঠাত এক মুহূর্তের জন্য তাহার বক্ষে সমস্ত রক্তপ্রবাহ যেন স্তুর হইয়া গেল। বিহারীর উপরেই বিনোদিনী নির্ভর স্থাপন করিয়া আছে— আমি তাহার উপলক্ষ্মাত্র, আমি তাহার সোপান, তাহার পা রাখিবার, পদে- পদে পদাঘাত করিবার স্থান। সেই সাহসেই আমার প্রতি এত অবজ্ঞা ! মহেন্দ্রের সন্দেহ হইল, বিহারীর সহিত বিনোদিনীর চিঠিপত্র চলিতেছে এবং বিনোদিনী তাহার কাছ হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছে।

তখন মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ির দিকে চলিল। যখন বিহারীর দ্বারে গিয়া ঘা দিল, তখন রাত্রি আর বড়ো অধিক নাই। অনেক ধাক্কার পর বেহারা ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ‘বাবুজি বাড়ি নাই।’

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, ‘আমি যখন নির্বাধের মতো রাস্তায় রাস্তায় ছুটিয়া বেড়াইতেছি, বিহারী সেই অবকাশে বিনোদিনীর কাছে গেছে। এইজন্যই বিনোদিনী আমাকে এই রাত্রে এমন নির্দয়ভাবে অপমান করিয়াছে, এবং আমিও তাড়িত গদ্দভের মতো ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছি।’

মহেন্দ্র তাহার পুরাতন পরিচিত বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভজু, বাবু কখন বাহির হইয়া গেছেন।”

ভজু কহিল, ‘সে আজ চার- পাঁচ দিন হইয়া গেছে। তিনি পশ্চিমে কোথায় বেড়াইতে গেছেন।’

শুনিয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে হইল, ‘এইবার একটু শুইয়া আরামে যুমাই, আর সমস্ত রাত ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি না।’ বলিয়া উপরে উঠিয়া বিহারীর ঘরে কৌচের উপর শুইয়া তৎক্ষণাৎ যুমাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র যে- রাত্রে বিহারীর ঘরে আসিয়া উপন্দব করিয়াছিল, তাহার পরদিনই বিহারী কোথায় যাইতে হইবে, কিছুই স্থির না করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে। বিহারী ভাবিল, এখনে থাকিলে পূর্ববন্ধুর সহিত সংঘর্ষ কোন্- একদিন এমন বীভৎস হইয়া উঠিবে যে, তাহার পর চিরজীবন অনুত্তাপের কারণ থাকিয়া যাইবে।

পরদিন মহেন্দ্র যখন উঠিল তখন বেলা এগারোটা। উঠিয়াই সম্মুখের টিপাইয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষরে বিহারীর নামে এক পত্র পাথরের কাগজচাপা দিয়া চাপা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র এখনো খোলা হয় নাই। প্রবাসী বিহারীর জন্য তাহা অপেক্ষা করিয়া আছে। কম্পিতহস্তে মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠিই বিনোদিনী তাহাদের গ্রাম হইতে বিহারীকে লিখিয়াছিল এবং ইহার কোনো জবাব সে পায় নাই।

চিঠির প্রত্যেক অক্ষর মহেন্দ্রকে দংশন করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে বরাবর বিহারী মহেন্দ্রের অন্তরালেই পড়িয়া ছিল। জগতের স্নেহপ্রেম সম্বন্ধে মহেন্দ্র- দেবতার শুক্ষ নির্মাল্যই তাহার ভাগ্যে জুটিত। আজ মহেন্দ্র স্বয়ং প্রার্থী এবং বিহারী বিমুখ, তবু মহেন্দ্রকে ঠেলিয়া বিনোদিনী এই অরসিক বিহারীকেই বরণ করিল। মহেন্দ্রও বিনোদিনীর দুই- চারখানি চিঠি পাইয়াছে, কিন্তু বিহারীর এ চিঠির কাছে তাহা নিতান্ত কৃত্রিম, তাহা নির্বাধকে ভুলাইবার শূন্য ছলনা।

নৃতন ঠিকানা জানাইবার জন্য গ্রামের ডাকঘরে মহেন্দ্রকে পাঠাইতে বিনোদিনীর ব্যগ্রতা মহেন্দ্রের মনে পড়িল এবং তাহার কারণ সে বুঝিতে পারিল। বিনোদিনী তাহার সমস্ত মন- প্রাণ দিয়া বিহারীর চিঠির উত্তর পাইবার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

পূর্বপ্রথামত মনিব না থাকিলেও ভজু বেহারা মহেন্দ্রকে চা এবং বাজার হইতে জলখাবার আনিয়া খাওয়াইল। মহেন্দ্র স্নান ভুলিয়া গেল। উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া পথিক যেমন দ্রুতপদে চলে, মহেন্দ্র সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বিনোদিনীর জুলাকর চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে লাগিল। মহেন্দ্র পথ করিতে লাগিল, বিনোদিনীর সঙ্গে আর কিছুতেই দেখা করিবে না। কিন্তু তাহার মনে হইল, আর দুই- একদিন চিঠির জবাব না পাইলে বিনোদিনী বিহারীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তখন সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবে। সে সন্তাননা তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইল।

তখন চিঠিখানা পকেটে করিয়া মহেন্দ্র সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পটলডাঙ্গার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রের ম্লান অবস্থায় বিনোদিনীর মনে দয়া হইল— সে বুঝিতে পারিল, মহেন্দ্র কাল রাত্রে হয়তো পথে- পথে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, “কাল রাত্রে বাড়ি যাও নাই?”

মহেন্দ্র কহিল, “না।”

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আজ এখনো তোমার খাওয়া হয় নি নাকি।” বলিয়া সেবাপরায়ণ বিনোদিনী তৎক্ষণাত আহারের আয়োজন করিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, “থাক্ থাক্, আমি খাইয়া আসিয়াছি।”

বিনোদিনী। কোথায় খাইয়াছ।

মহেন্দ্র। বিহারীদের বাড়িতে।

মুহূর্তের জন্য বিনোদিনীর মুখ পাঞ্চবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্তকাল নিরুত্তর থাকিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারী- ঠাকুরপো ভালো আছেন তো?”

মহেন্দ্র কহিল, “ভালোই আছে। বিহারী যে পশ্চিমে চলিয়া গেল।” —মহেন্দ্র এমনভাবে বলিল, যেন বিহারী আজই রওনা হইয়াছে।

বিনোদিনীর মুখ আর- একবার পাঞ্চবর্ণ হইয়া গেল। পুনর্বার আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, “এমন চতুর্থল লোকও তো দেখি নাই। আমাদের সমস্ত খবর পাইয়াছেন বুঝি? ঠাকুরপো খুব কি রাগ করিয়াছেন।”

মহেন্দ্র। তা না হইলে এই অসহ্য গরমের সময় কি মানুষ শখ করিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যায়।

বিনোদিনী। আমার কথা কিছু বলিলেন না কি।

মহেন্দ্র। বলিবার আর কী আছে। এই লও বিহারীর চিঠি।

বলিয়া চিঠিখানা বিনোদিনীর হাতে দিয়া মহেন্দ্র তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চিঠি লইয়া দেখিল, খোলা চিঠি— লেফাফার উপরে তাহারই হস্তাক্ষরে বিহারীর নাম লেখা। লেফাফা হইতে বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই লেখা সেই চিঠি। উলটাইয়া পালটাইয়া কোথাও বিহারীর লেখা জবাব কিছুই দেখিতে পাইল না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, “চিঠিখানা তুমি পড়িয়াছ?”

বিনোদিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ভয়ের সংগ্রাম হইল। সে ফস করিয়া মিথ্যা কথা কহিল, “না।”

বিনোদিনী চিঠিখানা টুকরা- টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, পুনরায় তাহা কুটিকুটি করিয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল।

মহেন্দ্র কহিল, “আমি বাড়ি যাইতেছি।”

বিনোদিনী তাহার কোনো উত্তর দিল না।

মহেন্দ্র। তুমি যেমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহাই করিব। সাত দিন আমি বাড়িতে থাকিব। কালেজে আসিবার সময় প্রত্যহ একবার এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া খেমির হাতে দিয়া যাইব। দেখা করিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের কোনো কথা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু কোনো উত্তর করিল না— খোলা জানালার বাহিরে অঙ্ককার আকাশে চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী শূন্যগৃহে অনেকক্ষণ আড়ষ্টের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিজেকে যেন প্রাণপণ বলে সচেতন করিবার জন্য বক্ষের কাপড় ছিঁড়িয়া আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে লাগিল।

খেমি শুন্দি শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, “বউঠাকরঞ্জন, করিতেছ কী।”

“তুই যা এখান থেকে” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বিনোদিনী খেমিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহার পরে সশব্দে দ্বার রূপ্ত করিয়া, দুই হাত মুঠা করিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বাগাহত জন্মের মতো আর্তস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে বিনোদিনী নিজেকে বিক্ষিত পরিশ্রান্ত করিয়া মৃদ্ধিতের মতো মুক্ত বাতায়নের তলে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিল।

প্রাতঃকালে সূর্যালোক গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার হঠাৎ সন্দেহ হইল, বিহারী যদি না গিয়া থাকে, মহেন্দ্র যদি বিনোদিনীকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা বলিয়া থাকে। তৎক্ষণাত খেমিকে ডাকিয়া কহিল, “খেমি, তুই এখনই যা— বিহারী- ঠাকুরপোর বাড়ি গিয়া তাঁহাদের খবর লইয়া আয়।”

খেমি ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ‘বিহারীবাবুর বাড়ির সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ। দরজায় ঘা দিতে ভিতর হইতে বেহারা বলিল, ‘বাবু বাড়িতে নাই, তিনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন’।’

বিনোদিনীর মনে আর সন্দেহের কোনোই কারণ রহিল না।

অধ্যায় - ৪২

রাত্রেই মহেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া গেছে শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বধূর প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন। মনে করিলেন, আশার লাঞ্ছনাতেই মহেন্দ্র চলিয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহেন্দ্র কাল রাত্রে চলিয়া গেল কেন।”

আশা মুখ নিচু করিয়া বলিল, ‘জানি না, মা।’

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, এটাও অভিমানের কথা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ‘তুমি জান না তো কে জানিবে। তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে?’

আশা কেবলমাত্র বলিল, ‘না।’

রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস করিলেন না। এ কি কখনো সন্তুষ্য হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কাল মহিন কখন গেল।’

আশা সংকুচিত হইয়া কহিল, ‘জানি না।’

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, ‘তুমি কিছুই জান না ! কচি খুকি ! তোমার সব চালাকি।’

আশারই আচরণে ও স্বভাববোধেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এ মতও রাজলক্ষ্মী তৈরিস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আশা নতমস্তকে সেই ভরৎসনা বহন করিয়া নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, ‘কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না এবং কেমন করিয়া যে তাঁহার ভালোবাসা ফিরিয়া পাইব, তাহাও আমি বলিতে পারি না।’ যে লোক ভালোবাসে, তাহাকে কেমন করিয়া খুশি করিতে হয়, তাহা হন্দয় আপনি বলিয়া দেয়; কিন্তু যে ভালোবাসে না, তাহার মন কী করিয়া পাইতে হয়, আশা তাহার কী জানে। যে লোক অন্যকে ভালোবাসে, তাহার নিকট হইতে সোহাগ লইতে যাওয়ার মতো এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা সে কেমন করিয়া করিবে।

সন্ধ্যাকালে বাড়ির দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য-ঠাকরুন আসিয়াছেন। ছেলের গ্রহণাত্মিক জন্য রাজলক্ষ্মী ইহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী একবার বউমার কোষ্ঠী এবং হাত দেখিবার জন্য দৈবজ্ঞকে অনুরোধ করিলেন এবং সেই উপলক্ষে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিজের দুর্ভাগ্য- আলোচনার সংকোচে একান্ত কুর্ণিত হইয়া আশা কোনোমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বসিয়াছে, এমন সময় রাজলক্ষ্মী তাঁহার ঘরের পার্শ্বস্থ দীপহীন বারান্দা দিয়া মন্দু জুতার শব্দ পাইলেন— কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজলক্ষ্মী ডাকিলেন, ‘কে ও।’

প্রথমে সাড়া পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন, ‘কে যায় গো।’ তখন নিরুত্তরে মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খুশি হইবে কি, মহেন্দ্রের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মহেন্দ্রকে এখন নিজের বাড়িতেও চোরের মতো প্রবেশ করিতে হয়। দৈবজ্ঞ এবং আচার্য-ঠাকুরুন বসিয়া আছেন বলিয়া তাহার আরো লজ্জা হইল। সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিজের স্বামীর জন্য যে লজ্জা, ইহাই আশাৰ দুঃখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী যখন মৃদুস্বরে বটকে বলিলেন, ‘বউমা, পাৰ্বতীকে বলিয়া দাও, মহিনেৰ খাবার গুছাইয়া আনে’, তখন আশা কহিল, ‘মা, আমিই আনিতেছি।’ বাড়িৰ দাসদাসীদেৱ দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এ দিকে আচার্য ও তাহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্য এই অশিক্ষিত মৃচ্ছের সহিত নির্লজ্জভাবে ঘড়্যন্ত করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের কাছে অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য-ঠাকুরুন কস্তুরে অতিরিক্ত মধুমাখা মেহেরসেৱ সম্প্রাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভালো আছ তো, বাবা?’— তখন মহেন্দ্র আৱ বসিয়া থাকিতে পারিল না; কুশলপ্রশ্নেৰ কোনো উত্তৰ না দিয়া কহিল, ‘মা, আমি একবার উপরে যাইতেছি।’

মা ভাবিলেন মহেন্দ্র বুঝি শয়নগ্রহে বিৱলে বধূৰ সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি রঞ্জনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, ‘যাও, যাও, তুমি একবার শীত্র উপরে যাও, মহিনেৰ কী বুঝি দৰকার আছে।’

আশা দুরংদুর বক্ষে সসংকোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাঙ্গড়িৰ কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বুঝি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু ঘরেৰ মধ্যে কোনোমতেই হঠাতে চুকিতে পারিল না, চুকিবার পূৰ্বে আশা অন্ধকারে দ্বারেৰ অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত শূন্যহৃদয়ে নীচেৰ বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো সেই মহেন্দ্র— সেই সবই, কিন্তু কী পৱিত্রন। এই ক্ষুদ্র শয়নঘৰাটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল— আজ কেন সেই আনন্দসূতিতে- পবিত্র ঘৰাটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে। এত কষ্ট, এত বিৱৰণ, এত চাপ্তল্য যদি, তবে ও শয্যায় আৱ বসিয়ো না, মহেন্দ্র। এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই- সমস্ত পৱিত্র গভীৰ রাত্ৰি, সেই- সমস্ত সুনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মারা কৰ্মবিস্মৃত ঘনবৰ্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তেৰ বিহুল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনৰ্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ বাড়িতে অন্য অনেক ঘৰ আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘৰাটিতে আৱ এক মূল্যত্ব নহে।

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদনীৰ কাছ হইতে আসিতেছে; তাহার অঙ্গে সেই বিনোদনীৰ স্পৰ্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদনীৰ মূর্তি, কানে সেই বিনোদনীৰ কষ্টস্বর, মনে সেই বিনোদনীৰ বাসনা একেবারে লিপ্ত জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে, ‘এসো, আমাৰ অনন্যপৱায়ণ হৃদয়েৰ মধ্যে এসো, আমাৰ অটলনিষ্ঠ সতীপ্ৰেমেৰ শতদলেৰ উপৱ তোমাৰ চৱণ- দুখানি রাখো।’ সে তাহার মাসিৰ উপদেশ, পুৱাগেৰ কথা, শাস্ত্ৰেৰ অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না— এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আৱ মনেৰ মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না। সে আজ বিনোদনীৰ কলঙ্কপারাবারেৰ মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসৰ্জন দিল; সেই প্ৰেমশূন্য রাত্ৰিৰ অন্ধকারে তাহার কানেৰ মধ্যে, বুকেৰ মধ্যে, মষ্টিক্ষেৰ মধ্যে, তাহার সৰ্বাঙ্গে

রক্তপ্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতলে একটি ভয়ানক গন্তীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক— এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি- বড়ো অপরিচিতও নহে। সে কোনোমতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

একসময় কড়িকাঠ হইতে মহেন্দ্রের অন্যমনক্ষ দৃষ্টি সমুখের দেয়ালের দিকে নামিয়া আসিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আশা দেখিল, সমুখের দেয়ালে মহেন্দ্রের ছবির পার্শ্বেই আশার একখানি ফোটোগ্রাফ ঝুলানো রহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানা আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া ফেলে, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাসবশত কেন যে সেটা চোখে পড়ে নাই, কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তাহাই মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেন্দ্র মনে মনে হাসিতেছে এবং তাহার হৃদয়ের আসনে যে বিনোদিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সে- ও যেন তাহার জোড়া- ভূরূর ভিতর হইতে ঐ ফোটোগ্রাফটার প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিতেছে।

অবশেষে বিরক্তিপীড়িত মহেন্দ্রের দৃষ্টি দেয়াল হইতে নামিয়া আসিল। আশা আপনার মূর্খতা ঘুচাইবার জন্য আজকাল সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম ও শাশুড়ির সেবা হইতে অবকাশ পাইলেই অনেকরাত্রি পর্যন্ত নির্জনে অধ্যয়ন করিত। তাহার সেই অধ্যয়নের খাতাপত্রবইগুলি ঘরের একধারে গোছানো ছিল। হঠাৎ মহেন্দ্র অলসভাবে তাহার একখানা খাতা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। আশার ইচ্ছা করিল, চীৎকার করিয়া ছুটিয়া সেখানা কাড়িয়া লইয়া আসে। তাহার কাঁচা হাতের অক্ষরগুলির প্রতি মহেন্দ্রের হৃদয়হীন বিদ্রূপদৃষ্টি কল্পনা করিয়া সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াইতে পারিল না। দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল— পদশব্দ গোপন করিবার চেষ্টাও রহিল না।

মহেন্দ্রের আহার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী মনে করিতেছিলেন, মহেন্দ্র বউমার সঙ্গে রহস্যলাপে প্রবৃত্ত আছে; সেইজন্য খাবার লইয়া গিয়া মাঝখানে ভঙ্গ দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আশাকে নীচে আসিতে দেখিয়া তিনি ভোজনস্থলে আহার লইয়া মহেন্দ্রকে খবর দিলেন। মহেন্দ্র খাইতে উঠিবামাত্র আশা ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নিজের ছবিখানা ছিঁড়িয়া লইয়া ছাদের প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল, এবং তাহার খাতাপত্রগুলা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া গেল।

আহারাত্তে মহেন্দ্র শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী বধূকে কাছাকাছি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে একতলায় রঞ্জনশালায় আসিয়া দেখিলেন, আশা তাঁহার জন্য দুধ জ্বাল দিতেছে। কেনো আবশ্যক ছিল না। কারণ, যে- দাসী রাজলক্ষ্মীর রাত্রের দুধ প্রতিদিন জ্বাল দিয়া থাকে, সে নিকটেই ছিল এবং আশার এই অকারণ উৎসাহে আপত্তি প্রকাশ করিতেছিল; বিশুদ্ধ জনের দ্বারা পূরণ করিয়া দুধের যে অংশটুকু সে হরণ করিত, সেটুকু আজ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইতেছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এ কী বউমা, এখানে কেন। যাও, উপরে যাও।”

আশা উপরে গিয়া তাহার শাশুড়ির ঘর আশ্রয় করিল। রাজলক্ষ্মী বধূর ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, ‘যদি বা মহেন্দ্র মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ক্ষণকালের জন্য বাড়ি আসিল, বউ রাগারাগি মান- অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়ি- ছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে। বিনোদিনীর ফাঁদে মহেন্দ্র যে ধরা

পড়িল, সে তো আশারই দোষ। পুরুষমানুষ তো স্বভাবতই বিপথে যাইবার জন্য প্রস্তুত, স্তীর কর্তব্য তাহাকে ছলে বলে কৌশলে সিধা পথে রাখা।’

রাজলক্ষ্মী তীব্র ভর্তসনার স্বরে কহিলেন, ‘তোমার এ কী রকম ব্যবহার, বটমা। তোমার ভাগ্যক্রমে স্বামী যদি ঘরে আসিলেন, তুমি মুখ হাঁড়িপানা করিয়া অমন কোণে- কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।’

আশা নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অঙ্কুশাহতচিত্তে উপরে চলিয়া গেল, এবং মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশমাত্র না দিয়া এক নিশাসে ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। দশটা বাজিয়া গেছে। মহেন্দ্র ঠিক সেই সময় বিছানার সমুখে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তিতমুখে মশারি ঝাড়িতেছে। বিনোদিনীর উপরে তাহার মনে একটা তীব্র অভিমানের উদয় হইয়াছে। সে মনে মনে বলিতেছিল, ‘বিনোদিনী কি আমাকে তাহার এমনই ক্রীতদাস বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, আশার কাছে আমাকে পাঠাইতে তাহার মনে লেশমাত্র আশঙ্কা জন্মিল না। আজ হইতে যদি আমি আশার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করি, তবে বিনোদিনী কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই প্রথিবীতে দাঁড়াইবে। আমি কি এতই অপদার্থ যে, এই কর্তব্য- পালনের ইচ্ছা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বিনোদিনীর কাছে কি শেষকালে আমার এই পরিচয় হইল। শ্রদ্ধাও হারাইলাম, ভালোবাসাও পাইলাম না, আমাকে অপমান করিতে তাহার দ্বিধাও হইল না?’ মহেন্দ্র মশারির সমুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, বিনোদিনীর এই স্পর্ধার সে প্রতিবাদ করিবে, যেমন করিয়া হউক আশার প্রতি হৃদয়কে অনুকূল করিয়া বিনোদিনীকৃত অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

আশা যেই ঘরে প্রবেশ করিল, মহেন্দ্রের অন্যমনক্ষ মশারি- ঝাড়া অমনি বন্ধ হইয়া গেল। কী বলিয়া আশার সঙ্গে সে কথা আরম্ভ করিবে, সেই এক অতিদুরুহ সমস্যা উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, হঠাতে তাহার যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই বলিল। কহিল, “তুমিও দেখিলাম আমার মতো পড়ায় মন দিয়াছ। খাতাপত্র এই যে এখানে দেখিয়াছিলাম, সেগুলি গেল কোথায়।”

কথাটা যে কেবল খাপছাড়া শুনাইল তাহা নহে, আশাকে যেন মারিল। মৃঢ় আশা যে শিক্ষিতা হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেটা তাহার বড়ো গোপন কথা— আশা স্থির করিয়াছিল, এ কথাটা বড়োই হাস্যকর। তাহার এই শিক্ষালাভের সংকল্প যদি কাহারো হাস্যবিদ্রূপের লেশমাত্র আভাস হইতেও গোপন করিবার বিষয় হয়, তবে তাহা বিশেষরূপে মহেন্দ্রের। সেই মহেন্দ্র যখন এতদিন পরে প্রথম সন্নাষণে হাসিয়া সেই কথাটারই অবতারণা করিল, তখন নিষ্ঠুরবেগাহত শিশুর কোমল দেহের মতো আশার সমস্ত মন্টা সংকুচিত ব্যথিত হইতে লাগিল। সে আর কোনো উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া টিপাইয়ের প্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহেন্দ্রও উচ্চারণমাত্র বুবিয়াছিল, কথাটা ঠিক সংগত, ঠিক সময়োপযোগী হয় নাই— কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উপযোগী কথাটা যে কী হইতে পারে তাহা মহেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। মাঝখানের এতবড়ো বিপ্লবের পরে পূর্বের ন্যায় কোনো সহজ কথা ঠিকমত শুনায় না, হৃদয়ও একেবারে মূক, কোনো নতুন কথা বলিবার জন্য সে প্রস্তুত নহে। মহেন্দ্র ভাবিল, ‘বিছানার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলে সেখানকার নিঃস্ত বেষ্টনের মধ্যে হয়তো কথা কওয়া সহজ হইবে।’ এই ভাবিয়া মহেন্দ্র আবার মশারির বহির্ভাগ কেঁচা দিয়া ঝাড়িতে লাগিল। নৃতন অভিনেতা রঙভূমিতে প্রবেশের পূর্বে যেমন উৎকর্ণার সঙ্গে নেপথ্যদ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের অভিনেতব্য বিষয় মনে মনে আব্রান্তি করিয়া দেখিতে থাকে, মহেন্দ্র সেইরূপ মশারির

সমুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে তাহার বক্তব্য ও কর্তব্য আলোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় অত্যন্ত মৃদু একটা শব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া দেখিল, আশা ঘরের মধ্যে নাই।

অধ্যায় - ৪৩

পরদিন প্রাতে মহেন্দ্র মাকে বলিল, ‘মা, পড়াশুনার জন্য আমার একটি নিরিবিলি স্বতন্ত্র ঘর চাই। কাকীমা যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে আমি থাকিব।’

মা খুশি হইয়া উঠিলেন— ‘তবে তো মহিন বাড়িতেই থাকিবে। তবে তো বউমার সঙ্গে মিটমাট হইয়া গেছে। আমার এমন সোনার বউকে কি মহিন চিরদিন অনাদর করিতে পারে। এই লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া কোথাকার সেই মায়াবিনী ডাইনিটাকে লইয়া কতদিনই বা মানুষ ভুলিয়া থাকিবে।’

মা তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তা বেশ তো মহিন।” বলিয়া তখনই চাবি বাহির করিয়া রূদ্ধ ঘর খুলিয়া বাড়াবোড়ার ধূমধাম বাধাইয়া দিলেন। “বউ, ও বউ, বউ কোথায় গেল।” অনেক সন্ধানে বাড়ির এক কোণ হইতে সংকুচিত বধূকে বাহির করিয়া আনা হইল। “একটা সাফ জাজিম বাহির করিয়া দাও; এ ঘরে টেবিল নাই, এখানে একটা টেবিল পাতিয়া দিতে হইবে; এ আলো তো এখানে চলিবে না, উপর হইতে ল্যাম্পটা পাঠাইয়া দাও।” এইরপে উভয়ে মিলিয়া এই বাড়িটির রাজার্ধিরাজের জন্য অন্ধপূর্ণার ঘরে বিস্তৃত রাজসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্র সেবাকারণীদের প্রতি জ্ঞেপপমাত্র না করিয়া গন্তীরমুখে খাতাপত্র বহি লইয়া ঘরে বসিল এবং সময়ের লেশমাত্র অপব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাত্ম পড়িতে আরস্ত করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় পড়িতে বসিয়া গেল। সে উপরে তাহার শয়নঘরে শুইবে কি নীচে শুইবে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী বহুযত্নে আশাকে আড়ষ্ট পুতুলটির মতো সাজাইয়া কহিলেন, ‘যাও তো বউমা, মহিনকে জিজ্ঞাসা করিয়া এসো, তাহার বিছানা কি উপরে হইবে।’

এ প্রস্তাবে আশার পা কিছুতেই সরিল না, সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রুষ্ট রাজলক্ষ্মী তাহাকে তীব্র ভর্তসনা করিতে লাগিলেন। আশা বহুকষ্টে ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে গেল, কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী দূর হইতে বধূর এই ব্যবহার দেখিয়া বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন।

আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া বই হইতে মাথা না তুলিয়া কহিল, “এখনো আমার দেরি আছে— আবার কাল ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে— আমি এইখানেই শুইব।”

কী লজ্জা। আশা কি মহেন্দ্রকে উপরের ঘরে শুইতে যাইবার জন্য সাধিতে আসিয়াছিল।

ঘর হইতে সে বাহির হইতেই রাজলক্ষ্মী বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী, হইল কী।”

আশা কহিল, ‘তিনি এখন পড়িতেছেন, নীচেই শুইবেন।’ বলিয়া সে নিজের অপমানিত শয়নগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। কোথাও তাহার সুখ নাই— সমস্ত প্রথিবী সর্বত্রই যেন মধ্যাহ্নের মরু- ভূতলের মতো তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

থানিক রাত্রে আশাৰ শয়নগৃহেৰ রংদুদারে ঘা পড়িল, “বউ, বউ, দৱজা খোলো।”

আশা তাড়াতাড়ি দ্বাৰ খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী তাহার হাঁপানি লইয়া সিঁড়িতে উঠিয়া কষ্টে নিশ্চাস লইতেছিলেন। ঘৱে প্ৰবেশ কৱিয়াই তিনি বিছানায় বসিয়া পড়িলেন ও বাক্ষণিকি ফিরিয়া আসিতেই তাঙ্গ গলায় কহিলেন, ‘বউ, তোমার রকম কী। উপৱে আসিয়া দ্বাৰ বন্ধ কৱিয়াছ যে। এখন কি এইৱকম রাগারাগি কৱিবাৰ সময় ! এত দুঃখেও তোমার ঘটে বুদ্ধি আসিল না। যাও, নীচে যাও।’

আশা মনুস্মৰে কহিল, ‘তিনি একলা থাকিবেন বলিয়াছেন।’

রাজলক্ষ্মী। একলা থাকিবে বলিলেই হইল। রাগেৰ মুখে সে কী কথা বলিয়াছে, তাই শুনিয়া অমনি বাঁকিয়া বসিতে হইবে ! এত অভিমানী হইলে চলে না। যাও, শীত্র যাও।

দুঃখেৰ দিনে বধূৰ কাছে শাশুড়িৰ আৱ লজ্জা নাই। তাহার হাতে যে- কিছু উপায় আছে, তাহাই দিয়া মহেন্দ্ৰকে কোনোমতে বাঁধিতেই হইবে।

আবেগেৰ সহিত কথা কহিতে রাজলক্ষ্মীৰ পুনৱায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হইল। কতকটা সংবৰণ কৱিয়া তিনি উঠিলেন। আশাৰ দ্বিৱক্তি না কৱিয়া তাহাকে ধৱিয়া লইয়া নীচে চলিল। রাজলক্ষ্মীকে আশা তাহার শয়নঘৱে বিছানায় বসাইয়া, তাকিয়াবালিশগুলি পিঠেৰ কাছে ঠিক কৱিয়া দিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘থাক বউমা, থাক। সুধোকে ডাকিয়া দাও। তুমি যাও, আৱ দেৱি কৱিয়ো না।’

আশা এবাৱ আৱ দ্বিধামাত্ৰ কৱিল না। শাশুড়িৰ ঘৱ হইতে বাহিৰ হইয়া একেবাৱে মহেন্দ্ৰেৰ ঘৱে গিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্ৰেৰ সমুখে টেবিলেৰ উপৰ খোলা বই পড়িয়া আছে— সে টেবিলেৰ উপৰ দু পা তুলিয়া দিয়া চৌকিৰ উপৰ মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া একেবাৱে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া তাকাইল। যেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল, হঠাৎ ভৰ হইয়াছিল, সে-ই বুঝি আসিয়াছে। আশাকে দেখিয়া মহেন্দ্ৰ সংযত হইয়া পা নামাইয়া খোলা বইটা কোলে টানিয়া লইল।

মহেন্দ্ৰ আজ মনে মনে আশৰ্য হইল। আজকাল তো আশা এমন অসংকোচে তাহার সমুখে আসে না— দৈবাৎ তাহাদেৱ উভয়েৰ সাক্ষাৎ হইলে সে তখনই চলিয়া যায়। আজ এত রাত্রে এমন সহজে সে যে তাহার ঘৱে আসিয়া প্ৰবেশ কৱিল, এ বড়ো বিস্ময়কৰ। মহেন্দ্ৰ তাহার বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, আশাৰ আজ চলিয়া যাইবাৰ লক্ষণ নহে। আশা মহেন্দ্ৰেৰ সমুখে স্থিৱভাৱে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন মহেন্দ্ৰ আৱ পড়িবাৰ ভান কৱিতে পাৱিল না— মুখ তুলিয়া চাহিল। আশা সুস্পষ্ট স্বৱে কহিল, ‘মাৱ হাঁপানি বাড়িয়াছে, তুমি একবাৰ তাহাকে দেখিলে ভালো হয়।’

মহেন্দ্ৰ। তিনি কোথায় আছেন?

আশা। তাহার শোবাৰ ঘৱেই আছেন, ঘুমাইতে পাৱিতেছেন না।

মহেন্দ্ৰ। তবে চলো, তাহাকে দেখিয়া আসি গে।

অনেক দিনেৰ পৱে আশাৰ সঙ্গে এইটুকু কথা কহিয়া মহেন্দ্ৰ যেন অনেকটা হালকা বোধ কৱিল। নীৱৰতা যেন দুৰ্ভেদ্য দুৰ্গপ্রাচীৱেৰ মতো স্বীপুৱষেৰ মাঝখানে কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহেন্দ্ৰেৰ তৱফ

রাজলক্ষ্মীর দ্বারের বাহিরে আশা দাঁড়াইয়া রহিল, মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রকে অসময়ে ঘরে আসিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী ভীত হইলেন, ভাবিলেন, বুঝি বা আশার সঙ্গে রাগারাগি করিয়া আবার সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। কহিলেন, “মহিন, এখনো ঘূমাস নাই?”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, তোমার সেই হাঁপানি কি বাড়িয়াছে।”

এতদিন পরে এই প্রশ্ন শুনিয়া মার মনে বড়ো অভিমান জন্মিল। বুঝিলেন, বউ গিয়া বলাতেই আজ মহিন মার খবর লইতে আসিয়াছে। এই অভিমানের আবেগে তাঁহার বক্ষ আরো আন্দোলিত হইয়া উঠিল—কংক্ষে বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, ‘যা, তুই শুতে যা। আমার ও কিছুই না।’

ମହେନ୍ଦ୍ର । ନା ମା, ଏକବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ଦେଖା ଭାଲୋ, ଏ ବ୍ୟାମୋ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ଜିନିସ ନହେ ।

ମହେନ୍ଦ୍ର ଜାନିତ, ତାହାର ମାତାର ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଲତା ଆଛେ, ଏହି କାରଣେ ଏବଂ ମାତାର ମୁଖ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଆ ମେ ଉଦ୍ବେଗ ଅନୁଭବ କରିଲ ।

ମା କହିଲେନ, “ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମାର ଏ ବ୍ୟାମୋ ସାରିବାର ନହେ ।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা, আজ রাত্রের মতো একটা ঘুমের ওষুধ আনাইয়া দিতেছি, কাল ভালো করিয়া দেখা যাইবে।”

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ । ତେର ଓସୁଧ ଖାଇଯାଛି, ଓସୁଧେ ଆମାର କିଛୁ ହ୍ୟ ନା । ଯାଓ ମହିନ, ଅନେକ ରାତ ହଇଯାଛେ, ତୁମି ସୁମାଇତେ ଯାଓ ।

ମହେନ୍ଦ୍ର । ତୁମি ଏକଟୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେଇ ଆମି ଯାଇବ ।

তখন অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী দ্বারের অন্তরালবর্তিনী বধুকে সম্মোধন করিয়া বলিলেন, “বউ, কেন তুমি এই
রাত্রে মহেন্দ্রকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে আনিয়াছ।” বলিতে বলিতে তাঁহার শ্বাসকষ্ট আরো বাড়িয়া
উঠিল।

তখন আশা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, “যাও, তুমি শুইতে যাও, আমি মার কাছে থাকিব।”

মহেন্দ্র আশাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিল, “আমি একটা ওষুধ আনাইতে পাঠাইলাম। শিশিতে দুই দাগ থাকিবে— এক দাগ খাওয়াইয়া যদি ঘুম না আসে তবে এক ঘণ্টা পরে আর- এক দাগ খাওয়াইয়া দিয়ো। রাত্রে বাড়িলে আমাকে খবর দিতে ভুলিয়ো না।”

এই বলিয়া মহেন্দ্র নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। আশা আজ তাহার কাছে যে- মুর্তিতে দেখা দিল, এ যেন মহেন্দ্রের পক্ষে নৃতন। এ আশার মধ্যে সংকোচ নাই, দীনতা নাই, এই আশা নিজের অধিকারের মধ্যে

নিজে অধিষ্ঠিত, সেটুকুর জন্য মহেন্দ্রের নিকট সে ভিক্ষাপ্রার্থিনী নহে। নিজের স্ত্রীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ির বধূর প্রতি তাহার সম্মত জন্মিল।

আশা তাঁহার প্রতি যত্নবশত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহাতে রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুশি হইলেন। মুখে বলিলেন, ‘বউমা, তোমাকে শুতে পাঠাইলাম, তুমি আবার মহেন্দ্রকে টানিয়া আনিলে কেন।’

আশা তাঁহার উত্তর না দিয়া পাখা- হাতে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘যাও বউমা, শুতে যাও।’

আশা মৃদুস্বরে কহিল, ‘আমাকে এইখানে বসিতে বলিয়া গেছেন।’ আশা জানিত, মহেন্দ্র মাতার সেবায় তাহাকে নিয়োগ করিয়া গেছে, এ খবরে রাজলক্ষ্মী খুশি হইবেন।

অধ্যায় - 88

রাজলক্ষ্মী যখন স্পষ্টই দেখিলেন, আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহার মনে হইল, ‘অন্তত আমার ব্যামো উপলক্ষ করিয়াও যদি মহেন্দ্রকে থাকিতে হয় সেও ভালো।’ তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাঁহার অসুখ একেবারে সারিয়া যায়। আশাকে ভাঁড়াইয়া ওষুধ তিনি ফেলিয়া দিতে আরস্ত করিলেন।

অন্যমনক্ষ মহেন্দ্র বড়ো- একটা খেয়াল করিত না। কিন্তু আশা দেখিতে পাইত রাজলক্ষ্মীর রোগ কিছুই কমিতেছে না, বরঞ্চ যেন বাড়িতেছে। আশা ভাবিত, মহেন্দ্র যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতেছে না— মহেন্দ্রের মন এতই উদ্ব্লাপ্ত যে, মাতার পীড়াও তাহাকে চেতাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। মহেন্দ্রের এতবড়ো দুর্গতিতে আশা তাহাকে মনে মনে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে নষ্ট হইলে মানুষ কি সকল দিকেই এমনি করিয়া নষ্ট হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে রোগের কষ্টের সময় রাজলক্ষ্মীর বিহারীকে মনে পড়িয়া গেল। কতদিন বিহারী আসে নাই, তাহার ঠিক নাই। আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বউমা, বিহারী এখন কোথায় আছে জান?’ আশা বুঝিতে পারিল, চিরকাল রোগতাপের সময় বিহারীই মার সেবা করিয়া আসিয়াছে। তাই কষ্টের সময় বিহারীকেই মাতার মনে পড়িতেছে। হায়, এই সংসারের অটল নির্ভর সেই চিরকালের বিহারীও দূর হইল। বিহারী- ঠাকুরপো থাকিলে এই দুঃসময়ে মার যত্ন হইত— ইঁহার মতো তিনি হৃদয়হীন নহেন। আশার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্চাস পড়িল।

রাজলক্ষ্মী। বিহারীর সঙ্গে মহিন বুঝি ঝগড়া করিয়াছে ? বড়ো অন্যায় করিয়াছে বউমা। তাহার মতো এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মহিনের আর কেহ নাই।

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষুর কোণে অশ্রুজল জড়ো হইল।

একে একে আশার অনেক কথা মনে পড়িল। অন্ধ মুঢ় আশাকে যথাসময়ে সতর্ক করিবার জন্য বিহারী কতরূপে কত চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই চেষ্টার ফলে সে ক্রমশই আশার অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই

কথা মনে করিয়া আজ আশা মনে মনে নিজেকে তীব্রভাবে অপমান করিতে লাগিল। একমাত্র সুহৎকে লাঞ্ছিত করিয়া একমাত্র শক্রকে যে বক্ষে টানিয়া লয়, বিধাতা সেই কৃতয় মূর্খকে কেন না শাস্তি দিবেন। ভগ্নহৃদয় বিহারী যে- নিশাস ফেলিয়া এ ঘর হইতে বিদায় হইয়া গেছে, সে- নিশাস কি এ ঘরকে লাগিবে না।

আবার অনেকক্ষণ চিন্তিতমুখে স্ত্রির থাকিয়া রাজলক্ষ্মী হঠাতে বলিয়া উঠিলেন, ‘বউমা, বিহারী যদি থাকিত, তবে এই দুর্দিনে সে আমাদের রক্ষা করিতে পারিত— এতদূর পর্যন্ত গড়াইতে পাইত না।’

আশা নিষ্ঠক হইয়া ভাবিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী নিশাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘সে যদি খবর পায় আমার ব্যামো হইয়াছে, তবে সে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।’

আশা বুঝিল, রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা বিহারী এই খবরটা পায়। বিহারীর অভাবে তিনি আজকাল একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া মহেন্দ্র জ্যোৎস্নায় জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পড়িতে আর ভালো লাগে না। গৃহে কোনো সুখ নাই। যাহারা পরমাত্মায়, তাহাদের সঙ্গে সহজভাবের সম্বন্ধ দূর হইয়া গেলে, তাহাদিগকে পরের মতো অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, আবার প্রিয়জনের মতো অনায়াসে তাহাদিগকে গ্রহণ করা যায় না— তাহাদের সেই অত্যাজ্য আত্মীয়তা অহরহ অসহ্য ভারের মতো বক্ষে চাপিয়া থাকে। মার সমুখে যাইতে মহেন্দ্রের ইচ্ছা হয় না— তিনি হঠাতে মহেন্দ্রকে কাছে আসিতে দেখিলেই এমন একটা শক্তি উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চান যে, মহেন্দ্রকে তাহা আঘাত করে। আশা কোনো উপলক্ষে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে কথা কহাও কঠিন হয়, চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠে। এমন করিয়া দিন আর কাটিতে চাহে না। মহেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অন্তত সাত দিন সে বিনোদনীর সঙ্গে একেবারেই দেখা করিবে না। আরো দুই দিন বাকি আছে— কেমন করিয়া সে দুই দিন কাটিবে।

মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিল। বুঝিল, আশা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভান করিয়া স্ত্রির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা সে ভানটুকু বুঝিতে পারিল, তবু ঘর হইতে চলিয়া গেল না। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, “একটা কথা আছে, সেইটে বলিয়াই আমি যাইতেছি।”

মহেন্দ্র ফিরিয়া কহিল, ‘যাইতে হইবে কেন, একটু বোসোই না।’

আশা এই ভদ্রতাটুকুতে কান না দিয়া স্ত্রির দাঁড়াইয়া কহিল, ‘বিহারী- ঠাকুরপোকে মার অসুখের খবর দেওয়া উচিত।’

বিহারীর নাম শুনিয়াই মহেন্দ্রের গভীর হৃদয়ক্ষতে ঘা পড়িল। নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া কহিল, ‘কেন উচিত। আমার চিকিৎসায় বুঝি বিশাস হয় না?’

মহেন্দ্র মাতার চিকিৎসায় যথোচিত যত্ন করিতেছে না, এই ভর্তসনায় আশার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, ‘কই, মার ব্যামো তো কিছুই ভালো হয় নাই, দিনে দিনে আরো যেন বাড়িয়া উঠিতেছে।’

এই সামান্য কথাটার ভিতরকার উত্তাপ মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল। এমন গৃঢ় ভরৎসনা আশা আর কখনোই মহেন্দ্রকে করে নাই। মহেন্দ্র নিজের অহংকারে আহত হইয়া বিস্মিত বিদ্রূপের সহিত কহিল, “তোমার কাছে ডাঙ্কারি শিখিতে হইবে দেখিতেছি!”

আশা এই বিদ্রূপে তাহার পুজ্জীভূত বেদনার উপরে হঠাতে অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল; তাহার উপরে ঘর অঙ্ককার ছিল, তাই সেই চিরকালের নিরুত্তর আশা আজ অসংকোচে উদ্বৃষ্ট তেজের সহিত বলিয়া উঠিল, “ডাঙ্কারি না শেখ, মাকে যত্ন করা শিখিতে পার।”

আশার কাছে এমন জবাব পাইয়া মহেন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই অনভ্যস্ত তীব্র বাক্যে মহেন্দ্র নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কহিল, “তোমার বিহারী-ঠাকুরপোকে কেন এই বাড়িতে আসিতে নিয়েধ করিয়াছি, তাহা তো তুমি জান— আবার তাহাকে স্নান করিয়াছ বুঝি !”

আশা দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। লজ্জার বড়ে যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। লজ্জা তাহার নিজের জন্য নহে। অপরাধে যে- ব্যক্তি মগ্ন হইয়া আছে, সে এমন অন্যায় অপবাদ মুখে উচ্চারণ করিতে পারে! এতবড়ো নিলজ্জতাকে পর্বতপ্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না।

আশা চলিয়া গেলেই মহেন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ পরাভব অনুভব করিতে পারিল। আশা যে কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই মহেন্দ্রকে এমন ধিক্কার করিতে পারে, তাহা মহেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারে নাই। মহেন্দ্র দেখিল, যেখানে তাহার সিংহাসন ছিল সেখানে সে ধূলায় লুটাইতেছে। এতদিন পরে তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে আশার বেদনা ঘৃণায় পরিণত হয়।

ও দিকে বিহারীর কথা মনে আসিতেই বিনোদিনী সম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। বিহারী পশ্চিম হইতে ফিরিয়াছে কি না, কে জানে। ইতিমধ্যে বিনোদিনী তাহার ঠিকানা জানিতেও পারে, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর দেখা হওয়াও অসম্ভব নহে। মহেন্দ্রের আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মীর বক্ষের কষ্ট বাড়িল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া নিজেই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “মহিন, বিহারীকে আমার বড়ো দেখিতে ইচ্ছা হয়, অনেক দিন সে আসে নাই।”

আশা শাশুড়িকে বাতাস করিতেছিল। সে মুখ নিচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র কহিল, “সে এখানে নাই, পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার মন বলিতেছে, সে এখানেই আছে, কেবল তোর উপর অভিমান করিয়া আসিতেছে না। আমার মাথা খা, কাল একবার তুই তাহার বাড়িতে যাস।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা যাব।”

আজ সকলেই বিহারীকে ডাকিতেছে। মহেন্দ্র নিজেকে বিশ্বের পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ করিল।

অধ্যায় - ৪৫

পরদিন প্রত্যয়েই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দ্বারের কাছে অনেকগুলা গোরুর গাড়িতে ভৃত্যগণ আসবাব বোঝাই করিতেছে। ভজুকে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ‘ব্যাপারখানা কী !’ ভজু কহিল, ‘বাবু বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন, সেইখানে জিনিসপত্র চলিয়াছে।’ মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ‘বাবু বাড়িতে আছেন না কি।’ ভজু কহিল, ‘তিনি দুই দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া কাল বাগানে চলিয়া গেছেন।’

শুনিয়া মহেন্দ্রের মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে অনুপস্থিত ছিল, ইতিমধ্যে বিনোদিনী ও বিহারীতে যে দেখা হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কোনো সংশয় রহিল না। সে কল্পনাচক্ষে দেখিল, বিনোদিনীর বাসার সমুখেও এতক্ষণে গোরুর গাড়ি বোঝাই হইতেছে। তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, ‘এইজন্যই নির্বোধ আমাকে বিনোদিনী বাসা হইতে দূরে রাখিয়াছিল।’

মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া মহেন্দ্র তাহার গাড়িতে ঢিয়া কোচম্যানকে হাঁকাইতে কহিল। ঘোড়া যথেষ্ট দ্রুত চলিতেছে না বলিয়া মহেন্দ্র মাঝে মাঝে কোচম্যানকে গালি দিল। গলির মধ্যে সেই বাসার দ্বারের সমুখে পৌঁছিয়া দেখিল, সেখানে যাত্রার কোনো আয়োজন নাই। তয় হইল, পাছে সে- কার্য পূর্বেই সমাধা হইয়া থাকে। বেগে দ্বারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে বৃন্দ চাকর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ‘সব খবর ভালো তো?’ সে কহিল, ‘আজ্ঞা হাঁ, ভালো বৈকি।’

মহেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী স্নানে গিয়াছে। তাহার নির্জন শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গতরাত্রে ব্যবহৃত শয়ার উপর লুটাইয়া পড়িল— সেই কোমল আস্তরণকে দুই প্রসারিত হত্তে বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল এবং তাহাকে আগ করিয়া তাহার উপরে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, ‘নিষ্ঠুর ! নিষ্ঠুর !’

এইরপে হৃদয়োচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া শয়া হইতে উঠিয়া মহেন্দ্র অধীরভাবে বিনোদিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে দেখিল, একখানা বাংলা খবরের কাগজ নীচের বিছানায় খোলা পড়িয়া আছে। সময় কাটাইবার জন্য কতকটা অন্যমনক্ষত্বাবে সেখানা তুলিয়া লইল, যেখানে চোখ পড়িল, মহেন্দ্র সেইখানেই বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। এক মুহূর্তে তাহার সমস্ত মন খবরের কাগজের সেই জায়গাটাতেই ঝুকিয়া পড়িল। একজন পত্রপ্রেরক লিখিতেছে, অল্প বেতনের দরিদ্র কেরানিগণ রুগ্ণ হইয়া পড়িলে তাহাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবার জন্য বিহারী বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন— সেখানে এক কালে পাঁচজনকে আশ্রয় দিবার বদ্বোবস্ত হইয়াছে, ইত্যাদি।

বিনোদিনী এই খবরটা পড়িয়াছে। পড়িয়া তাহার কিরণ ভাব হইল। নিশ্চয় তাহার মনটা সেইদিকে পালাই- পালাই করিতেছে। শুধু সেজন্য নহে, মহেন্দ্রের মন এই কারণে আরো ছটফট করিতে লাগিল যে, বিহারীর এই সংকল্পে তাহার প্রতি বিনোদিনীর ভক্তি আরো বাড়িয়া উঠিবে। বিহারীকে মহেন্দ্র মনে মনে ‘হাস্মাগ’ বলিল, বিহারীর এই কাজটাকে ‘হজুগ’ বলিয়া অভিহিত করিল— কহিল, ‘লোকের হিতকারী হইয়া উঠিবার হজুগ বিহারীর ছেলেবেলা হইতেই আছে।’ মহেন্দ্র নিজেকে বিহারীর তুলনায় একান্ত অকৃত্রিম বলিয়া বাহবা দিবার চেষ্টা করিল— কহিল, ‘ওন্দার্য ও আত্মত্যাগের ভড়ঙে মৃঢ়লোক ভুলাইবার চেষ্টাকে আমি ঘৃণা করি।’ কিন্তু হায়, এই পরমনিশ্চেষ্ট অকৃত্রিমতার মাহাত্ম্য লোকে অর্থাৎ বিশেষ

কোনো- একটি লোক হয়তো বুঝিবে না। মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, বিহারী যেন তাহার উপরে এও একটা চাল চালিয়াছে।

বিনোদিনীর পদশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কাগজখানা মুড়িয়া তাহার উপরে চাপিয়া বসিল। স্নাত বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিলে, মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার কী- এক অপরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। সে যেন এই কয়দিন আগুন জ্বলিয়া তপস্যা করিতেছিল। তাহার শরীর কৃশ হইয়া গেছে, এবং সেই কৃশতা ভেদ করিয়া তাহার পাঞ্চুবর্ণ মুখে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।

বিনোদিনী বিহারীর পত্রের আশা ত্যাগ করিয়াছে। নিজের প্রতি বিহারীর নিরতিশয় অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া সে অহোরাত্রি নিঃশব্দে দন্ধ হইতেছিল। এই দাহ হইতে নিঃকৃতি পাইবার কোনো পথ তাহার কাছে ছিল না। বিহারী যেন তাহাকেই তিরক্ষার করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে— তাহার নাগাল পাইবার কোনো উপায় বিনোদিনীর হাতে নাই। কর্মপরায়ণা নিরলসা বিনোদিনী কর্মের অভাবে এই ক্ষুদ্র বাসার মধ্যে যেন রূদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিতেছিল— তাহার সমস্ত উদ্যম তাহার নিজেকে ক্ষতিবিক্ষত করিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার সমস্ত ভাবী জীবনকে এই প্রেমহীন কর্মহীন আনন্দহীন বাসার মধ্যে, এই রূদ্ধ গলির মধ্যে চিরকালের জন্য আবন্দ কল্পনা করিয়া তাহার বিদ্রোহী প্রকৃতি আয়ত্তাতীত অদ্বিতীয়ের বিরুদ্ধে যেন আকাশে মাথা ঠুকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। যে মৃঢ় মহেন্দ্র বিনোদিনীর সমস্ত মুক্তি পথ চারিদিক হইতে রূদ্ধ করিয়া তাহার জীবনকে এমন সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বিনোদিনীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সীমা ছিল না। বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেন্দ্রকে সে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষুদ্র বাসায় মহেন্দ্র তাহার কাছে ঘেঁষিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিবে— প্রতিদিন অলঙ্ক্ষ্য আর্কষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকিবে— এই অঙ্কুরে, এই সমাজভ্রষ্ট জীবনের পক্ষশয্যায় ঘৃণা এবং আসক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যন্ত বীভৎস। বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তর্শ্লে হইতে এই যে একটা লোলজিহু লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে বাহির করিয়াছে, ইহার পৃষ্ঠপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ বাসা, তাহাতে মহেন্দ্রের বাসনা-তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত— ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতঙ্কে পীড়িত হইয়া উঠে। জীবনে ইহার সমাপ্তি কোথায়। কবে সে এই সমস্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে।

বিনোদিনীর সেই কৃশপাঞ্চুর মুখ দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ঈর্ষান্ল জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কি এমন কোনো শক্তি নাই, যাহা দ্বারা সে বিহারীর চিত্তা হইতে এই তপস্বিনীকে বলপূর্বক উৎপাত্তি করিয়া লইতে পারে। ঈগল যেমন মেষশাবককে এক নিমেষে ছোঁ মারিয়া তাহার সুদুর্গম অভ্যন্তরীণ পর্বতনীড়ে উত্তীর্ণ করে, তেমনি এমন কি কোনো মেঘপরিবৃত নিখিলবিস্মৃত স্থান নাই, যেখানে একাকী মহেন্দ্র তাহার এই কোমল- সুন্দর শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে। ঈর্ষার উভাপে তাহার ইচ্ছার আগ্রহ চতুর্ণগ বাড়িয়া উঠিল। আর কি সে একমুহূর্তও বিনোদিনীকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে। বিহারীর বিভীষিকাকে অহরহ ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে সূচ্যগ্রামাত্র অবকাশ দিতে আর তো মহেন্দ্রের সাহস হইবে না।

বিরহতাপে রমণীর সৌন্দর্যকে সুকুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ কথা সংক্ষতকাব্যে পড়িয়াছিল, আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই সুখমিশ্রিত দুঃখের সুতীর আলোড়নে তাহার হৃদয় একান্ত মথিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী ক্ষণকাল স্ত্রির থাকিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুমি কি চা খাইয়া আসিয়াছ।’ মহেন্দ্র কহিল, ‘নাহয় খাইয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া স্বহস্তে আর- এক পেয়ালা দিতে কৃপণতা করিয়ো না- ‘প্যালা মুঝ ভর দে রে’।’

বিনোদিনী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে মহেন্দ্রের এই উচ্ছাসে হঠাত আঘাত দিল- কহিল, ‘বিহারী- ঠাকুরপো এখন কোথায় আছেন খবর জান?’

মহেন্দ্র নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া কহিল, ‘সে তো এখন কলিকাতায় নাই।’

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কী।

মহেন্দ্র। সে তো কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি খবর লওয়া যায় না।

মহেন্দ্র। আমার তো তেমন জরুরি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব। আশেশব বন্ধুত্ব কি কিছুই নয়।

মহেন্দ্র। বিহারী আমার আশেশব বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব দুদিনের- তবু তাগিদটা তোমারই যেন অত্যন্ত বেশি বোধ হইতেছে।

বিনোদিনী। তাহাই দেখিয়া তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বন্ধুত্ব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তোমার অমন বন্ধুর কাছ হইতেও শিখিতে পারিলে না?

মহেন্দ্র। সেজন্য তত দুঃখিত নহি, কিন্তু ফাঁকি দিয়া স্ত্রীলোকের মন হরণ কেমন করিয়া করিতে হয়, সে বিদ্যা তাহার কাছে শিখিলে আজ কাজে লাগিতে পারিত।

বিনোদিনী। সে বিদ্যা কেবল ইচ্ছা থাকিলেই শেখা যায় না, ক্ষমতা থাকা চাই।

মহেন্দ্র। গুরুদেবের ঠিকানা যদি তোমার জানা থাকে তো বলিয়া দাও, এ বয়সে তাহার কাছে একবার মন্ত্র লইয়া আসি, তাহার পরে ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

বিনোদিনী। বন্ধুর ঠিকানা যদি বাহির করিতে না পার, তবে প্রেমের কথা আমার কাছে উচ্চারণ করিয়ো না। বিহারী- ঠাকুরপোর সঙ্গে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে কে বিশ্বাস করিতে পারে।

মহেন্দ্র। আমাকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতে, তবে আমাকে এত অপমান করিতে না। আমার ভালোবাসা সম্বন্ধে যদি এত নিঃসংশয় না হইতে, তবে হয়তো আমার এত অসহ্য দুঃখ ঘটিত না। বিহারী পোষ না- মানিবার বিদ্যা জানে, সেই বিদ্যাটা যদি সে এই হতভাগ্যকে শিখাইত, তবে বন্ধুত্বের কাজ করিত।

“বিহারী যে মানুষ, তাই সে পোষ মানিতে পারে না”, এই বলিয়া বিনোদিনী খোলা চুল পিঠে মেলিয়া যেমন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রোষগর্জিতস্বরে কহিল, “কেন তুমি আমাকে বার বার অপমান করিতে সাহস কর। এত অপমানের কোনো প্রতিফল পাও না, সে কি তোমার ক্ষমতায় না আমার গুণে। আমাকে যদি পশ্চ বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশ্চ বলিয়াই জানিয়ো। আমি একেবারে আঘাত করিতে জানি না, এতবড়ো কাপুরুষ নই।” বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল স্তুর হইয়া রহিল— তাহার পর বলিয়া উঠিল, ‘বিনোদ, এখান হইতে কোথাও চলো। আমরা বাহির হইয়া পড়ি। পশ্চিমে হউক, পাহাড়ে হউক, যেখানে তোমার ইচ্ছা, চলো। এখানে বাঁচিবার স্থান নাই। আমি মরিয়া যাইতেছি।”

বিনোদিনী কহিল, “চলো, এখনই চলো— পশ্চিমে যাই।”

মহেন্দ্র। পশ্চিমে কোথায় যাইবে।

বিনোদিনী। কোথাও নহে। এক জায়গায় দুদিন থাকিব না— স্থুরিয়া বেড়াইব।

মহেন্দ্র কহিল, “সেই ভালো, আজ রাত্রেই চলো।”

বিনোদিনী সম্মত হইয়া মহেন্দ্রের জন্য রন্ধনের উদ্যোগ করিতে গেল।

মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল, বিহারীর খবর বিনোদিনীর চোখে পড়ে নাই। খবরের কাগজে মন দিবার মতো অবধানশক্তি বিনোদিনীর এখন আর নাই। পাছে দৈবাং সে- খবর বিনোদিনী জানিতে পারে, সেই উদ্বেগে মহেন্দ্র সমস্ত দিন সতর্ক হইয়া রহিল।

অধ্যায় - ৪৬

বিহারীর খবর লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিবে, এই স্থির করিয়া বাড়িতে তাহার জন্য আহার প্রস্তুত হইয়াছিল। অনেক দেরি দেখিয়া পীড়িত রাজলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। সারারাত ঘুম না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ঝান্ট ছিলেন, তাহার উপরে মহেন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে দেখিয়া আশা খবর লইয়া জানিল, মহেন্দ্রের গাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোচম্যানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি হইয়া পটলডাঙার বাসায় গিয়াছে। শুনিয়া রাজলক্ষ্মী দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া স্তুর হইয়া শুইলেন। আশা তাঁহার শিয়ারের কাছে চিরার্পিতের মতো স্থির হইয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অন্যদিন যথাসময়ে আশাকে খাইতে যাইবার জন্য রাজলক্ষ্মী আদেশ করিতেন— আজ আর কিছু বলিলেন না। কাল রাত্রে তাঁহার কঠিন পীড়া দেখিয়াও মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর মোহে ছুটিয়া গেল তখন রাজলক্ষ্মীর পক্ষে এ সংসারে প্রশ্ন করিবার, চেষ্টা করিবার, ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রহিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বটে যে, মহেন্দ্র তাঁহার পীড়াকে সামান্য জ্ঞান করিয়াছে; অন্যান্যবার যেমন মাঝে মাঝে রোগ দেখা দিয়া সারিয়া গেছে, এবারেও সেইরূপ একটা ক্ষণিক উপসর্গ ঘটিয়াছে মনে করিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত আছে; কিন্তু এই আশঙ্কাশূন্য অনুদ্বেগই রাজলক্ষ্মীর কাছে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হইল। মহেন্দ্র প্রেমোন্নতায় কোনো আশঙ্কাকে, কোনো কর্তব্যকে মনে স্থান দিতে চায় না, তাই সে মাতার কষ্টকে পীড়াকে এতই লম্বু করিয়া দেখিয়াছে— পাছে জননীর রোগশয্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়, তাই সে এমন নির্লজ্জের মতো একটু অবকাশ পাইতেই বিনোদিনীর কাছে পলায়ন করিয়াছে। রোগ-আরোগ্যের প্রতি রাজলক্ষ্মীর আর লেশমাত্র উৎসাহ রহিল না— মহেন্দ্রের অনুদ্বেগ যে অমূলক, দারুণ অভিমানে ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

বেলা দুটার সময় আশা কহিল, “মা, তোমার ওষুধ খাইবার সময় হইয়াছে।” রাজলক্ষ্মী উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আশা ওষুধ আনিবার জন্য উঠিলে তিনি বলিলেন, “ওষুধ দিতে হইবে না বউমা, তুমি যাও।”

আশা মাতার অভিমান বুঝিতে পারিল— সে অভিমান সংক্রামক হইয়া তাহার হৃদয়ের আন্দোলনে দিগ্নগ দোলা দিতেই আশা আর থাকিতে পারিল না— কান্না চাপিতে চাপিতে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে আশার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার হাতের উপরে সকরণ স্নেহে আন্তে আন্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কহিলেন, “বউমা, তোমার বয়স অল্প, এখনো তোমার সুখের মুখ দেখিবার সময় আছে। আমার জন্য তুমি আর চেষ্টা করিয়ো না, বাঢ়া— আমি তো অনেক দিন বাঁচিয়াছি— আর কী হইবে।”

শুনিয়া আশার রোদন আরো উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল— সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

এইরপে রোগীর গৃহে নিরানন্দ দিন মন্দগতিতে কাটিয়া গেল। অভিমানের মধ্যেও এই দুই নারীর ভিতরে ভিতরে আশা ছিল, এখনই মহেন্দ্র আসিবে। শব্দ মাত্রেই উভয়ের দেহে যে একটি চমক- সঞ্চার হইতেছিল, তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিতেছিলেন। ক্রমে দিবাবসানের আলোক সুস্পষ্ট হইয়া আসিল, কলিকাতার অন্তঃপুরের মধ্যে সেই গোধুলির যে আভা, তাহাতে আলোকের প্রফুল্লতাও নাই, অন্ধকারের আবরণও নাই— তাহা বিষাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে, তাহা কর্ম ও আশাসের বল হরণ করে অথচ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের শান্তি আনয়ন করে না। রূপগংগারে সেই শুক্ষ শ্রীহীন সন্ধ্যায় আশা নিঃশব্দপদে উঠিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে আনিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বউমা, আলো ভালো লাগিতেছে না, প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া দাও।”

আশা প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া আসিয়া বসিল। অন্ধকার যখন ঘনতর হইয়া এই শুন্দি কক্ষের মধ্যে বাহিরের অনন্ত রাত্রিকে আনিয়া দিল, তখন আশা রাজলক্ষ্মীকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, তাহাকে কি একবার খবর দিব।”

রাজলক্ষ্মী দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “না বউমা, তোমার প্রতি আমার শপথ রহিল, মহেন্দ্রকে খবর দিয়ো না।”

শুনিয়া আশা স্তন্ত্র হইয়া রহিল; তাহার আর কাঁদিবার বল ছিল না।

বাহিরে দাঁড়াইয়া বেহারা কহিল, “বাবুর কাছ হইতে চিঠ্ঠি আসিয়াছে।”

শুনিয়া মুহূর্তের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর মনে হইল, মহেন্দ্রের হয়তো হঠাত একটা কিছু ব্যামো হইয়াছে, তাই সে কোনোমতেই আসিতে না পারিয়া চিঠি পাঠাইয়াছে। অনুতঙ্গ ও ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ‘‘দেখো তো বউমা, মহিন কী লিখিয়াছে।’’

আশা বাহিরে প্রদীপের আলোকে কম্পিতহষ্টে মহেন্দ্রের চিঠি পড়িল। মহেন্দ্র লিখিয়াছে, কিছুদিন হইতে সে ভালো বোধ করিতেছিল না, তাই সে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছে। মাতার অসুখের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ কিছুই নাই। তাহাকে নিয়মিত দেখিবার জন্য সে নবীন- ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘুম না হইলে বা মাথা ধরিলে কখন কী করিতে হইবে তাহাও চিঠির মধ্যে লেখা আছে— এবং দুই টিন লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য মহেন্দ্র ডাক্তারখানা হইতে আনাইয়া চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়াছে। আপাতত গিরিধির ঠিকানায় মাতার সংবাদ অবশ্য- অবশ্য জানাইবার জন্য পুনশ্চের মধ্যে অনুরোধ আছে।

এই চিঠি পড়িয়া আশা স্তন্ত্রিত হইয়া গেল— প্রবল ধিক্কার তাহার দুঃখকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। এই নিষ্ঠুর বার্তা মাকে কেমন করিয়া শুনাইবে।

আশার বিলম্বে রাজলক্ষ্মী অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, ‘‘বউমা, মহিন কী লিখিয়াছে শীত্র আমাকে শুনাইয়া দাও।’’ বলিতে বলিতে তিনি আগ্রহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আশা তখন ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘শরীরের কথা মহিন কী লিখিয়াছে, ঐখানটা আর- একবার পড়ো তো।’’

আশা পুনরায় পড়িল, ‘‘কিছুদিন হইতেই আমি তেমন ভালো বোধ করিতেছিলাম না, তাই আমি— ’’

রাজলক্ষ্মী। থাক্ থাক্, আর পড়িতে হইবে না। ভালো বোধ হইবে কী করিয়া। বুড়ো মা মরেও না, অথচ কেবল ব্যামো লইয়া তাহাকে জালায়। কেন তুমি মহিনকে আমার অসুখের কথা খবর দিতে গেলে। বাড়িতে ছিল, ঘরের কোণে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, কাহারো কোনো এলাকায় ছিল না— মাঝে হইতে মার ব্যামোর কথা পাড়িয়া তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোমার কী সুখ হইল। আমি এখানে মরিয়া থাকিলে তাহাতে কাহার কী ক্ষতি হইত। এত দুঃখেও তোমার ঘটে এইটুকু বুদ্ধি আসিল না?

বলিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন।

বাহিরে মসমস শব্দ শুনা গেল। বেহারা কহিল, ‘‘ডাক্তারবাবু আয়া।’’

ডাক্তার কাশিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া খাটের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার কী হইয়াছে বলুন তো।”

রাজলক্ষ্মী ক্রোধের স্বরে কহিলেন, “হইবে আর কী। মানুষকে কি মরিতে দিবে না। তোমার ওষুধ খাইলেই কি অমর হইয়া থাকিব।”

ডাক্তার সান্ত্বনার স্বরে কহিল, “অমর করিতে না পারি, কষ্ট যাহাতে কমে সে চেষ্টা—”

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিলেন, “কষ্টের ভালো চিকিৎসা ছিল যখন বিধবারা পুড়িয়া মরিত— এখন এ তো কেবল বাঁধিয়া মারা। যাও ডাক্তারবাবু, তুমি যাও— আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমি একলা থাকিতে চাই।”

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে কহিল, “আপনার নাড়িটা একবার—”

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিলেন, “আমি বলিতেছি, তুমি যাও। আমার নাড়ি বেশ আছে— এ নাড়ি শীଘ্র ছাড়িবে এমন ভরসা নাই।”

ডাক্তার অগত্যা ঘরের বাহিরে গিয়া আশাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশাকে নবীন- ডাক্তার রোগের সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সমস্ত শুনিয়া গন্তীরভাবে ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল। কহিল, “দেখুন মহেন্দ্র আমার উপর বিশেষ করিয়া ভার দিয়া গেছে। আমাকে যদি আপনার চিকিৎসা করিতে না দেন, তবে সে মনে কষ্ট পাইবে।”

মহেন্দ্র কষ্ট পাইবে, এ কথাটা রাজলক্ষ্মীর কাছে উপহাসের মতো শুনাইল— তিনি কহিলেন, ‘মহিনের জন্য বেশি ভাবিয়ো না। কষ্ট সংসারে সকলকেই পাইতে হয়। এ কষ্টে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত বেশি কাতর করিবে না। তুমি এখন যাও ডাক্তার। আমাকে একটু ঘুমাইতে দাও।’

নবীন- ডাক্তার বুঝিল, রোগীকে উত্ত্যক্ত করিলে ভালো হইবে না; ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া যাহা কর্তব্য আশাকে উপদেশ দিয়া গোল।

আশা ঘরে ঢুকিতে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘যাও বাছা, তুমি একটু বিশ্রাম করো গে। সমস্ত দিন রোগীর কাছে বসিয়া আছ। হারুর মাকে পাঠাইয়া দাও— পাশের ঘরে বসিয়া থাক।’

আশা রাজলক্ষ্মীকে বুঝিত। ইহা তাঁহার স্নেহের অনুরোধ নহে, ইহা তাঁহার আদেশ— পালন করা ছাড়া আর উপায় নাই। হারুর মাকে পাঠাইয়া দিয়া অন্ধকারে সে নিজের ঘরে গিয়া শীতল ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনের উপবাসে ও কষ্টে তাহার শরীর- মন শ্রান্ত ও অবসন্ন। পাড়ার বাড়িতে সেদিন থাকিয়া থাকিয়া বিবাহের বাদ্য বাজিতেছিল। এই সময়ে সানাইয়ে আবার সুর ধরিল। সেই রাগিণীর আঘাতে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার যেন স্পন্দিত হইয়া আশাকে বারংবার যেন অভিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বিবাহরাত্রির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটিও সজীব হইয়া রাত্রির আকাশকে স্পন্দিত পূর্ণ করিয়া তুলিল; সেদিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা, সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোম- ধূমের গন্ধ; নববধূর শক্তি লজ্জিত আনন্দিত হৃদয়ের নিগৃত কম্পন— সমস্তই সূতির আকারে যতই তাহাকে চারি দিকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, ততই তাহার হৃদয়ের ব্যথা প্রাণ পাইয়া বল করিতে লাগিল। দারুণ দুর্ভিক্ষে ক্ষুধিত বালক যেমন খাদ্যের

জন্য মাতাকে আঘাত করিতে থাকে, তেমনি জাগ্রত সুখের সূচি আপনার খাদ্য চাহিয়া আশার বক্ষে বারংবার সরোদন করাঘাত করিতে লাগিল। অবসন্ন আশাকে আর পড়িয়া থাকিতে দিল না। দুই হাত জোড় করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে গিয়া সংসারে তার একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা মাসিমার পরিত্র স্নিগ্ধ মূর্তি আশার অশ্রুবাস্পাচ্ছম হৃদয়ের মধ্যে আবিভূত হইল। পুনরায় সংসারের দুঃখ-ঝঙ্গাটে সেই তাপসীকে আহুন করিয়া আনিবে না, এতদিন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ সে আর কোথাও কোনো উপায় দেখিতে পাইল না— আজ তাহার চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মধ্যে আর রঞ্জমাত্র ছিল না। তাই আজ সে ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়া কোলের উপর এখনানা খাতার চিঠির কাগজ রাখিয়া ঘনঘন চোখের জল মুছিতে মুছিতে চিঠি লিখিতে লাগিল—

‘শ্রীচরণকমলেষু-

মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই; একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই দুঃখিনীকে টানিয়া লও। নহিলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। আর কী লিখিব, জানি না। তোমার চরণে আমার শতসহস্রকোটি প্রণাম।

তোমার
চুনি।’

মেহের

অধ্যায় - ৪৭

অন্নপূর্ণা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইলেন। মাঝখানের বিরোধিচ্ছেদ সত্ত্বেও অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী যেন হারানো ধন ফিরিয়া পাইলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে নিজের অলঙ্ক্ষে অগোচরে অন্নপূর্ণাকে চাহিতেছিলেন, অন্নপূর্ণাকে পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার এতদিনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্ষোভ যে কেবল অন্নপূর্ণার অভাবে, অনেক দিনের পরে আজ তাহা তাঁহার কাছে মুহূর্তের মধ্যে সুস্পষ্ট হইল। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ব্যথিত হৃদয় তাহার চিরস্তন স্থানটি অধিকার করিল। মহেন্দ্রের জন্মের পূর্বেও এই দুটি জা যখন বধূভাবে এই পরিবারের সমস্ত সুখদুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন— পূজায় উৎসবে, শোকে মৃত্যুতে, উভয়ে এই সংসার- রথে একত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন— তখনকার সেই ঘনিষ্ঠ স্থিতি রাজলক্ষ্মীর হৃদয়কে আজ মুহূর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। যাহার সঙ্গে সুন্দূর অতীতকালে একত্রে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, নানা ব্যাঘাতের পর সেই বাল্যসহচরীই পরম দঃখের দিনে তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী হইলেন— তখনকার সমস্ত সুখদুঃখের, সমস্ত প্রিয় ঘটনার এই একটিমাত্র স্মরণাশ্রয় রহিয়াছে। যাহার জন্য রাজলক্ষ্মী ইঁহাকেও নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই বা আজ কোথায় !

অন্নপূর্ণা রোগীৰ পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন, “দিদি !”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “মেজোবউ।” বলিয়া আর তাঁহার কথা বাহির হইল না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশা এই দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না— পাশের ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বা আশার কাছে অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন পাড়িতে সাহস করিলেন না। সাধুচরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মামা, মহিন কোথায়।”

তখন সাধুচরণ বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। অন্নপূর্ণা সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিহারীর কী খবর।”

সাধুচরণ কহিলেন, “অনেকদিন তিনি আসেন নাই— তাঁহার খবর ঠিক বলিতে পারি না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “একবার বিহারীর বাড়িতে গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইস।”

সাধুচরণ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “তিনি বাড়িতে নাই, বালিতে গঙ্গার ধারে বাগানে গিয়াছেন।”

অন্নপূর্ণা নবীন- ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার কহিল, “হংপিণ্ডের দুর্বলতার সঙ্গে উদরী দেখা দিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাত কখন আসিবে কিছুই বলা যায় না।”

সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষ্মীর রোগের কষ্ট যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, একবার নবীন- ডাক্তারকে ডাকাই।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘না মেজোবউ, নবীন- ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “তবে কাহাকে তুমি ডাকিতে চাও বলো।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “একবার বিহারীকে যদি খবর দাও তো ভালো হয়।”

অন্নপূর্ণার বক্ষের মধ্যে আঘাত লাগিল। সেদিন দুরপ্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় তিনি দ্বারের বাহির হইতে অন্ধকারের মধ্যে বিহারীকে অপমানের সহিত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বেদনা তিনি আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। বিহারী আর কখনোই তাঁহার দ্বারে ফিরিয়া আসিবে না। ইহজীবনে আর যে কখনো সেই অনাদরের প্রতিকার করিতে অবসর পাইবেন, এ আশা তাঁহার মনে ছিল না।

অন্নপূর্ণা একবার ছাদের উপর মহেন্দ্রের ঘরে গেলেন। বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন। আজ সে ঘরের কোনো শ্রী নাই— বিছানাপত্র বিশ্ঞুখল, সাজসজ্জা অনাদৃত, ছাদের টবে কেহ জল দেয় না, গাছগুলি শুকাইয়া গেছে।

মাসিমা ছাদে গিয়াছেন বুঝিয়া আশা ও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাঁহার মন্তকচুম্বন করিলেন। আশা নত হইয়া দুই হাতে তাঁহার দুই পা ধরিয়া বার বার তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইল। কহিল, ‘‘মাসিমা, আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে বল দাও। মানুষ যে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তাহা আমি কোনোকালে ভাবিতেও পারিতাম না। মা গো, এমন আর কতদিন সহিবে।’’

অন্নপূর্ণা সেইখানেই মাটিতে বসিলেন, আশা তাঁহার পায়ে মাথা দিয়া লুটাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা আশার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইলেন, এবং কোনো কথা না কহিয়া নিষ্কুর্বাবে জোড়হাত করিয়া দেবতাকে স্মরণ করিলেন।

অন্নপূর্ণার স্নেহসিদ্ধিত নিঃশব্দ আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পরে শান্তি আনয়ন করিল। তাহার মনে হইল, তাহার অভীষ্ট যেন সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। দেবতা তাহার মতো মৃচ্যকে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মাসিমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

হৃদয়ের মধ্যে আশ্বাস ও বল পাইয়া আশা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, ‘‘মাসিমা, বিহারী-ঠাকুরপোকে একবার আসিতে চিঠি লিখিয়া দাও।’’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘‘না, চিঠি লেখা হইবে না।’’

আশা। তবে তাঁহাকে খবর দিবে কী করিয়া।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘‘কাল আমি বিহারীর সঙ্গে নিজে দেখা করিতে যাইব।’’

অধ্যায় - ৪৮

বিহারী যখন পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহার মনে হইল, একটা- কোনো কাজে নিজেকে আবদ্ধ না করিলে তাহার আর শান্তি নাই। সেই মনে করিয়া কলিকাতার দরিদ্র কেরানিদের চিকিৎসা ও শুশ্রাব ভার সে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া থাবি থাইয়া থাকে, গলি- নিবাসী অল্পাশী পরিবারভারগ্রস্ত কেরানির বঞ্চিত জীবন সেইরূপ- সেই বিবর্ণ কৃশ দুচিত্তাগ্রস্ত ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি বিহারীর অনেক দিন হইতে করুণাদৃষ্টি ছিল- তাহাদিগকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।

বালিতে বাগান লইয়া চীনে মিস্ট্রির সাহায্যে সে সুন্দর করিয়া ছোটো ছোটো কুটির তৈরি করাইতে আরস্ত করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মন শান্ত হইল না। কাজে প্রবৃত্ত হইবার দিন তাহার যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার চিন্তা আপন সংকল্প হইতে বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, ‘এ কাজে কোনো সুখ নাই, কোনো রস নাই, কোনো সৌন্দর্য নাই- ইহা কেবল শুক্ষ ভারমাত্র।’ কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনো ইতিপূর্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।

একদিন ছিল যখন বিহারীর বিশেষ কিছুই দরকার ছিল না; তাহার সমুখে যাহা- কিছু উপস্থিত হইত, তাহার প্রতিই অনায়াসে সে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিত। এখন তাহার মনে একটা- কী ক্ষুধার উদ্দেক্ষ হইয়াছে, আগে তাহাকে নির্বৃত না করিয়া অন্য কিছুতেই তাহার আসন্তি হয় না। পূর্বেকার অভ্যাসমতে সে এটা- ওটা নাড়িয়া দেখে, পরক্ষণেই সে- সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়া ছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদনীর সোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোজাত গরুড়ের মতো সে আপন খোরাকের জন্য সমস্ত জগৎকাকে ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষুধিত প্রাণীর সহিত বিহারীর পূর্বপরিচয় ছিল না, ইহাকে লইয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন কলিকাতার ক্ষীণজীর্ণ স্থল্পায়ু কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।

আষাঢ়ের গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পরপারে নীলমেঘ ঘনশ্রেণী- গাছপালার উপরে ভারাবনত নিবিড়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠে; সমস্ত নদীতল ইস্পাতের তরবারির মতো কোথাও বা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও বা আগুনের মতো ঝকঝক করিতে থাকে। নববর্ষার এই সমারোহের মধ্যে যেমনি বিহারীর দৃষ্টি পড়ে, অমনি তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আকাশের এই নীলমিঞ্চ আলোকের মধ্যে কে একাকিনী বাহির হইয়া আসে, কে তাহার জ্ঞানসিঙ্গ ঘনতরপায়িত কৃষকেশ উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়, বর্ষাকাশ হইতে বিদীর্ঘমেঘচ্ছুরিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মিকে কুড়াইয়া লইয়া কে একমাত্র তাহারই মুখের উপরে অনিমেষ দৃষ্টির দীপ্তি কাতরতা প্রসারিত করে।

পূর্বের যে জীবনটা তাহার সুখে- সন্তোষে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে পরম ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সম্প্রদায়, এমন কত পৃষ্ঠিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহারা বিহারীর শূন্য হৃদয়ের দ্বারের কাছে আসিয়া সুধাপাত্রহস্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেছে- সেই দুর্লভ শুভক্ষণে কত সংগীত অনারকু, কত উৎসব অসম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। বিহারীর মনে যে- সকল পূর্বসূতি ছিল, বিনোদনী সেদিনকার উদ্যত চুম্বনের রক্তিম আভার দ্বারা সেগুলিকে আজ এমন বিবর্ণ অকিঞ্চিতকর করিয়া দিয়া গেল। মহেন্দ্রের ছায়ার মতো হইয়া জীবনের অধিকাংশ দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কী চরিতার্থতা ছিল। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল- স্থল- আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে যে এমন

রাগিনীতে এমন বাঁশি বাজে, তাহা তো অচেতন বিহারী পূর্বে কখনো অনুমান করিতেও পারে নাই। যে-বিনোদিনী দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া এক মুহূর্তে অকস্মাত এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সে আর কেমন করিয়া ভুলিবে। তাহার দৃষ্টি তাহার আকাঙ্ক্ষা আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যাকুল ঘননিশ্চাস বিহারীর রক্তপ্রোতকে অহরহ তরঙ্গিত করিয়া তুলিতেছে এবং তাহার স্পর্শের সুকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেষ্টন করিয়া পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দূরে রহিয়াছে কেন। তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে- সৌন্দর্যরসে বিহারীকে অভিযন্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পক্ষ উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন- কোথায় স্থাপন করিতে পারে, যেখানে সুন্দর বীভৎস হইয়া না উঠে। তাহা ছাড়া মহেন্দ্রের সহিত যদি কাঢ়াকড়ি বাধিয়া যায়, তবে সমস্ত ব্যাপারটা এতই কুৎসিত আকার ধারণ করিবে যে, সে সন্তানবা বিহারী মনের প্রান্তেও স্থান দিতে পারে না। তাই বিহারী নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসংগীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দন্ধ করিতেছে। পাছে এমন কোনো সংবাদ পায়, যাহাতে তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্নবিছিন্ন হইয়া যায়, তাই সে চিঠি লিখিয়া বিনোদিনীর কোনো খবরও লয় না।

তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ জামগাছের তলায় মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে বিহারী চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সমুখ দিয়া কুঠির পানসি যাতায়াত করিতেছিল, তা- ই সে অলসভাবে দেখিতেছিল; ক্রমে বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাকর আসিয়া আহারের আয়োজন করিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল— বিহারী কহিল, “এখন থাক।” মিস্ত্রির সর্দার আসিয়া বিশেষ পরামর্শের জন্য তাহাকে কাজ দেখিতে আহ্বান করিল— বিহারী কহিল, ‘আর- একটু পরে।’

এমন সময় বিহারী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সমুখে অন্নপূর্ণা। শশব্যন্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল— দুই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া পরমন্ত্রে বিহারীর মাথা ও গা স্পর্শ করিলেন। অশ্রুজড়িতস্বরে কহিলেন, “বিহারী, তুই এত রোগা হইয়া গেছিস কেন।”

বিহারী কহিল, ‘কাকীমা, তোমার স্নেহ ফিরিয়া পাইবার জন্য।’

শুনিয়া অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া বরবার করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কাকীমা, তোমার এখনো খাওয়া হয় নাই?”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘না, এখনো আমার সময় হয় নাই।’

বিহারী কহিল, “চলো, আমি রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিই গে। আজ অনেক দিন পরে তোমার হাতের রান্না এবং তোমার পাতের প্রসাদ খাইয়া বাঁচিব।”

মহেন্দ্র- আশার সমন্বে বিহারী কোনো কথাই উথাপন করিল না। অন্নপূর্ণা একদিন স্বহস্তে বিহারীর নিকটে সেদিককার দ্বার রঞ্জ করিয়া দিয়াছেন। অভিমানের সহিত সেই নিষ্ঠুর নিষেধ সে পালন করিল।

আহারান্তে অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘মৌকা ঘাটেই প্রস্তুত আছে, বিহারী, এখন একবার কলিকাতায় চল্।’

বিহারী কহিল, ‘কলিকাতায় আমার কোন্ প্রয়োজন।’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘দিদির বড়ো অসুখ, তিনি তোকে দেখিতে চাহিয়াছেন।’

শুনিয়া বিহারী চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহিন্দা কোথায়।’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘সে কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে চলিয়া গেছে।’

শুনিয়া মুহূর্তে বিহারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুই কি সকল কথা জানিস নে।’

বিহারী কহিল, ‘কতকটা জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না।’

তখন অন্নপূর্ণা বিনোদিনীকে লইয়া মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়ন- বার্তা বলিলেন। বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাত্ জলস্থল- আকাশের সমস্ত রঙ বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনা- ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল। ‘মায়াবিনী বিনোদিনী কি সৈনিকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া খেলা করিয়া গেল। তাহার ভালোবাসার আত্মসমর্পণ সমস্তই ছলনা ! সে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্লজ্জভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল ! ধিক্ তাহাকে, এবং ধিক্ আমাকে যে- আমি মৃঢ়- তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিয়াছিলাম ।’

হায় মেঘাচ্ছন্ম আষাঢ়ের সন্ধ্যা, হায় গতবৃষ্টি পূর্ণিমার রাত্রি, তোমাদের ইন্দ্রজাল কোথায় গেল।

অধ্যায় - ৪৯

বিহারী ভাবিতেছিল, দুঃখিনী আশার মুখের দিকে সে চাহিবে কী করিয়া। দেউড়ির মধ্যে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন নাথহীন সমস্ত বাড়িটার ঘনীভূত বিষাদ তাহাকে এক মুহূর্তে আব্রত করিয়া ফেলিল। বাড়ির দরোয়ান ও চাকরদের মুখের দিকে চাহিয়া উন্মত্ত নিরাদেশ মহেন্দ্রের জন্য লজ্জায় বিহারীর মাথা নত করিয়া দিল। পরিচিত ভৃত্যদিগকে সে নিন্দিতভাবে পূর্বের মতো কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাহার পা যেন সরিতে চাহিল না। বিশ্বজনের সমুখে প্রকাশ্যভাবে মহেন্দ্র অসহায় আশাকে যে দারুণ অপমানের মধ্যে নিষ্কেপ করিয়া গেছে, যে- অপমানে স্ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হুরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের সকৌতৃল কৃপাদৃষ্টিবর্ষণের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দেয়, সেই অপমানের অনাব্রূত প্রকাশ্যতার মধ্যে বিহারী কুর্ণিত ব্যথিত আশাকে দেখিবে কোন প্রাণে।

কিন্তু এ- সকল চিন্তার ও সংকোচের আর অবসর রাখিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই আশা দ্রুতপদে আসিয়া বিহারীকে কহিল, “ঠাকুরপো, একবার শীত্র আসিয়া মাকে দেখিয়া যাও, তিনি বড়ে কষ্ট পাইতেছেন।”

বিহারীর সঙ্গে আশার প্রকাশ্যভাবে এই প্রথম আলাপ। দুঃখের দুর্দিনে একটিমাত্র সামান্য ঝটকায় সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহারা দূরে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে হঠাৎ- বন্যায় একটিমাত্র সংকীর্ণ ডাঙার উপরে একত্র করিয়া দেয়।

আশার এই সংকোচহীন ব্যাকুলতায় বিহারী আঘাত পাইল। মহেন্দ্র তাহার সংসারটিকে যে কী করিয়া দিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সে যেন অধিক বুঝিতে পারিল। দুর্দিনের তাড়নায় গ্রহের যেমন সজ্জা সৌন্দর্য উপোক্ষিত, গৃহলক্ষ্মীরও তেমনি লজ্জার শ্রীটুকু রাখিবারও অবসর ঘুচিয়াছে— ছোটোখাটো আবরণ- অন্তরাল বাছ- বিচার সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গেছে— তাহাতে আর আক্ষেপ করিবার সময় নাই।

বিহারী রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মী একটা আকস্মিক শ্বাসকষ্ট অনুভব করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন— সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতে পুনর্বার কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

বিহারী প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইতেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, ‘কেমন আছিস বেহারি। কতদিন তোকে দেখি নাই।’

বিহারী কহিল, ‘মা, তোমার অসুখ, এ খবর আমাকে কেন জানাইলে না। তাহা হইলে কি আমি এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতাম।’

রাজলক্ষ্মী মনুস্মরে কহিলেন, ‘সে কি আর আমি জানি না, বাঢ়া। তোকে পেটে ধরি নাই বটে, কিন্তু জগতে তোর চেয়ে আমার আপনার আর কি কেহ আছে।’ বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিহারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের কুলঙ্গিতে ওষুধপত্রের শিশি- কোটাগুলি পরীক্ষা করিবার ছলে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। ফিরিয়া আসিয়া সে যখন রাজলক্ষ্মীর নাড়ি দেখিতে উদ্যত হইল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘আমার নাড়ির খবর থাক্- জিজ্ঞাসা করি, তুই এমন রোগা হইয়া গেছিস কেন, বেহারি।’ বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার কৃশ হস্ত তুলিয়া বিহারীর কণ্ঠায় হাত বুলাইয়া দেখিলেন।

বিহারী কহিল, ‘তোমার হাতের মাছের ঝোল না খাইলে আমার এ হাড় কিছুতেই ঢাকিবে না। তুমি শীত্র শীত্র সারিয়া ওঠো মা, আমি ততক্ষণ রান্নার আয়োজন করিয়া রাখি।’

রাজলক্ষ্মী ম্লান হাসিয়া কহিলেন, “সকাল সকাল আয়োজন কর বাচা— কিন্তু রান্নার নয়।” বলিয়া বিহারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “বেহারি, তুই বউ ঘরে নিয়ে আয়, তোকে দেখিবার লোক কেহ নাই। ও মেজোবউ, তোমরা এবার বেহারির একটি বিয়ে দিয়ে দাও—দেখো- না, বাচার চেহারা কেমন হইয়া গেছে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “তুমি সারিয়া ওঠো, দিদি। এ তো তোমারই কাজ, তুমি সম্পন্ন করিবে, আমরা সকলে যোগ দিয়া আমোদ করিব।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার আর সময় হইবে না, মেজোবউ, বেহারির ভার তোমাদেরই উপর রহিল— উহাকে সুখী করিয়ো, আমি উহার খণ শুধিয়া যাইতে পারিলাম না—কিন্তু ভগবান উহার ভালো করিবেন।” বলিয়া বিহারীর মাথায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

আশা আর ঘরে থাকিতে পারিল না—কাঁদিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা অশ্রুজলের ভিতর দিয়া বিহারীর মুখের প্রতি মেহদৃষ্টিপাত করিলেন।

রাজলক্ষ্মীর হঠাতে কী মনে পড়িল—তিনি ডাকিলেন, ‘বউমা, ও বউমা।’

আশা ঘরে প্রবেশ করিতেই কহিলেন, ‘বেহারির খাবারের সব ব্যবস্থা করিয়াছ তো?’

বিহারী কহিল, ‘মা, তোমার এই পেটুক ছেলেটিকে সকলেই চিনিয়া লইয়াছে। দেউড়িতে ঢুকিতেই দেখি, ডিমওয়ালা বড়ো বড়ো কইমাছ চুপড়িতে লইয়া বামি হনহন করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়াছে—বুঝিলাম, এ বাড়িতে এখনো আমার খ্যাতি লুণ্ঠ হয় নাই।’ বলিয়া বিহারী হাসিয়া একবার আশার মুখের দিকে চাহিল।

আশা আজ আর লজ্জা পাইল না। সে স্নেহের সহিত স্মিতহাস্যে বিহারীর পরিহাস গ্রহণ করিল। বিহারী যে এ সংসারের কতখানি, আশা তাহা আগে সম্পূর্ণ জানিত না—অনেক সময় তাহাকে অনাবশ্যক আগন্তুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, অনেক সময় বিহারীর প্রতি বিমুখতাব তাহার আচরণে সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; সেই অনুতাপের ধিক্কারে আজ বিহারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং করণা সবেগে ধাবিত হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘মেজোবউ, বামুনঠাকুরের কর্ম নয়, রান্নাটা তোমায় নিজে দেখাইয়া দিতে হইবে— আমাদের এই বাঙাল ছেলে একরাশ ঝাল নহিলে খাইতে পারে না।’

বিহারী। তোমার মা ছিলেন বিক্রমপুরের মেয়ে, তুমি নদীয়া জেলার ভদ্রসন্তানকে বাঙাল বল? এ তো আমার সহ্য হয় না।

ইহা লইয়া অনেক পরিহাস হইল, এবং অনেক দিন পরে মহেন্দ্রের বাড়ির বিষাদভাব যেন লঘু লইয়া আসিল।

কিন্তু এত কথাবার্তার মধ্যে কোনো পক্ষ হইতে কেহ মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিল না। পূর্বে বিহারীর সঙ্গে মহেন্দ্রের কথা লইয়াই রাজলক্ষ্মীর একমাত্র কথা ছিল। তাহা লইয়া মহেন্দ্র নিজে তাহার মাতাকে অনেকবার পরিহাস করিয়াছে। আজ সেই রাজলক্ষ্মীর মুখে মহেন্দ্রের নাম একবারও না শুনিয়া বিহারী মনে মনে স্তুতি হইল।

রাজলক্ষ্মীর একটু নিদ্রাবেশ হইতেই বিহারী বাহিরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, “মার ব্যামো তো সহজ নহে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।” বলিয়া তাহার ঘরের জানলার কাছে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “একবার মহিনকে ডাকিয়া আনিবি না, বেহারি? আর তো দেরি করা উচিত হয় না।”

বিহারী কিছুক্ষণ নিরুক্তে থাকিয়া কহিল, “তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তাহার ঠিকানা কেহ কি জানে।”

অন্নপূর্ণা। ঠিক জানে না, খুঁজিয়া লইতে হইবে। বিহারী, আর- একটো কথা তোর কাছে বলি। আশাৰ মুখের দিকে চাস। বিনোদিনীৰ হাত হইতে মহেন্দ্রকে যদি উদ্ধার করিতে না পারিস তবে সে আৱ বাঁচিবে না। তাহার মুখ দেখিলেই বুবিতে পারিবি, তাৰ বুকে মৃত্যুবাণ বাজিয়াছে।

বিহারী মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া ভাবিল, ‘পৰকে উদ্ধার আমি করিতে যাইব— ভগবান, আমাৰ উদ্ধার কে করিবে।’ কহিল, “বিনোদিনীৰ আকৰ্ষণ হইতে চিৰকালেৰ জন্য মহেন্দ্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব, এমন মন্ত্ৰ আমি কি জানি কাকীমা? মাৰ ব্যামোতে সে দুদিন শান্ত হইয়া থাকিতে পাৱে, কিন্তু আবাৰ সে যে ফিরিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।”

এমন সময় মলিনবসনা আশা মাথার আধখানা ঘোমটা দিয়া ধীৱে ধীৱে তাহার মাসিমার পায়েৰ কাছে আসিয়া বসিল। সে জানিত রাজলক্ষ্মীৰ পীড়া সম্বন্ধে বিহারীৰ সঙ্গে অন্নপূর্ণার আলোচনা চলিতেছে, তাই ঔৎসুক্যেৰ সহিত শুনিতে আসিল। পতিৰোতা আশাৰ মুখে নিষ্ঠুৰ দুঃখেৰ নীৱৰ মহিমা দেখিয়া বিহারীৰ মনে এক অপূৰ্ব ভক্তিৰ সঞ্চার হইল। শোকেৰ তপ্ত তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া এই তৰণী রমণী প্রাচীন যুগেৰ দেবীদেৱ ন্যায় একটি অচৰ্পল মৰ্যাদা লাভ কৰিয়াছে— সে এখন আৱ সামান্যা নায়ী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুৱাণবৰ্ণিতা সাধ্বীদেৱ সমান বয়স প্ৰাপ্ত হইয়াছে।

বিহারী আশাৰ সহিত রাজলক্ষ্মীৰ পথ্য ও ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা কৰিয়া যখন আশাকে বিদায় কৰিল তখন একটি দীৰ্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, ‘মহেন্দ্রকে আমি উদ্ধার কৰিব।’

বিহারী মহেন্দ্রেৰ ব্যাকে গিয়া খবৰ পাইল যে, তাহাদেৱ এলাহাবাদ শাখাৰ সহিত মহেন্দ্র অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আৱস্থা কৰিয়াছে।

অধ্যায় - ৫০

স্টেশনে আসিয়া বিনোদিনী একেবারে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্র কহিল, “ও কী কর, আমি তোমার জন্য সেকেও ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।”

বিনোদিনী কহিল, ‘‘দরকার কী, এখানে আমি বেশ থাকিব।’’

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বাভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে দারিদ্রের কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না; নিজের সাংসারিক দৈন্য সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত। মহেন্দ্র এটুকু বুবিয়াছিল যে, মহেন্দ্রের ঘরের অজস্র সচ্ছলতা, বিলাস উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে অন্যায়েই এই ধনসম্পদ, এই- সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায় তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যখন মহেন্দ্রের উপর প্রভুত্বলাভ করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও সে যখন মহেন্দ্রের সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে আনিতে পারে, তখন কেন সে এমন অসহ্য উপেক্ষার সহিত একান্ত উদ্বিত্তাবে কষ্টকর লজ্জাকর দীনতা স্বীকার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উন্মত্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীকে তাহার স্বাভাবিক আশ্রয় হইতে চিরজীবনের জন্য চৃত্য করিয়াছে, সে মহেন্দ্রের হাত হইতে সে এমন কিছুই চাহে না, যাহা তাহার এই সর্বনাশের মূল্যস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। মহেন্দ্রের ঘরে যখন বিনোদিনী ছিল, তখন তাহার আচরণে বৈধব্যরতের কাঠিন্য বড়ো একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন পরে সে আপনাকে সর্বপ্রকার ভোগ হইতে বাধিত করিয়াছে। এখন সে একবেলা খায়, মোটা কাপড় পরে, তাহার সেই অনঙ্গ উৎসারিত হাস্যপরিহাসই বা গেল কোথায়। এখন সে এমন স্তুর, এমন আবৃত, এমন সুদূর, এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে যে, মহেন্দ্র তাহাকে সামান্য একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া, অধীর হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, ‘বিনোদিনী আমাকে এত চেষ্টায় দুর্লভ ফলের মতো এত উচ্চশাখা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে দ্রাঘিমাত্র না করিয়া আজ মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে কেন।’

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোথাকার টিকিট করিব বলো।’

বিনোদিনী কহিল, ‘‘পশ্চিম দিকে যেখানে খুশি চলো— কাল সকালে যেখানে গাড়ি থামিবে, নামিয়া পড়িব।’’

এমনতরো ভ্রমণ মহেন্দ্রের কাছে লোভনীয় নহে। আরামের ব্যাঘাত তাহার পক্ষে কষ্টকর। বড়ো শহরে গিয়া ভালোরূপ আশ্রয় না পাইলে মহেন্দ্রের বড়ো মুশকিল। সে খুঁজিয়া- পাতিয়া করিয়া- কর্মিয়া লইবার লোক নহে। তাই অত্যন্ত ক্ষুঁক- বিরক্ত মনে মহেন্দ্র গাড়িতে উঠিল। এ দিকে মনে কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বিনোদিনী তাহাকে না জানাইয়াই কোথাও নামিয়া পড়ে।

বিনোদিনী এইরূপ শনিগ্রহের মতো ঘুরিতে এবং মহেন্দ্রকে ঘুরাইতে লাগিল— কোথাও তাহাকে বিশ্রাম দিল না। বিনোদিনী অতি শীত্রাই লোককে আপন করিয়া লইতে পারে; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে গাড়ির সহ্যাত্বিণীদের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া লইত। যেখানে যাইবার ইচ্ছা, সেখানকার সমস্ত খবর লইত— যাত্রিশালায় আশ্রয় লইত এবং যেখানে যাহা- কিছু দেখিবার আছে, ঘুরিয়া- ঘুরিয়া বন্ধুসহায়ে দেখিয়া লইত। মহেন্দ্র বিনোদিনীর কাছে নিজের অনাবশ্যকতায় প্রতিদিন আপনাকে হতমান বোধ

করিতে লাগিল। টিকিট কিনিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার কোনো কাজ ছিল না, বাকি সময়টা তাহার প্রতিটি তাহাকে ও সে আপন প্রতিকে দংশন করিতে থাকিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে সঙ্গে পথে পথে ফিরিয়াছিল— কিন্তু ক্রমে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল; তখন মহেন্দ্র আহারাদি করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিত, বিনোদিনী সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতৃস্নেহলালিত মহেন্দ্র যে এমন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

একদিন এলাহাবাদ স্টেশনে দুই জনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোনো আকস্মিক কারণে ট্রেন আসিতে বিলম্ব হইতেছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য গাড়ি যত আসিতেছে ও যাইতেছে, বিনোদিনী তাহার যাত্রীদের ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। পশ্চিমে ঘুরিতে ঘুরিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ কাহারো দেখা পাইবে, এই বোধ করি তাহার আশা। অন্তত, রুদ্ধ গলির মধ্যে জনহীন গৃহে নিশ্চল উদ্যমে নিজেকে প্রত্যহ চাপিয়া মারার চেয়ে এই নিত্যসন্ধানপরতার মধ্যে, এই উম্মুক্ত পথের জনকোলাহলের মধ্যে শান্তি আছে।

হঠাৎ এক সময়ে স্টেশনে একটি কাচের বাক্সের উপর বিনোদিনীর দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। এই পোস্ট- আপিসের বাক্সের মধ্যে, যে- সকল লোকের উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই তাহাদের পত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেই বাক্সে সজিত একখানি পত্রের উপরে বিনোদিনী বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। বিহারীরলাল নামটি অসাধারণ নহে— পত্রের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না— তবু বিহারীর পুরানাম দেখিয়া সেই একটিমাত্র বিহারী ছাড়া আর- কোনো বিহারীর কথা তাহার মনে সন্দেহ হইল না। পত্রে লিখিত ঠিকানাটি সে মুখস্থ করিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে মহেন্দ্র একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিল, বিনোদিনী সেখানে আসিয়া কহিল, “কিছুদিন এলাহাবাদেই থাকিব।”

বিনোদিনী নিজের ইচ্ছামত মহেন্দ্রকে চালাইতেছে, অথচ তাহার ক্ষুধিত অত্তঙ্গ হৃদয়কে খোরাকমাত্র দিতেছে না, ইহাতে মহেন্দ্রের পৌরুষাভিমান আহত হইয়া তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। এলাহাবাদে কিছুদিন থাকিয়া জিরাইতে পাইলে সে বাঁচিয়া যায়— কিন্তু ইচ্ছার অনুকূল হইলেও বিনোদিনীর খেয়ালমাত্রে সন্তানি দিতে তাহার মন হঠাৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে রাগ করিয়া কহিল, “যখন বাহির হইয়াছি, তখন যাইবই। ফিরিতে পারিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “আমি যাইব না।”

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তুমি একলা থাকো, আমি চলিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “সেই ভালো।” বলিয়া দ্বিরঞ্চিতমাত্র না করিয়া ইঙ্গিতে মুটে ডাকিয়া স্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

মহেন্দ্র পুরুষের কর্তৃত্ব- অধিকার লইয়া অন্ধকার- মুখে বেঞ্চে বসিয়া রহিল। যতক্ষণ বিনোদিনীকে দেখা গেল, ততক্ষণ সে স্ত্রির হইয়া থাকিল। যখন বিনোদিনী একবারও পশ্চাতে না ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন সে তাড়াতাড়ি মুটের মাথায় বাক্স- বিছানা চাপাইয়া তাহার অনুসরণ করিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলে, বিনোদিনী একখানি গাড়ি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া গাড়ির মাথায় মাল চাপাইয়া কোচবাক্সে চাড়িয়া বসিল। নিজের অহংকার খর্ব করিয়া গাড়ির ভিতরে বিনোদিনীর সন্মুখে বসিতে তাহার আর মুখ রহিল না।

কিন্তু গাড়ি তো চলিয়াছেই। এক ঘণ্টা হইয়া গেল, ক্রমে শহরের বাড়ি ছাড়াইয়া চ্যামাঠে আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিতে মহেন্দ্রের লজ্জা করিতে লাগিল, কারণ, পাছে গাড়োয়ান মনে করে ভিতরকার স্ত্রীলোকটিই কর্তৃপক্ষ, কোথায় যাইতে হইবে তাও সে এই অনাবশ্যক পুরুষটার সঙ্গে পরামর্শও করে নাই। মহেন্দ্র ঝঞ্চ অভিমান মনে মনে পরিপাক করিয়া স্তুতিভাবে কোচবাঞ্চে বসিয়া রহিল।

গাড়ি নির্জনে যমুনার ধারে একটি স্বচ্ছরক্ষিত বাগানের মধ্যে আসিয়া থামিল। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কাহার বাগান, এ বাগানের ঠিকানা বিনোদিনী কেমন করিয়া জানিল।

বাড়ি বন্ধ ছিল। হাঁকাহাঁকি করিতে বৃন্দ রক্ষক বাহির হইয়া আসিল। সে কহিল, “বাড়িওয়ালা ধনী, অধিক দূরে থাকেন না— তাহার অনুমতি লইয়া আসিলেই এ বাড়িতে বাস করিতে দিতে পারি।”

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে একবার চাহিল। মহেন্দ্র এই মনোরম বাড়িটি দেখিয়া লুক্ষ হইয়াছিল— দীর্ঘকাল পরে কিছুদিন স্থিতির সন্তাননায় সে প্রফুল্ল হইল, বিনোদিনীকে কহিল, “তবে চলো সেই ধনীর ওখানে যাই, তুমি বাহিরে গাড়িতে অপেক্ষা করিবে, আমি ভিতরে গিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া আসিব।”

বিনোদিনী কহিল, ‘আমি আর ঘুরিতে পারিব না— তুমি যাও, আমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি। ভয়ের কোনো কারণ দেখি না।’

মহেন্দ্র গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী বুড়া ব্রাক্ষণকে ডাকিয়া তাহার ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞাসা করিল— তাহারা কে, কোথায় চাকরি করে, তাহার মেয়েদের কোথায় বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া করণস্বরে কহিল, ‘আহা, তোমার তো বড়ো কষ্ট। এই বয়সে তুমি সংসারে একলা পড়িয়া গেছ। তোমাকে দেখিবার কেহ নাই।’

তাহার পরে কথায় কথায় বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, ‘বিহারীবাবু এখানে ছিলেন না?’

বৃন্দ কহিল, ‘হঁ, কিছুদিন ছিলেন তো বটে। মাজি কি তাঁহাকে চেনেন।’

বিনোদিনী কহিল, ‘তিনি আমাদের আত্মীয় হন।’

বিনোদিনী বৃন্দের কাছে বিহারীর বিবরণ ও বর্ণনা যাহা পাইল, তাহাতে আর মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। বুড়াকে দিয়া ঘর খুলাইয়া কোন্ ঘরে বিহারী শুইত, কোন্ ঘর তাহার বসিবার ছিল, তাহা সমস্ত জানিয়া লইল। তাহার যাওয়ার পর হইতে ঘরগুলি যে বন্ধ ছিল, তাহাতে মনে হইল, যেন সেখানে অদৃশ্য বিহারীর সঞ্চার সমস্ত ঘর ভরিয়া জমা হইয়া আছে, হাওয়ায় যেন তাহা উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। বিনোদিনী তাহা আগের মধ্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিল, স্তুতি বাতাসে সর্বাঙ্গে স্পর্শ করিল; কিন্তু বিহারী যে কোথায় গেছে, সে সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো সে ফিরিতেও পারে— স্পষ্ট কিছুই জানা নাই। বৃন্দ তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিবে, বিনোদিনীকে একুশ আশ্বাস দিল।

আগাম ভাড়া দিয়া বাসের অনুমতি লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিল।

অধ্যায় - ৫১

হিমালয়শিখের যে যমুনাকে তুষারস্তুত অক্ষয় জলধারা দিতেছে, কতকালের কবিরা মিলিয়া সেই যমুনার মধ্যে যে কবিত্বস্ত্রোত ঢালিয়েছেন, তাহাও অক্ষয়। ইহার কলঘনির মধ্যে কত বিচ্ছি ছন্দ ধ্বনিত এবং ইহার তরঙ্গলীলায় কতকালের পুলকোচ্ছসিত ভাবাবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রদোষে সেই যমুনাতীরে মহেন্দ্র আসিয়া যখন বসিল, তখন ঘনীভূত প্রেমের আবেশ তাহার দৃষ্টিতে, তাহার নিশাসে, তাহার শিরায়, তাহার অঙ্গগুলির মধ্যে প্রগাঢ় মোহরসপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিল। আকাশে সূর্যাস্তকরণের স্বর্ণবীণা বেদনার মুর্ছনায় অলোকশৃত সংগীতে ঝংকৃত হইয়া উঠিল।

বিস্তীর্ণ নির্জন বালুতটে বিচ্ছি বর্ণচূটায় দিন ধীরে ধীরে অবসান হইয়া গেল। মহেন্দ্র চক্ষু অর্ধেক মুদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখুর- ধূলিজালের মধ্যে বৃন্দাবনের ধেনুদের গোঠে প্রত্যাবর্তনের হাস্যারব শুনিতে পাইল।

বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অপরিচিত স্থানের অন্ধকার কেবল কৃষ্ণবর্ণের আবরণ মাত্র নহে, তাহা বিচ্ছি রহস্যে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া যেটুকু আভা যেটুকু আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অজ্ঞাত অনুচ্ছারিত ভাষায় কথা কহে। পরপারবর্তী বালুকার অস্ফুট পাণ্ডুরতা, নিষ্ঠরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ণ কালিমা, বাগানে ঘনপল্লব বিপুল নিষ্প্রক্ষেপ পুঁজীভূত স্তুতা, তরংহীন ম্লান ধূসর তটের বক্ষিম রেখা, সমস্ত সেই আষাঢ়- সন্ধ্যার অন্ধকারে বিবিধ অনিদিষ্ট অপরিস্ফুট আকারে মিলিত হইয়া মহেন্দ্রকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

পদাবলীর বর্ষাভিসার মহেন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যমুনার ঐ তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার হইবে কেমন করিয়া। ‘ওগো পার করো গো, পার করো’— মহেন্দ্রের বুকের মধ্যে এই ডাক আসিয়া পৌছিতেছে—‘ওগো, পার করো।’

নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিগী বহুদূরে— তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা— কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল— সে এই বিনোদিনী! সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভার লইয়া তখনকার কাল হইতে সে অভিসারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখনকার কালের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে— আজিকার এই জনহীন যমুনাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কর্তৃস্বর শুনা যাইতেছে—‘ওগো, পার করো গো’— খেয়া- নৌকার জন্য সে এই অন্ধকারে আর কতকাল এমন একলা দাঁড়াইয়া থাকিবে—‘ওগো, পার করো।’

মেঘের এক প্রান্ত অপসারিত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে সেই নদী ও নদীতীর, সেই আকাশ ও আকাশের সীমাত্ত, পৃথিবীর অনেক বাহিরে ঢালিয়া গেল। মর্তের কোনো বন্ধন রহিল না। কালের সমস্ত ধরাবাহিকতা ছিঁড়িয়া গেল— অতীতকালের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত, ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত ফলাফল অন্তর্হিত— শুধু এই রঞ্জতধারা- প্লাবিত বর্তমানটুকু যমুনা ও যমুনাতটের মধ্যে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীকে লইয়া বিশ্ববিধানের বাহিরে চিরস্থায়ী।

মহেন্দ্র মাতাল হইয়া উঠিল। বিনোদিনী যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, জ্যোৎস্নারাত্রির এই নির্জন স্বর্গখণ্ডকে লক্ষ্মীরূপে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে না, ইহা সে কল্পনা করিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সে বিনোদিনীকে খুঁজিতে বাড়ির দিকে ঢালিয়া গেল।

শয়নগৃহে আসিয়া দেখিল, ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানালা- দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া খোপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে, কটিতে বাঁধিয়াছে— ফুলে ভূষিত হইয়া সে বসন্তকালের পুষ্পভারলুষ্টিত লতাটির ন্যায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।

মহেন্দ্রের মোহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে অবরুদ্ধকঢে বলিয়া উঠিল, “বিনোদ, আমি যমুনার ধারে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলাম, তুমি যে এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ, আকাশের চাঁদ আমাকে সেই সংবাদ দিল, তাই আমি চলিয়া আসিলাম।”

এই কথা বলিয়া মহেন্দ্র বিছানায় বসিবার জন্য অগ্রসর হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চকিত হইয়া উঠিয়া দক্ষিণবাহু প্রসারিত করিয়া কহিল, “যাও যাও, তুমি এ বিছানায় বসিয়ো না।”

ভরাপালের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল— মহেন্দ্র স্তুতি হইয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পাছে মহেন্দ্র নিষেধ না মানে, এইজন্য বিনোদিনী শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তুমি কাহার জন্য সাজিয়াছ। কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ।”

বিনোদিনী আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “যাহার জন্য সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে কে। সে বিহারী?”

বিনোদিনী কহিল, “তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।”

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহার ঠিকানা জানিয়াছ?

বিনোদিনী। জানি না, কিন্তু যেমন করিয়া হউক, জানিবই।

মহেন্দ্র। কোনোমতেই জানিতে দিব না।

বিনোদিনী। না যদি জানিতে দাও, আমার হৃদয় হইতে তাহাকে কোনোমতেই বাহির করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিহারীকে একবার অনুভব করিয়া লইল। মহেন্দ্র সেই পুষ্পাভরণ বিরহবিধুরমূর্তি বিনোদিনীর দ্বারা একই কালে প্রবলবেগে আকৃষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া হঠাতে ভীষণ হইয়া উঠিল— মুষ্টি বন্ধ করিয়া কহিল, ‘ছুরি দিয়া কাটিয়া তোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।’

বিনোদিনী অবিচলিতমুখে কহিল, ‘তোমার ভালোবাসার চেয়ে তোমার ছুরি আমার হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করিবে।’

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।

বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছ। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে।

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না।

মহেন্দ্র। কেন মরিলে না— ঐটুকু বিশ্বাসের ফাঁসি আমার গলায় জড়াইয়া আমাকে দেশদেশান্তরে টানিয়া মারিতেছে কেন। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখো।

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। যতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না— আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়ো না, তুমি বিহারীরও হইয়ো না। তুমি যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে— তাহাদের অশ্রু আমাকে দূর হইতে দন্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে, তুমি আমার এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনী একলা পড়িয়া আপনার চারি দিকে যে মোহজাল রচনা করিতেছিল, তাহা সমস্ত ছিঁড়িয়া দিয়া গেল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদিনী বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল— আকাশভরা জ্যোৎস্না শূন্য করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত সুধারস কোথায় উবিয়া গেছে। সেই কেয়ারি- করা বাগান, তাহার পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো জল, তাহার পরে ওপারের অস্ফুটতা— সমস্তই যেন একখানা বড়ো সাদা কাগজের উপরে পেনসিলে- আঁকা একটি চিত্র মাত্র— সমস্তই নীরস এবং নির্থক।

মহেন্দ্রকে বিনোদিনী কিরণ প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো কিরণ সমস্ত শিকড়- তাহাকে উৎপাটিত করিয়াছে, আজ তাহা অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় আরো যেন অশাস্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো এই সমস্ত শক্তি রহিয়াছে, তবে কেন বিহারী পূর্ণিমার রাত্রির উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহার সন্মুখে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে না। কেন একটা অনাবশ্যক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রত্যহ তাহার ধ্যানের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আর- একটা আগন্তুক রোদন বারংবার আসিয়া তাহার অন্তরের রোদনকে কেন পরিপূর্ণ অবকাশ দিতেছে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে, এখন ইহাকে শান্ত করিবে কী উপায়ে।

আজ যে-সমস্ত ফুলের মালায় সে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিল, তাহার উপরে মহেন্দ্রের মুঝ দৃষ্টি পড়িয়াছিল জানিয়া সমস্ত টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত শক্তি বৃথা, চেষ্টা বৃথা, জীবন বৃথা— এই কানন, এই জ্যোৎস্না, এই যমুনাতট, এই অপূর্বসুন্দর প্রথিবী, সমস্তই বৃথা।

এত ব্যর্থতা, তবু যে যেখানে সে সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে— জগতে কিছুরই লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তবু কাল সূর্য উঠিবে এবং সংসার তাহার ক্ষুদ্রতম কাজটুকু পর্যন্ত ভুলিবে না— এবং অবিচলিত বিহারী যেমন দূরে ছিল, তেমনি দূরে থাকিয়া ব্রাহ্মণ বালককে তাহার বোধোদয়ের নৃতন পাঠ অভ্যাস করাইবে।

বিনোদিনীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। সে তাহার সমস্ত বল ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন পাথরকে ঠেলিতেছে। তাহার হৃদয় রক্তে ভাসিয়া গেল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট সুচ্যুপরিমাণ সরিয়া বসিল না।

অধ্যায় - ৫২

সমস্ত রাত্রি মহেন্দ্র ঘুমায় নাই— ক্লান্তশরীরে ভোরের দিকে তাহার ঘুম আসিল। বেলা আটটা- নয়টার সময় জাগিয়া তাড়াতড়ি উঠিয়া বসিল। গতরাত্রির একটা কোনো অসমাপ্ত বেদনা ঘুমের ভিতরে ভিতরে যেন প্রবাহিত হইতেছিল। সচেতন হইবামাত্র মহেন্দ্র তাহার ব্যথা অনুভব করিতে আরস্ত করিল। কিছুক্ষণ পরেই রাত্রির সমস্ত ঘটানাটা মনে স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। সকালবেলাকার সেই রৌদ্রে, অত্থপ্ত নির্দার ক্লান্তিতে সমস্ত জগৎটা এবং জীবনটা অত্যন্ত বিরস বোধ হইল। সংসারত্যাগের প্লানি, ধর্মত্যাগের গভীর পরিতাপ এবং এই উদ্ভ্রান্ত জীবনের সমস্ত অশান্তিভাব মহেন্দ্র কিসের জন্য বহন করিতেছে। এই মহাবেশশূন্য প্রভাতরৌদ্রে মহেন্দ্রের মনে হইল, সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না। রাস্তার দিকে সে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত জাগ্রত পৃথিবী ব্যস্ত হইয়া কাজে ছুটিয়াছে। সমস্ত আত্মগৌরব পক্ষের মধ্যে বিসর্জন দিয়া একটি বিমুখ স্ত্রীলোকের পদপ্রাপ্তে অকর্মণ্য জীবনকে প্রতিদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে মৃচ্ছা, তাহা মহেন্দ্রের কাছে সুস্পষ্ট হইল। একটা প্রবল আবেগের উচ্ছাসের পর হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হয়— ক্লান্ত হৃদয় তখন আপন অনুভূতির বিষয়কে কিছুকালের জন্য দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সেই ভাবের ভাঁটার সময় তলের সমস্ত প্রচলন পক্ষ বাহির হইয়া পড়ে— যাহা মোহ আনিয়াছিল তাহাতে বিত্ক্ষণ জন্মে। মহেন্দ্র যে কিসের জন্য নিজেকে এমন করিয়া অপমানিত করিতেছে, তাহা সে আজ বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, ‘আমি সর্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি সর্বপ্রকার হীনতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ঘৃণিত ভিক্ষুকের মতো তাহার পশ্চাতে অঙ্গের ছুটিয়া বেড়াইতেছি, এমনতরো অঙ্গে পাগলামি কোন্ শয়তান আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।’ বিনোদিনী মহেন্দ্রের কাছে আজ একটি স্ত্রীলোকমাত্র, আর কিছুই নহে— তাহার চারি দিকে সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য হইতে, সমস্ত কাব্য হইতে, কাহিনী হইতে, যে একটি লাবণ্যজ্যেষ্ঠাতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আজ মায়ামৰীচিকার মতো অন্তর্ধান করিতেই একটি সামান্য নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল— তাহার কোনো অপূর্বত্ব রহিল না।

তখন এই ধিক্কৃত মোহচক্র হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য মহেন্দ্র ব্যগ্র হইল। যে শান্তি প্রেম এবং ম্লেচ্ছ তাহার ছিল, তাহাই তাহার কাছে দুর্লভতম অমৃত বলিয়া বোধ হইল। বিহারীর আশেশব অটলনির্ভর বন্ধুত্ব তাহার কাছে মহামূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, ‘যাহা যথার্থ গভীর এবং স্থায়ী, তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহার গৌরব আমরা বুঝিতে পারি না— যাহা চতুর্ভুল ছলনামাত্র, যাহার পরিত্বিতেও লেশমাত্র সুখ নাই, তাহা আমাদিগকে পশ্চাতে উর্ধ্বশাসে ঘোড়দৌড় করাইয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাকে চরম কামনার ধন মনে করি।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আজই বাড়ি ফিরিয়া যাইব— বিনোদিনী যেখানেই থাকিতে চাহে, সেইখানেই তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি মুক্ত হইব।’ ‘আমি মুক্ত হইব’ এই কথা দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিতেই তাহার মনে একটি আনন্দের আবির্ভাব হইল— এতদিন যে অবিশ্রাম দ্বিধার ভার সে বহন করিয়া আসিতেছিল, তাহা হালকা হইয়া আসিল। এতদিন, এই মুহূর্তে যাহা তাহার পরম অগ্রীতিকর ঠেকিতেছিল, পরমুত্তোর্তেই তাহা পালন করিতে বাধ্য হইতেছিল— জোর করিয়া ‘না’ কি “হঁ” সে বলিতে পারিতেছিল না; তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে যে আদেশ উগ্রিত হইতেছিল বরাবর জোর করিয়া তাহার মুখ চাপা দিয়া সে অন্যপথে চলিতেছিল— এখন সে যেমনি সবেগে বলিল, ‘আমি মুক্তিলাভ করিব’, অমনি তাহার দোলা- পীড়িত হৃদয় আশ্রয় পাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

মহেন্দ্র তখনই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ। দ্বারে আঘাত দিয়া কহিল, ‘ঘুমাইতেছ কি।’

বিনোদিনী কহিল, “না। তুমি এখন যাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে— আমি বেশিক্ষণ থাকিব না।”

বিনোদিনী কহিল, ‘কথা আর আমি শুনিতে পারি না— তুমি এখন যাও, আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমাকে একলা থাকিতে দাও।’

অন্য কোনো সময় হইলে এই প্রত্যাখানে মহেন্দ্রের আবেগ আরো বাড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। সে ভাবিল, ‘এই সামান্য এক স্ত্রীলোকের কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে যখন- তখন এমনতরো অবজ্ঞাভরে দূর করিয়া দিবার অধিকার ইহার জন্মিয়াছে। সে অধিকার ইহার স্বাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাহা ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব এমন অন্যায়রূপে বাঢ়াইয়া দিয়াছি।’ এই লাঞ্ছনার পরে মহেন্দ্র নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। সে কহিল, ‘আমি জয়ী হইব— ইহার বন্ধন আমি ছেদন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।’

আহারাত্তে মহেন্দ্র টাকা উঠাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকে চলিয়া গেল। টাকা উঠাইয়া আশার জন্য ও মার জন্য কিছু ভালো নতুন জিনিস কিনিবে বলিয়া সে এলাবাহাদের দোকানে ঘুরিতে লাগিল।

আবার একবার বিনোদিনীর দ্বারে আঘাত পড়িল। প্রথমে সে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর করিল না— তাহার পরে আবার বার বার আঘাত করিতেই বিনোদিনী জ্বলন্ত রোষে সবলে দ্বার খুলিয়া কহিল, ‘কেন তুমি আমাকে বার বার বিরক্ত করিতে আসিতেছ।’ কথা শেষ না হইতেই বিনোদিনী দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মহেন্দ্র আছে কি না, দেখিবার জন্য বিহারী একবার ভিতরে ঢাহিয়া দেখিল। দেখিল, শয়নঘরে শুক্ষ ফুল এবং ছিঁড় মালা ছড়ানো। তাহার মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিমুখ হইয়া গেল। বিহারী যখন দূরে ছিল, তখন বিনোদিনীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহজনক চিত্র যে তাহার মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু কল্পনার লীলা সে চিরকে ঢাকিয়াও একটি উজ্জ্বল মোহিনীচ্ছবি দাঁড় করাইয়াছিল। বিহারী যখন বাগানে প্রবেশ করিতেছিল তখন তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল— পাছে কল্পনাপ্রতিমায় অকস্মাত আঘাত লাগে, এইজন্য তাহার চিত্ত সংকুচিত হইতেছিল। বিহারী বিনোদিনীর শয়নগৃহের দ্বারে সমুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই আঘাতটাই লাগিল।

দূরে থাকিয়া বিহারী একসময় মনে করিয়াছিল, সে আপনার প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত পক্ষিলতা অন্যায়সে ধৌত করিয়া লইতে পারিবে। কাছে আসিয়া দেখিল, তাহা সহজ নহে— মনের মধ্যে করণার বেদনা আসিল কই। হঠাৎ ঘৃণার তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। বিনোদিনীকে বিহারী অত্যন্ত মালিন দেখিল।

এক মুহূর্তেই বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া “মহেন্দ্র” “মহেন্দ্র” করিয়া ডাকিল।

এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী নম্রমুস্তরে কহিল, “মহেন্দ্র নাই, মহেন্দ্র শহরে গেছে।”

বিহারী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বিনোদিনী কহিল, ‘বিহারী- ঠাকুরপো, তোমার পায়ে ধরি, একটুখানি তোমাকে বসিতে হইবে।’

বিহারী কোনো মিনতি শুনিবে না মনে করিয়াছিল, একেবারে এই ঘৃণার দৃশ্য হইতে এখনই নিজেকে দূরে লইয়া যাইবে স্ত্রি করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর করণ অনুয়স্তর শুনিবামাত্র ক্ষণকালের জন্য তাহার পা যেন আর উঠিল না।

বিনোদিনী কহিল, “আজ যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমারই শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মরিব।”

বিহারী তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ‘‘বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। আমি তোমার কী করিয়াছি। আমি তো কখনো তোমার পথে দাঁড়াই নাই, তোমার সুখদুঃখে হস্তক্ষেপ করি নাই।’’ বিনোদিনী কহিল, ‘‘তুমি আমার কতখানি অধিকার করিয়াছ, তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি— তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আজ আবার তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। তুমি তো আমাকে না বলিয়া জানাইবার, লজ্জা করিয়া জানাইবার, সময় দাও নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, তবু আমি তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে— ’’

বিহারী বাধা দিয়া কহিল, ‘‘সে কথা আর বলিয়ো না, মুখে আনিয়ো না। সে কথা বিশ্বাস করিবার জো নাই।’’

বিনোদিনী। সে কথা ইতর লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তুমি করিবে। সেইজন্য একবার আমি তোমাকে বসিতে বলিতেছি।

বিহারী। আমি বিশ্বাস করি বা না করি, তাহাতে কী আসে যায়। তোমার জীবন যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে তো।

বিনোদিনী। আমি জানি তোমার ইহাতে কিছুই আসিবে- যাইবে না। আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মানরক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোনো উপায় নাই। চিরকাল তোমা হইতে আমাকে দূরেই থাকিতে হইবে। আমার মন তোমার কাছে এই দাবিটুকু কেবল ছাড়িতে পারে না যে, আমি যেখানে থাকি আমাকে তুমি একটুকু মাধুর্যের সঙ্গে ভাবিবে। আমি জানি, আমার উপরে তোমার অল্প একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সেইটুকু আমার একমাত্র সম্বল করিয়া রাখিব। সেইজন্য আমার সব কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। আমি হাতজোড় করিয়া বলিতেছি ঠাকুরপো, একটুখানি বসো।

“আচ্ছা চলো” বলিয়া বিহারী এখান হইতে অন্যত্র কোথাও যাইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল, ‘‘ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ ঘরে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে এক দিন শয়ন করিয়াছিলে— এ ঘর তোমার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি— ঐ ফুলগুলো তোমারই পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া পড়িয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বসিতে হইবে।’’

শুনিয়া বিহারীর চিন্তে পুলকের সঞ্চার হইল। ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী দুই হাত দিয়া তাহাকে খাট দেখাইয়া দিল। বিহারী খাটে গিয়া বসিল— বিনোদিনী ভূমিতলে তাহার পায়ের কাছে উপবেশন করিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই বিনোদিনী কহিল, ‘ঠাকুরপো, তুমি বসো। আমার মাথা

খাও, উঠিয়ো না। আমি তোমার পায়ের কাছে বসিবারও যোগ্য নই, তুমি দয়া করিয়াই সেখানে স্থান দিয়াছ। দূরে থাকিলেও এই অধিকারটুকু আমি রাখিব।”

এই বলিয়া বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “তোমার খাওয়া হইয়াছে, ঠাকুরপো?”

বিহারী কহিল, ‘স্টেশন হইতে খাইয়া আসিয়াছি।”

বিনোদিনী। আমি গ্রাম হইতে তোমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম, তাহা খুলিয়া কোনো জবাব না দিয়া মহেন্দ্রের হাত দিয়া আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে কেন।

বিহারী। সে চিঠি তো আমি পাই নাই।

বিনোদিনী। এবারে মহেন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় কি তোমার দেখা হইয়াছিল।

বিহারী। তোমাকে গ্রামে পৌছাইয়া দিবার পরদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহার পরেই আমি পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।

বিনোদিনী। তাহার পূর্বে আর- এক দিন আমার চিঠি পড়িয়া উভর না দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলে?

বিহারী। না, এমন কথনোই হয় নাই।

বিনোদিনী স্তন্ত্রিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া কহিল, ‘সমস্ত বুঝিলাম। এখন আমার সব কথা তোমাকে বলি। যদি বিশ্বাস কর তো ভাগ্য মানিব, যদি না কর তো তোমাকে দোষ দিব না, আমাকে বিশ্বাস করা কঠিন।’

বিহারীর হৃদয় তখন আর্দ্ধ হইয়া গেছে। এই ভক্তিভারনন্দা বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনোমতেই অপমান করিতে পারিল না। সে কহিল, ‘বৌঠান, তোমাকে কোনো কথাই বলিতে হইবে না, কিছু না শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমি তোমায় ঘৃণা করিতে পারি না। তুমি আর একটি কথাও বলিয়ো না।’

শুনিয়া বিনোদিনীর ছোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বিহারীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, ‘সব কথা না বলিলে আমি বাঁচিব না। একটু ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে হইবে— তুমি আমাকে যে- আদেশ করিয়াছিলে, তাহাই আমি শিরোধার্য করিয়া লইলাম। যদিও তুমি আমাকে পত্রটুকুও লেখ নাই, তবু আমি আমার সেই গ্রামে লোকের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম, তোমার স্নেহের পরিবর্তে তোমার শাসনই আমি গ্রহণ করিতাম— কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বিমুখ হইলেন। আমি যে- পাপ জাগাইয়া তুলিয়াছি, তাহা আমাকে নির্বাসনেও টিকিতে দিল না। মহেন্দ্র গ্রামে আসিয়া, আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া, আমাকে সকলের সম্মুখে লাঙ্ঘিত করিল। সে- গ্রামে আর আমার স্থান হইল না। দ্বিতীয় বার তোমার আদেশের জন্য তোমাকে অনেক খুঁজিলাম, কোনোমতেই তোমাকে পাইলাম না, মহেন্দ্র আমার খোলা চিঠি তোমার ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রতারণা করিল। বুঝিলাম, তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ। ইহার পরে আমি একেবারেই নষ্ট হইতে পারিতাম— কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দূরে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার— তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি— একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন

সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে; দেব, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে মূল্য নষ্ট হয় নাই।”

বিহারী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর কোনো কথা কহিল না। অপরাহ্নের আলোক প্রতিক্ষণে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মহেন্দ্র ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বিহারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে একটা ঔদাসীন্য জন্মিতেছিল, ঈর্ষার তাড়নায় তাহা দূর হইবার উপক্রম হইল। বিনোদিনী বিহারীর পায়ের কাছে স্তুর হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্বে আঘাত লাগিল। বিনোদিনীর সহিত বিহারীর চিঠিপত্র দ্বারা এই মিলন ঘটিয়াছে, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এতদিন বিহারী বিমুখ হইয়াছিল, এখন সে যদি নিজে আসিয়া ধরা দেয়, তবে বিনোদিনীকে ঠেকাইবে কে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আর- কাহারও হাতে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহা আজ বিহারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল।

ব্যর্থরোষে তীব্র বিদ্রূপের স্বরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কহিল, “এখন তবে রঙভূমিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান, বিহারীর প্রবেশ ! দৃশ্যটি সুন্দর- হাততালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আশা করি, এই শেষ অঙ্ক, ইহার পরে আর কিছুই ভালো লাগিবে না।”

বিনোদিনীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের আশ্রয় লইতে যখন তাহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তখন এ অপমানের উত্তর তাহার আর কিছুই নাই- ব্যাকুল- দৃষ্টিতে সে কেবল একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিল।

বিহারী খাট হইতে উঠিল- অগ্রসর হইয়া কহিল, ‘‘মহেন্দ্র তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মতো অপমান করিয়ো না- তোমার ভদ্রতা যদি তোমাকে নিষেধ না করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।’’

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, ‘‘ইহারই মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত হইয়া গেছে? আজ তোমার নৃতন নামকরণ করাযাক- বিনোদ- বিহারী।’’

বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, ‘‘মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংযতভাবে কথা কও।’’

শুনিয়া মহেন্দ্র বিস্ময়ে নিষ্কুল হইয়া গেল, এবং বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল- বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

বিহারী কহিল, ‘‘তোমাকে আর- একটি খবর দিবার আছে- তোমার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তাঁহার বাঁচিবার কোনো আশা নাই। আমি আজ রাত্রের গাড়িতেই যাইব। বিনোদিনীও আমার সঙ্গে ফিরিবে।’’

বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল, কহিল, ‘‘পিসিমার অসুখ?’’

বিহারী কহিল, ‘‘সারিবার অসুখ নহে। কখন কী হয়, বলা যায় না।’’

মহেন্দ্র তখন আর- কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী তখন বিহারীকে বলিল, ‘যে কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল ! এ কি ঠাট্টা।’

বিহারী কহিল, ‘না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।’

বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য?

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শুন্দা করি বলিয়া।

বিনোদিনী। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সহ্য করিবেন না।

বিহারী। কেন করিবেন না।

বিনোদিনী। ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। ছি ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।

বিহারী। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে?

বিনোদিনী। ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি গোপনে অনেকের অনেক ভালো কর— তোমার একটা- কোনো ব্রতের একটা- কিছু ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়ো, তাহাই বহন করিয়া আমি নিজেকে তোমার সেবিকা বলিয়া গণ্য করিব। কিন্তু ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে ! তোমার ওদার্যে সব সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।

বিহারী। কিন্তু বিনোদিনী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বিনোদিনী। সেই ভালোবাসার অধিকারে আমি আজ একটিমাত্র স্পর্ধা প্রকাশ করিব। বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করিল। পায়ের কাছে বসিয়া কহিল, “পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব— এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি— এ আশ্রয় আমি ভূমিসাং করিব না।”

বিহারী গম্ভীরমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিনোদিনী হাত জোড় করিয়া কহিল, ‘ভুল করিয়ো না— আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে— আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো— আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।’

অধ্যায় - ৫৩

মহেন্দ্র তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তখন আশা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল,
“ এখন ও- ঘরে যাইয়ো না।”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেন।’

আশা কহিল, “ডাক্তার বলিয়াছেন হঠাত মার মনে, সুখের হটক, দুঃখের হটক একটা কোনো আঘাত লাগিলে বিপদ হইতে পারে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমি একবার আস্তে আস্তে তাহার মাথার শিয়রের কাছে গিয়া দেখিয়া আসি গে— তিনি টের পাইবেন না।”

আশা কহিল, ‘তিনি অতি অল্প শব্দেই চমকিয়া উঠিতেছেন, তুমি ঘরে ঢুকিলেই তিনি টের পাইবেন।’

মহেন্দ্র। তবে, এখন তুমি কী করিতে চাও।

আশা। আগে বিহারী- ঠাকুরপো আসিয়া একবার দেখিয়া যান— তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই করিব।

বলিতে বলিতে বিহারী আসিয়া পড়িল। আশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল।

বিহারী। বৌঠান, ডাকিয়াচ ? মা ভালো আছেন তো?

আশা বিহারীকে দেখিয়া যেন নির্ভর পাইল। কহিল, ‘তুমি যাওয়ার পর হইতে মা যেন আরো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম দিন তোমাকে না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বিহারী কোথায় গেল।’ আমি বলিলাম, ‘তিনি বিশেষ কাজে গেছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে।’ তাহার পর হইতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। মুখে কিছুই বলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কাল তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া জানাইলাম, আজ তুমি আসিবে। শুনিয়া তিনি আজ তোমার জন্য বিশেষ করিয়া খাবার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন। তুমি যাহা যাহা ভালোবাস, সমস্ত আনিতে দিয়াছেন, সমুখের বারান্দায় রাঁধিবার আয়োজন করাইয়াছেন, তিনি ঘর হইতে দেখাইয়া দিবেন। ডাক্তারের নিষেধ কিছুতেই শুনিলেন না। আমাকে এই খানিকক্ষণ হইল ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ‘বউমা, তুমি নিজের হাতে সমস্ত রাঁধিবে, আমি আজ সামনে বসাইয়া বিহারীকে খাওয়াইব’।’

শুনিয়া বিহারীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, ‘মা আছেন কেমন।’

আশা কহিল, ‘তুমি একবার নিজে দেখিবে এসো— আমার তো বোধ হয়, ব্যামো আরো বাড়িয়াছে।’

তখন বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। আশা বাড়ির কর্তৃত্ব অন্যায়সে গ্রহণ করিয়াছে— সে মহেন্দ্রকে কেমন সহজে ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিল। না করিল সংকোচ, না করিল অভিমান। মহেন্দ্রের বল আজ কতখানি কমিয়া গেছে। সে অপরাধী, সে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল— মার ঘরেও ঢুকিতে পারিল না।

তাহার পরে ইহাও আশ্চর্য— বিহারীর সঙ্গে আশা কেমন অকুণ্ঠিতভাবে কথাবার্তা কহিল। সমস্ত পরামর্শ তাহারই সঙ্গে। সেই আজ সংসারের একমাত্র রক্ষক, সকলের সুহৃৎ। তাহার গতিবিধি সর্বত্র, তাহার উপদেশেই সমস্ত চলিতেছে। মহেন্দ্র কিছুদিনের জন্য যে- জায়গাটি ছাড়িয়া চলিয়া গেছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে- জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই।

বিহারী ঘরে তুকিতেই রাজলক্ষ্মী তাহার করণ চক্ষু তাহার মুখের দিকে রাখিয়া কহিলেন, “বিহারী, ফিরিয়াছিস?”

বিহারী কহিল, ‘হাঁ, মা, ফিরিয়া আসিলাম।’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘তোর কাজ শেষ হইয়া গেছে?’ বলিয়া তাহার মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।

বিহারী প্রফুল্লমুখে “হাঁ মা, কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে, এখন আমার আর- কোনো ভাবনা নাই” বলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল।

রাজলক্ষ্মী। আজ বউমা তোমার জন্য নিজের হাতে রাঁধিবেন, আমি এখান হইতে দেখাইয়া দিব। ডাঙ্কার বারণ করে— কিন্তু আর বারণ কিসের জন্য, বাঢ়া। আমি কি একবার তোদের খাওয়া দেখিয়া যাইব না।

বিহারী কহিল, ‘ডাঙ্কারের বারণ করিবার তো কোনো হেতু দেখি না, মা— তুমি না দেখাইয়া দিলে চলিবে কেন। ছেলেবেলা হইতে তোমার হাতের রান্নাই আমরা ভালোবাসিতে শিখিয়াছি— মহিনদার তো পশ্চিমের ডালরঞ্জি খাইয়া অরঞ্জি ধরিয়া গেছে— আজ সে তোমার মাছের ঝোল পাইলে বাঁচিয়া যাইবে। আজ আমরা দুই ভাই ছেলেবেলাকার মতো রেঘারেষি করিয়া খাইব, তোমার বউমা অঙ্গে কুলাইতে পারিলে হয়।’

যদিচ রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিলেন, বিহারী মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তবু তাহার নাম শুনিতেই তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া নিশাস ক্ষণকালের জন্য কঠিন হইয়া উঠিল।

সে- ভাবটা কাটিয়া গেলে বিহারী কহিল, “পশ্চিমে গিয়া মহিনদার শরীর অনেকটা ভালো হইয়াছে। আজ পথের অনিয়মে সে একটু ম্লান আছে, স্নানাহার করিলেই শুধরাইয়া উঠিবে।”

রাজলক্ষ্মী তবু মহেন্দ্রের কথা কিছু বলিলেন না। তখন বিহারী কহিল, “মা, মহিনদা বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে, তুমি না ডাকিলে সে তো আসিতে পারিতেছে না।”

রাজলক্ষ্মী কিছু না বলিয়াই দরজার দিকে চাহিলেন। চাহিতেই বিহারী ডাকিল, ‘মহিনদা, এসো।’

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। পাছে হৃতপিণ্ড হঠাৎ স্তুক্র হইয়া যায়, এই ভয়ে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তখনই চাহিতে পারিলেন না। চক্ষু অর্ধনিমীলিত করিলেন। মহেন্দ্র বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল। মহেন্দ্র মাতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পা ধরিয়া পড়িয়া রহিল। বক্ষের স্পন্দনে রাজলক্ষ্মীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অম্বপূর্ণা ধীরে ধীরে কহিলেন, ‘দিদি, মহিনকে তুমি উঠিতে বলো, নহিলে ও উঠিবে না।’

রাজলক্ষ্মী কষ্টে বাক্যস্ফুরণ করিয়া কহিলেন, “মহিন ওঠ।”

মহিনের নাম উচ্চারণমাত্র অনেক দিন পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু পড়িয়া তাহার হন্দয়ের বেদনা লম্বু হইয়া আসিল। তখন মহেন্দ্র উঠিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া খাটের উপর বুক দিয়া তাহার মার পাশে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী কষ্টে পাশ ফিরিয়া দুই হাতে মহেন্দ্রের মাথা লইয়া তাহার মস্তক আস্ত্রাণ করিলেন, তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

মহেন্দ্র রংধুকষ্টে কহিল, “মা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে মাপ করো।”

বক্ষ শান্ত হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ও কথা বলিস নে মহিন, আমি তোকে মাপ না করিয়া কি বাঁচি। বউমা, বউমা কোথায় গেল।”

আশা পাশের ঘরে পথ্য তৈরি করিতেছিল— অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন।

তখন রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ভূতল হইতে উঠিয়া তাহার খাটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহেন্দ্র খাটে বসিলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের পার্শ্বে স্থান- নির্দেশ করিয়া আশাকে কহিলেন, “বউমা, এইখানে তুমি বসো— আজ আমি একবার তোমাদের দুজনকে একত্রে বসাইয়া দেখিব, তাহা হইলে আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে। বউমা, আমার কাছে আর লজ্জা করিয়ো না— আর মহিনের পরেও মনের মধ্যে কোনো অভিমান না রাখিয়া একবার এইখানে বসো— আমার চোখ জুড়াও মা।”

তখন ঘোমটা- মাথায় আশা লজ্জায় ধীরে ধীরে আসিয়া কম্পিতবক্ষে মহেন্দ্রের পাশে গিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী স্বহস্তে আশার ডান হাত তুলিয়া লইয়া মহেন্দ্রের ডান হাতে রাখিয়া চাপিয়া ধরিলেন— কহিলেন, “আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গেলাম, মহিন— আমার এই কথাটি মনে রাখিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবি নে। মেজোবড়, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো— তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।”

অন্নপূর্ণা সমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে চোখের জলে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের মস্তকচুম্বন করিয়া কহিলেন, “ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।”

রাজলক্ষ্মী। বিহারী, এসো বাবা, মহিনকে তুমি একবার ক্ষমা করো।

বিহারী তখনই মহেন্দ্রের সমুখে আসিয়া দাঁড়াতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ়বাহু দ্বারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া কোলাকুলি করিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “মহিন, আমি তোকে এই আশীর্বাদ করি— শিশুকাল হইতে বিহারী তোর যেমন বন্ধু ছিল, চিরকাল তেমনি বন্ধু থাক— ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর- কিছু হইতে পারে না।”

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিষ্ঠক হইলেন। বিহারী একটা উত্তেজক গুষ্ঠ তাহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই রাজলক্ষ্মী হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, ‘আর ওষুধ না, বাবা। এখন আমি ভগবানকে স্নান করি— তিনি আমাকে আমার সমস্ত সংসারদাহের শেষ ওষুধ দিবেন। মহিন, তোরা একটুখানি বিশ্রাম করুণ। বউমা, এইবার রান্না চড়াইয়া দাও।’

সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এবং মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর বিছানার সমুখে নীচে পাত পাড়িয়া খাইতে বসিল। আশাৰ উপর রাজলক্ষ্মী পরিবেশনেৰ ভাৱ দিয়াছিলেন, সে পরিবেশন কৱিতে লাগিল।

মহেন্দ্ৰেৰ বক্ষেৰ মধ্যে অশ্ব উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মুখে অন উঠিতেছিল না। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বাৱ বাৱ বলিতে লাগিলেন, ‘‘মহিন, তুই কিছুই খাইতেছিস না কেন। ভালো কৱিয়া থা, আমি দেখি।’’

বিহারী কহিল, ‘‘জানই তো মা, মহিনদা চিৱকাল ঐৱকম, কিছুই খাইতে পাৱে না। বৌঠান, ঐ ঘণ্টটা আমাকে আৱ- একটু দিতে হইবে, বড়ো চমৎকাৰ হইয়াছে।’’

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া দৃষৎ হাসিয়া কহিলেন, ‘‘আমি জানি, বিহারী ঐ ঘণ্টটা ভালোবাসে। বউমা, ওটুকুতে কী হইবে, আৱ- একটু বেশি কৱিয়া দাও।’’

বিহারী কহিল, ‘‘তোমাৰ এই বউটি বড়ো কৃপণ, হাত দিয়া কিছু গলে না।’’

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিলেন, ‘‘দেখো তো বউমা, বিহারী তোমাৰই নুন খাইয়া তোমাৰই নিন্দা কৱিতেছে।’’

আশা বিহারীৰ পাতে একৱাশ ঘণ্ট দিয়া গেল।

বিহারী কহিল, ‘‘হায় হায় ! ঘণ্ট দিয়াই আমাৰ পেট ভৱাইবে দেখিতেছি, আৱ ভালো ভালো জিনিস সমস্তই মহিনদাৰ পাতে পড়িবে।’’

আশা ফিসফিস কৱিয়া বলিয়া গেল, ‘‘নিন্দুকেৰ মুখ কিছুতেই বন্ধ হয় না।’’

বিহারী মৃদুস্বরে কহিল, ‘‘মিষ্টান্ন দিয়া পৱীক্ষা কৱিয়া দেখো, বন্ধ হয় কি না।’’

দুই বন্ধুৰ আহার হইয়া গেলে, রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ কৱিলেন। কহিলেন, ‘‘বউমা, তুমি শীত্র খাইয়া এসো।’’

রাজলক্ষ্মীৰ আদেশে আশা খাইতে গোলে তিনি মহেন্দ্ৰকে কহিলেন, ‘‘মহিন, তুই শুইতে যা।’’

মহেন্দ্ৰ কহিল, ‘‘এখনই শুইতে যাইব কেন।’’

মহেন্দ্ৰ রাত্ৰে মাতার সেবা কৱিবে স্থিৱ কৱিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী কোনোমতেই তাহা ঘটিতে দিলেন না। কহিলেন, ‘‘তুই শ্রান্ত আছিস মহিন, তুই শুইতে যা।’’

আশা আহার কৱিয়া পাখা লইয়া রাজলক্ষ্মীৰ শিয়াৰেৰ কাছে আসিয়া বসিবাৰ উপক্ৰম কৱিলে, তিনি চুপি চুপি তাহাকে কহিলেন, ‘‘বউমা, মহেন্দ্ৰেৰ বিছানা ঠিক হইয়াছে কি না দেখো গো, সে একলা আছে।’’

আশা লজ্জায় মৱিয়া গিয়া কোনোমতে ঘৰ হইতে বাহিৱ হইয়া গেল। ঘৰে কেবল বিহারী এবং অন্নপূৰ্ণা রহিলেন।

তখন রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘বিহারী, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বিনোদিনীর কী হইল বলিতে পারিস? সে এখন কোথায়।’

বিহারী কহিল, ‘বিনোদিনী কলিকাতায় আছে।’

রাজলক্ষ্মী নীরব দ্রষ্টিতে বিহারীকে প্রশ্ন করিলেন। বিহারী তাহা বুঝিল। কহিল, ‘বিনোদিনীর জন্য তুমি আর কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না, মা।’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, বিহারী, তবু তাহাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি।’

বিহারী কহিল, ‘সে- ও তোমাকে মনে মনে ভালোবাসে, মা।’

রাজলক্ষ্মী, আমারও তাই বোধ হয় বিহারী। দোষগুণ সকলেরই আছে, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসিত। তেমন সেবা কেহ ছল করিয়া করিতে পারিত না।

বিহারী কহিল, ‘তোমার সেবা করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া আছে।’

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া কহিলেন, ‘মহিনরা তো এখন শুইতে গেছে, রাত্রে তাহাকে একবার আনিলে কি ক্ষতি আছে।’

বিহারী কহিল, ‘মা, সে তো এই বাড়িরই বাহির- ঘরে লুকাইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে আজ সমস্ত দিন জলবিন্দু পর্যন্ত মুখে দেওয়াইতে পারি নাই। সে পণ করিয়াছে, যতক্ষণ তুমি তাহাকে ডাকিয়া না মাপ করিবে ততক্ষণ সে জলস্পর্শ করিবে না।’

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ‘সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে! আহা, তাহাকে ডাক, ডাক।’

বিনোদিনী ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘ছি ছি বউ, তুমি করিয়াছ কি। আজ সমস্ত দিন উপোস করিয়া আছ? যাও যাও, আগে খাইয়া লও, তাহার পরে কথা হইবে।’

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, ‘আগে তুমি পাপিষ্ঠাকে মাপ করো, পিসিমা, তবে আমি খাইব।’

রাজলক্ষ্মী। মাপ করিয়াছি বাছা, মাপ করিয়াছি, আমার এখন কাহারো উপর আর রাগ নাই।— বিনোদিনীর ডান হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, ‘বউ, তোমা হইতে কাহারো মন্দ না হউক, তুমিও ভালো থাকো।’

বিনোদিনী। তোমার আশীর্বাদ মিথ্যা হইবে না, পিসিমা। আমি তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আমা হইতে এ সংসারের মন্দ হইবে না।

অম্বূর্ণাকে বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খাইতে গেল। খাইয়া আসিলে পর রাজলক্ষ্মী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, ‘বউ, এখন তবে তুমি চলিলে?’

বিনোদিনী। পিসিমা, আমি তোমার সেবা করিব। ঈশ্বর সাক্ষী, আমা হইতে তুমি কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়ো না।

রাজলক্ষ্মী বিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। বিহারী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, “বৌঠান থাকুন মা, তাহাতে ক্ষতি হইবে না।”

রাত্রে বিহারী, বিনোদিনী এবং অন্নপূর্ণা তিনজনে মিলিয়া রাজলক্ষ্মীর শুশ্রাব করিলেন।

এ দিকে আশা সমস্ত রাত্রি রাজলক্ষ্মীর ঘরে আসে নাই বলিয়া লজ্জায় অত্যন্ত প্রত্যয়ে উঠিয়াছে। মহেন্দ্রকে বিছানায় সুপ্ত অবস্থায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল। তখনো অন্ধকার একেবারে যায় নাই। রাজলক্ষ্মীর দ্বারের কাছে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশা অবাক হইয়া গেল। তাবিল, ‘এ কি স্বপ্ন।’

বিনোদিনী একটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া জল গরম করিতেছে। বিহারী রাত্রে ঘুমাইতে পায় নাই, তাহার জন্য চা তৈরি হইবে।

আশাকে দেখিয়া বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, ‘আজ আমি আমার সমস্ত অপরাধ লইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম— আর কেহ আমাকে দূর করিতে পারিবে না— কিন্তু তুমি যদি বল ‘যাও’ তো আমাকে এখনই যাইতে হইবে।’

আশা কোনো উত্তর করিতে পারিল না— তাহার মন কী বলিতেছে, তাও সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল, ‘আমাকে কোনোদিন তুমি মাপ করিতে পারিবে না— সে চেষ্টাও করিয়ো না। কিন্তু আমাকে আর ভয় করিয়ো না। যে কয়দিন পিসিমার দরকার হইবে, সেই কটা দিন আমাকে একটুখানি কাজ করিতে দাও, তার পরে আমি চলিয়া যাইব।’

কাল রাজলক্ষ্মী যখন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তখন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পন করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সমুখে দেখিয়া তাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালোবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনো হয়তো মনে মনে ভালোবাসে— এ কথা তাহার বুকের ভিতরে চেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে— কী জানি কী চক্ষে দেখিবে। কাল রাত্রে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিষ্কণ্টক দেখিয়াছিল— আজ প্রত্যয়ে উঠিয়াই দেখিল, কঁটাগাছ তাহার ঘরের প্রাঙ্গণেই। সংসারে সুখের স্থানই সবচেয়ে সংকীর্ণ— কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে রাখিবার অবকাশ নাই।

হৃদয়ের ভার লইয়া আশা রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল, এবং অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে কহিল, ‘মাসিমা, তুমি সমস্ত রাত বসিয়া আছ— যাও, শুতে যাও।’ অন্নপূর্ণা আশার মুখের দিকে একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে শুইতে না গিয়া আশাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। কহিলেন, ‘চুনি, যদি সুখী হইতে চাস, তবে সব কথা মনে রাখিস নে। অন্যকে দোষী করিয়া যেটুকু সুখ, দোষ মনে রাখিবার দুঃখ তাহার চেয়ে তের বেশি।’

আশা কহিল, ‘মাসিমা, আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভুলিতেই চাই, কিন্তু ভুলিতে দেয় না যে।’

অন্নপূর্ণা। বাছা, তুই ঠিক বলিয়াছিস— উপদেশ দেওয়া সহজ, উপায় বলিয়া দেওয়াই শক্ত। তবু আমি তোকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। যেন ভুলিয়াছিস এই ভাবটি অস্তত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে— আগে বাহিরে ভুলিতে আরস্ত করিস, তাহা হইলে ভিতরেও ভুলিব। এ কথা মনে রাখিস চুনি, তুই যদি না ভুলিস, তবে অন্যকেও স্মরণ করাইয়া রাখিবি ! তুই নিজের ইচ্ছায় না পারিস, আমি তোকে আজ্ঞা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর, যেন সে কখনো তোর কোনো অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার দ্বারা তোর অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নাই।

আশা নত্রমুখে কহিল, ‘কী করিতে হইবে, বলো।’ অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘বিনোদিনী এখন বিহারীর জন্য চাতৈরি করিতেছে। তুই দুধ- চিনি- পেয়ালা সমস্ত লইয়া যা— দুই জনে মিলিয়া কাজ কর।’

আশা আদেশ পালনের জন্য উঠিল। অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘এটা সহজ— কিন্তু আমার আর- একটি কথা আছে, সেটা আরো শক্ত— সেইটে তোকে পালন করিতেই হইবে। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তখন তোর মনে কী হইবে, তাহা আমি জানি— সে- সময় তুই গোপন কটাক্ষেও মহেন্দ্রের ভাব কিংবা বিনোদিনীর ভাব দেখিবার চেষ্টামাত্রও করিস নে। বুক ফাটিয়া গেলেও তোকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ইহা জানিবে যে, তুই সন্দেহ করিস না, শোক করিস না, তোর মনে ভয় নাই, চিন্তা নাই— জোড় ভাঙিবার পূর্বে যেমন ছিল, জোড় লাগিয়া আবার ঠিক তেমনই হইয়াছে— ভাঙনের দাগটুকুও মিলাইয়া গেছে। মহেন্দ্র কি আর- কেহ তোর মুখ দেখিয়া নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে না। চুনি, ইহা আমার অনুরোধ বা উপদেশ নহে, ইহা তোর মাসিমার আদেশ। আমি যখন কাশী চলিয়া যাইব, আমার এই কথাটি একদিনের জন্যও ভুলিস নে।’

আশা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হইল। কহিল, ‘জল কি গরম হইয়াছে। আমি চায়ের দুধ আনিয়াছি।’

বিনোদিনী আশ্র্য হইয়া আশার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, ‘বিহারী- ঠাকুরপো বারান্দায় বসিয়া আছেন, চা তুমি তাহার কাছে পাঠাইয়া দাও, আমি ততক্ষণ পিসিমার জন্য মুখ ধুইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি। তিনি বোধ হয় এখনই উঠিবেন।’

বিনোদিনী চা লইয়া বিহারীর কাছে গেল না। বিহারী ভালোবাসা স্বীকার করিয়া তাহাকে যে- অধিকার দিয়াছে, সেই অধিকার স্বেচ্ছামতে খাটাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সং্যত করিতে হয়। যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙলকেই শোভা পায়— তোগকে খর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব। এখন, বিহারী তাহাকে নিজে না ডাকিলে, কোনো- একটা উপলক্ষ করিয়া বিনোদিনী তাহার কাছে আর যাইতে পারে না।

বলিতে- বলিতেই মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আশার বুকের ভিতরটা যদিও ধড়াস করিয়া উঠিল, তবু সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বাভাবিক স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, ‘তুমি এত ভোরে উঠিলে যে? পাছে আলো লাগিয়া তোমার ঘুম ভাঙ্গে তাই আমি জানালা- দরজা সব বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।’

বিনোদিনীর সমুখেই আশাকে এইরপ সহজভাবে কথা কহিতে শুনিয়া মহেন্দ্রের বুকের একটা পাথর যেন নামিয়া গেল। সে আনন্দচিত্তে কহিল, ‘মা, কেমন আছেন, তাই দেখিতে আসিয়াছি— মা কি এখনো ঘুমাইতেছেন।’

আশা কহিল, ‘হাঁ, তিনি ঘুমাইতেছেন, এখন তুমি যাইয়ো না। বিহারী- ঠাকুরপো বলিয়াছেন, তিনি আজ অনেকটা ভালো আছেন। অনেক দিন পরে কাল তিনি সমস্ত রাত ভালো করিয়া ঘুমাইয়াছেন।’

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কাকীমা কোথায়।’ আশা তাঁহার ঘর দেখাইয়া দিল। আশার এই দৃঢ়তা ও সংযম দেখিয়া বিনোদিনীও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র ডাকিল, ‘কাকীমা !’

অন্নপূর্ণা যদিও ভোরে স্নান করিয়া লইয়া এখন পূজায় বসিবেন স্থির করিয়াছিলেন তবুও তিনি কহিলেন, ‘আয়, মহিন, আয়।’

মহেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, ‘কাকীমা, আমি পাপিষ্ঠ, তোমাদের কাছে আসিতে আমার লজ্জা করে।’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘ছি ছি, ও কথা বলিস নে মহিন— ছেলে ধুলা লইয়াও মার কোলে আসিয়া বসে।’

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার এ ধুলা কিছুতেই মুছিবে না কাকীমা।

অন্নপূর্ণা। দুই- একবার ঝাড়িলেই ঝারিয়া যাইবে। মহিন, ভালোই হইয়াছে। নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের ’পরে বিশ্বাস তোর বড়ো বেশি ছিল, পাপের বড়ে তোর সেই গর্বটুকুই ভাঙিয়া দিয়াছে, আর কোনো অনিষ্ট করে নাই।

মহেন্দ্র। কাকীমা, এবার তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না, তুমি গিয়াই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা। আমি থাকিয়া যে- দুর্গতি ঠেকাইয়া রাখিতাম, সে- দুর্গতি একবার ঘটিয়া যাওয়াই ভালো। এখন আর তোর আমাকে কোনো দরকার হইবে না।

দরজার কাছে আবার ডাক পড়িল, ‘কাকীমা, আহিকে বসিয়াছ নাকি।’

অন্নপূর্ণা কহিলেন, ‘না, তুই আয়।’

বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। এত সকালে মহেন্দ্রকে জাগ্রত দেখিয়া কহিল, ‘মহিনদা, আজ তোমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম সূর্যোদয় দেখিলে !’

মহেন্দ্র কহিল, ‘হাঁ বিহারী, আজ আমার জীবনে প্রথম সূর্যোদয়, বিহারীর বোধ হয় কাকীমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ আছে— আমি যাই।’

বিহারী হাসিয়া কহিল, ‘তোমাকেও নাহয় ক্যাবিনেটের মিনিস্টার করিয়া লওয়া গেল। তোমার কাছে আমি তো কখনো কিছু গোপন করি নাই— যদি আপত্তি না কর, আজও গোপন করিব না।’

আজকাল মহেন্দ্রের সমুখে সকল কথা অসংকোচে বলা কঠিন। বিহারীর মুখ বাধিয়া আসিল, তবু সে জোর করিয়া বলিল, “বিনোদিনীকে বিবাহ করিব, এমন- একটা কথা উঠিয়াছিল, কাকীমার সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আমি কথাবার্তা শেষ করিতে আসিয়াছি।”

ମହେନ୍ଦ୍ର ଏକାନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ହଇଯା ଉଠିଲା । ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକିତ ହଇଯା ବଲିଯା ଉଠିଲେନ, “ଏ ଆବାର କୀ କଥା ବିହାରୀ ।”

মহেন্দ্র প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংকোচ দূর করিল। কহিল, “বিহারী, এ বিবাহের কোনো প্রয়োজন নাই।”

ଅନୁପର୍ଣ୍ଣା କହିଲେନ, “ଏ ବିବାହେର ପ୍ରସ୍ତାବେ କି ବିନୋଦିନୀର କୋନୋ ଯୋଗ ଆଛେ ।”

বিহারী কহিল, “কিছুমাত্র না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি ইহাতে রাজী হইবে।”

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, ‘বিনোদিনী কেন রাজী হইবে না, কাকীমা। আমি জানি, সে একমনে বিহারীকে ভক্তি করে— এমন আশ্রয় সে কি ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে।’

বিহারী কহিল, ‘মহিনদা, আমি বিনোদনীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি— সে লজ্জার সঙ্গে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।’

শুনিয়া মহেন্দ্র চুপ করিয়া রাখিল।

অধ্যায় - ৫৪

ভালোয়- মন্দয় দুই- তিন দিন রাজলক্ষ্মীর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতে তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন ও বেদনা সমস্ত হ্রাস হইল। সেই দিন তিনি মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, “আর আমার বেশিক্ষণ সময় নাই- কিন্তু আমি বড়ো সুখে মরিলাম মহিন, আমার কোনো দুঃখ নাই। তুই যখন ছোটো ছিলি, তখন তোকে লইয়া আমার যে আনন্দ ছিল, আজ সেই আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে- তুই আমার কোলের ছেলে, আমার বুকের ধন- তোর সমস্ত বালাই লইয়া আমি চলিয়া যাইতেছি, এই আমার বড়ো সুখ।” বলিয়া রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের রোদন বাধা না মানিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কাঁদিস নে, মহিন। লক্ষ্মী ঘরে রহিল। বউমাকে আমার চাবিটা দিস। সমস্তই আমি গুছাইয়াছি, তোদের ঘরকম্বার জিনিসের কোনো অভাব হইবে না। আর- একটি কথা আমি বলি মহিন, আমার মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও জানাস নে- আমার বাস্ত্রে দুহাজার টাকার নেট আছে, তাহা আমি বিনোদনীকে দিলাম। সে বিধবা, একাকিনী, ইহার সুদ হইতে তাহার বেশ চলিয়া যাইবে- কিন্তু মহিন, তাহাকে তোদের সংসারের ভিতরে রাখিস নে, তোর প্রতি আমার এই অনুরোধ রহিল।”

বিহারীকে ডাকিয়া রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বাবা বিহারী, কাল মহিন বলিতেছিল, তুই গরিব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্য একটি বাগান করিয়াছিস- ভগবান তোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরিবের হিত করুন। আমার বিবাহের সময় আমার শশুর আমাকে একখানি গ্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের কাজে লাগাস, তাহাতে আমার শশুরের পূণ্য হইবে।”

শেষ

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে পর শ্রান্কশেষে মহেন্দ্র কহিল, “ভাই বিহারী, আমি ডাক্তারি জানি— তুমি যে- কাজ আরস্ত করিয়াছ, আমাকেও তাহার মধ্যে নাও। চুনি যেরূপ গৃহিণী হইয়াছে সেও তোমার অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমরা সকলে সেইখানেই থাকিব।”

বিহারী কহিল, “মহিনদা, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখো— এ কাজ কি বরাবর তোমার ভালো লাগিবে? বৈরাগ্যের ক্ষণিক উচ্ছাসের মুখে একটা স্থায়ী ভার গ্রহণ করিয়া বসিয়ো না।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিহারী, তুমিও ভাবিয়া দেখো, যে জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলস্যভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই— কর্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্ দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।”

সেই কথাই স্থির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ও বিহারী বসিয়া শান্ত বিষাদের সহিত সেকালের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাহাদের পরম্পরারের বিদায়ের সময় কাছে আসিয়াছে। বিনোদিনী দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, “কাকীমা, আমি কি এখানে একটু বসিতে পারি।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “এসো এসো বাছা, বসো।”

বিনোদিনী আসিয়া বসিলে তাহার সহিত দুই- চারিটা কথা কহিয়া বিছানা তুলিবার উপলক্ষ করিয়া অন্নপূর্ণা বারান্দায় গেলেন।

বিনোদিনী বিহারীকে কহিল, “এখন আমার প্রতি তোমার যাহা আদেশ, তাহা বলো।”

বিহারী কহিল, “বৌঠান, তুমই বলো, তুম কী করিতে চাও।”

বিনোদিনী কহিল, “শুনিলাম, গরিবদের চিকিৎসার জন্য গঙ্গার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ— আমি সেখানে তোমার কোনো একটা কাজ করিব। কিছু না হয় তো আমি রাঁধিয়া দিতে পারি।”

বিহারী কহিল, “বৌঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হঙ্গামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভতে বসিয়া বসিয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আসিয়াছে। পূর্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখন হৃদয় যাহা চায়, তাহাকে আর প্রশ্ন দিতে সাহস হয় না। এ পর্যন্ত যাহা- কিছু ঘটিয়াছে, যাহা- কিছু সহ্য করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্তন, সমস্ত আন্দোলন শান্ত করিতে না পারিলে, জীবনের সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত— এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙ্চুর সারিয়া লইতে হইবে।”

এই সময় অন্নপূর্ণা ঘরে চুকিতেই বিনোদিনী কহিল, “মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “মা, চলো, আমার সঙ্গেই চলো।”

অন্নপূর্ণা ও বিনোদিনীর কাশীতে যাইবার দিন কোনো সুযোগে বিহারী বিরলে বিনোদিনীর সহিত দেখা করিল। কহিল, “বৌঠান, তোমার একটা কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আমার এমন কী আছে, যাহা চিহ্নের মতো কাছে রাখিতে পার?”

বিহারী লজ্জা ও সংকোচের সহিত কহিল, “ইংরেজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়জনের একগুচ্ছ চুল স্মরণের জন্য রাখিয়া দেয়—যদি তুমি—।”

বিনোদিনী। ছি ছি, কী ঘৃণা। আমার চুল লইয়া কী করিবে। সেই অশ্রু মৃতবস্তু আমার এমন কিছুই নহে, যাহা আমি তোমকে দিতে পারি। আমি হতভাগিনী তোমার কাজে থাকিতে পারিব না— আমি এমন একটা- কিছু দিতে চাই, যাহা আমার হইয়া তোমার কাজ করিবে— বলো, তুমি লইবে?

বিহারী কহিল, “লইব।”

তখন বিনোদিনী তাহার অঞ্চলের প্রান্ত খুলিয়া হাজার টাকার দুইখানি নোট বিহারীর হাতে দিল।

বিহারী সুগভীর আবেগের সহিত স্থিরদৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। খানিক বাদে বিহারী কহিল, “আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্গের ভূষণ— তাহা কেহ কাঢ়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু দরকার নাই।” বলিয়া সে নিজের হাতের সেই কাটা দাগ দেখাইল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া রহিল। বিনোদিনী কহিল, “তুমি জান না— এ তোমারই আঘাত— এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত। ইহা এখন তুমি ফিরাইতে পার না।”

মাসিমার উপদেশসত্ত্বেও আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীর সেবায় দুই জনে একত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু আশা যখনই বিনোদিনীকে দেখিয়াছে তখনই তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা লাগিয়াছে— মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হয় নাই, এবং হাসিবার চেষ্টা তাহাকে পীড়ন করিয়াছে। বিনোদিনীর নিকট হইতে সামান্য কোনো সেবা গ্রহণ করিতেও তাহার সমস্ত চিন্ত বিমুখ হইয়াছে। বিনোদিনীর সাজা পান অনেক সময়ে শিষ্টতার খাতিরে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আড়ালে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ যখন বিদ্যায়কাল উপস্থিত হইল— মাসিমা সংসার হইতে দ্বিতীয়বার চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আশা হৃদয় যখন অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল, তখন সেইসঙ্গে বিনোদিনীর প্রতি তাহার করুণার উদয় হইল। যে একেবারে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে মাপ করিতে পারে না, এমন কঠিন মন অল্পই আছে। আশা জানিত, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালোবাসে; মহেন্দ্রকে ভালো না বাসিবেই বা কেন। মহেন্দ্রকে ভালোবাসা যে কিরূপ অনিবার্য, আশা তাহা নিজের হৃদয়ের ভিতর হইতেই জানে। নিজের ভালোবাসার সেই বেদনায় বিনোদিনীর প্রতি আজ তাহার বড়ো দয়া হইল। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহার যে দুর্বিষহ দুঃখ, তাহা আশা অতিবড়ো শক্র জন্যও কামনা

করিতে পারে না— মনে করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল; এককালে সে বিনোদিনীকে ভালোবাসিয়াছিল—
সেই ভালোবাসা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণার সঙ্গে,
মেহের সঙ্গে, বিষাদের সঙ্গে মৃদুশ্বরে কহিল, ‘‘দিদি, তুমি চলিলে?’’

বিনোদিনী আশার চিবুক ধরিয়া কহিল, ‘‘হঁ বোন, আমার যাইবার সময় আসিয়াছে। এক সময় তুমি
আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে— এখন সুখের দিনে সেই ভালোবাসার একটুখানি আমার জন্যে রাখিয়ো,
ভাই— আর সব ভুলিয়া যেয়ো!’’

মহেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, ‘‘বৌঠান, মাপ করিয়ো।’’ তাহার চোখের প্রান্তে দুই ফেঁটা অশ্রু
গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, ‘‘তুমিও মাপ করিয়ো ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।’’